কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ২৫
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম-২৫

তিন গোয়েন্দা

৭৯, ৮২, ৯৮

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1352-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco net
Web Site. www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-25
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan

একচল্লিশ টাকা

জিনার সেই দ্বীপ ৫—৮৭
কুকুর খেকো ডাইনী : ৮৮—১৬৯
গুপ্তচর শিকারি : ১৭০—২৩১

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪১/-

তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন) ৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক) ৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩০/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

জিনার সেই দ্বীপ

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৪

বাস থেকে নেমেই কুকুরটার ওপর চোখ পড়ল তিন গোয়েন্দার। কিংবা বলা যায় কুকুরটাই ওদেরকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করল, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একনাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

'ওই যে রাফি,' মুসা বলল। 'জিনা কোথায়?'

'কেন, রাফির পাশে দেখতে পাচ্ছ না?' হেসে বলল কিশোর।

'কই?...ও, আবার ছেলে সাজার ভূত চেপেছে মাথায়।'

মালপত্রগুলো ভাগাভাগি করে হাতে তুলে নিয়ে সেদিকে এগোল তিনজনে। কাছে গিয়ে মুসা বলল, 'আর গম্ভীর হয়ে থাকার ভান করে লাভ নেই, জিনা, চিনে ফেলেছি।'

ম্লান হাসল জিনা। 'তোমরা এলে তাহলে। খুব খুশি হয়েছি।'

'তুমি অমন মুখ গোমড়া করে রেখেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আম্মার শরীরটা ভাল না।'

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল তিন গোয়েন্দা। কেরিআন্টিকে খুব ভালবাসে ওরা।

'কি জানি, গরমটা বোধহয় সহ্য করতে পারেনি।'

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে মাথা দোলাল কিশোর। 'হতে পারে। যা গরম পড়েছে।'

রবিন জানতে চাইল, 'আংকেলের কি খবর?'

'কি আর হবে,' জবাব দিল জিনা। 'আম্মার শরীর খারাপ হলে যা হয়। দুশ্চিন্তা করে করে মেজাজ আরও চড়ে গেছে। কাউকে দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে।'

'খাইছে!' শঙ্কিত হয়ে পড়েছে মুসা, 'ও-বাড়িতে থাকব কি করে তাহলে?'

'অত ভাবছ কেন?' হেসে আশ্বাস দিল জিনা, 'থাকার কি আর জায়গা নেই? বাড়িতে থাকতে না পারলে আমার দ্বীপটায় চলে যাব। ছুটি কাটাতে কোন অসুবিধে হবে না।'

গরমের লম্বা ছুটি শুরু হয়েছে। ছুটি কাটাতে গোবেল বীচে জিনাদের বাড়িতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। এখানে এলে খুব আনন্দে সময় কাটে ওদের। কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা দুঃসংবাদ শুনবে এবার, ভাবেনি। শুরুতেই কেমন গড়বড় হয়ে গেল।

কিশোর বলল, 'তা নাহয় গেলাম। কিন্তু আন্টির শরীর খারাপ থাকলে আমাদের আনন্দ জমবে না।'

'চলো আগে, বাড়ি তো যাই। তারপর দেখা যাবে।'

জোরে জোরে লেজ নাড়ছে রাফি। তার দিকে কারও নজর নেই বলে 'খউ' করে অভিযোগ করল।

মুসা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস রে, রাফি?'

রাফি জবাব দিল, 'ঘউ', অর্থাৎ, 'ভাল।'

ট্যাক্সি নিল ওরা।

গোবেল ভিলায় পৌঁছল। দরজা খুলে দিল এক মাঝবয়েসী গোমড়ামুখো মহিলা। চেহারা দেখে মনে হয়, হাসতে শেখেনি। এমন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল যেন, ওরা একেকটা শুঁয়াপোকা।

দরজা খুলে দিয়েই চলে গেল সে।

'বাপরে বাপ, কি ভঙ্গি! কে?' নিচু গলায় জিনাকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমাদের নতুন রাঁধুনী।'

'কেন আইলিন কোথায়?'

'ওর মায়ের পা ভেঙেছে। মাকে দেখতে গেছে। ক'দিনের জন্যে মিসেস টোডকে রেখেছে আম্মা।'

'যেমন নাম তেমন চেহারা! হুঁহ্। বেঙই বটে! বেশিদিন থাকবে না তো? আইলিন কবে আসবে?'

'ঠিক নেই।'

ট্যাক্সি বিদেয় করে দিয়ে মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। বসার ঘরে সোফায় শুয়ে আছেন মিসেস পারকার। ওদের দেখে হাসলেন।

চেহারা দেখে চমকে গেল কিশোর। এ-কি হাল হয়েছে! চোখ বসা, মুখ শুকনো, ফ্যাকাসে, এক ছটাক রক্ত নেই যেন শরীরে।

'কি হয়েছে, আন্টি? এ-অবস্থা হলো কি করে?'

'ও কিছু না, সেরে যাবে। তোমরা কেমন আছ?'

'ভাল...'

'ওপরে যাও। ব্যাগট্যাগগুলো রেখে, হাতমুখ ধুয়ে এসো। আমি চা দিতে বলছি।'

'আব্বা কোথায়?' জানতে চাইল জিনা।

'হাঁটতে বেরিয়েছে। গুহা ছেড়ে কি আর যেতে চায়। জোর করে পাঠালাম।'

'গুহা' হলো জিনার বাবার স্টাডি, যেখানে ঢুকলে আর বেরোতে চান না তিনি, গবেষণা করে কাটান—জানা আছে তিন গোয়েন্দার।

ওপরে উঠে পরিচিত সেই পুরানো শোবার ঘরে ঢুকল ওরা। জানালা দিয়ে সাগর চোখে পড়ে। অতি মনোরম দৃশ্য। কিন্তু এ-মুহূর্তে সাগর ওদেরকে খুশি করতে পারল না। কেরিআন্টির অসুখ মন খারাপ করে দিয়েছে।

*

পরদিন সকাল। কিশোরের ঘুম ভাঙল সবার আগে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। কানে আসছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একটানা ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল। বিছানা থেকে উঠে জানালায় এসে দাঁড়াল সে। ঘন নীল আকাশের ছায়া সাগরকেও নীল করে দিয়েছে। প্রণালীর মুখে যেন ফুটে রয়েছে জিনার সেই দ্বীপটা, গোবেল আইল্যান্ড।

'খুব সুন্দর, না?' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। 'আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।'

'নাস্তা না করেই?'

'এসে করব।'

তিনজনে এসে দাঁড়াল জিনার ঘরের সামনে। একবার ডাকতেই সাড়া এল। দরজা খুলল জিনা। সে আগেই উঠেছে। ওদের অপেক্ষাতেই ছিল।

কিশোর বলল, 'চলো, আন্টিকে দেখে যাই।'

'উঠেই দেখতে গেছি আমি,' জিনা বলল। 'দরজা খোলেনি। ঘুমাচ্ছে।'

'ও, তাহলে থাক। ঘুম ভাঙানো ঠিক না।'

বাড়ির পেছন দিয়ে একটা পথ আছে সৈকতে যাওয়ার। সেটা ধরে চলল চারজনে। পেছনে লেজ নাড়তে নাড়তে চলল রাফি। লম্বা জিভ বের করে দিয়েছে খুশিতে। সে জানে, মজা হবে এখন।

প্রচুর সাঁতার-টাতার কেটে বাড়ি ফিরল ওরা। খুব খিদে পেয়েছে। বাগানের কোণে বসা ছেলেটাকে নজরে পড়ল রবিনের। বোকা বোকা চেহারা। তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস।

'ও কে?'

'বেঙাচি,' জবাব দিল জিনা।

'মানে!'

'বেঙের পোনা তো বেঙাচিই হয়, নাকি?'

'মিসেস টোডের ছেলে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ। টেরি।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'আবার টেরি! শুঁটকি টেরির মত শয়তান না তো?'

'তার চেয়ে খারাপ। আমাকে দেখলেই ভেঙচি কাটে, আজেবাজে ছড়া বলে খেপায়।'

'মারছে রে! শুঁটকি থেকে শেষে বেঙাচি টেরির পাল্লায় এসে পড়লাম...'

মুসার কথা শেষ হতে না হতেই সুর করে বলে উঠল ছেলেটা:

জিনা, ঘিনা; জিনার মুখে ছাই,
দাঁড়কাকে ঠুকরে দিলে আর রক্ষা নাই!

রাগে লাল হয়ে গেল জিনার মুখ। তিন গোয়েন্দা মনে করল, ছুটে গিয়ে ঠাস করে এখন ছেলেটার গালে চড় কষাবে সে। কিন্তু ওদেরকে অবাক করে

দিয়ে কিছুই করল না। বরং রাফির কলার ধরে আটকাল, ছেলেটার কাছে যেতে দিল না। করুণ কণ্ঠে বলল, 'আমাকে দেখলেই এই ছড়া বলে! আর সহ্য হয় না!'

মুসা ধমক দিয়ে বলল, 'এই ছেলে, খেপাও কেন?'

টকটকে লাল মুখ ছেলেটার। মুসার কথায় মুখ বাঁকিয়ে হাসল। আবার শুরু করল, 'জিনা, ঘিনা…'

'দেখো, ভাল হবে না কিন্তু!' এগিয়ে গেল মুসা।

কিন্তু মুসা তার কাছে পৌঁছার আগেই একছুটে রান্নাঘরে ঢুকে গেল ছেলেটা।

জিনার দিকে ফিরে বলল বিস্মিত মুসা, 'জিনা, ওর অত্যাচার সহ্য করো! এখনও কিছু করোনি!'

'চড়িয়ে সবগুলো দাঁতই তো ফেলে দিতে ইচ্ছে করে,' নিতান্ত অসহায় ভঙ্গিতে হাত ডলল জিনা, 'কিন্তু উপায় নেই। আম্মার শরীর খারাপ। টেরিকে কিছু করলে ওর মা যদি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে আম্মা। সে-জন্যেই কিছু করতে পারি না।'

'জিনা, সত্যি অবাক করলে,' কিশোর বলল। 'তোমার যে এতটা সহ্যশক্তি, জানতাম না।'

'আম্মা নিশ্চয় উঠে পড়েছে এতক্ষণে। বিছানায় নাস্তা দিয়ে আসতে হবে। তোমরা দাঁড়াও এখানে, আমি আসছি। রাফিকে আটকে রাখো, টেরিকে দেখলেই কামড়াতে যাবে।'

জিনা ঘরে ঢুকে যেতেই অস্থির হয়ে উঠল রাফি। নাক তুলে কি যেন শুঁকছে।

রান্নাঘরের দরজায় বেরিয়ে এল একটা ছোট কুকুর। সাদা রঙ, ময়লা; যেন বহুদিন ধোয়া হয়নি। মাঝে মাঝে বাদামী ছোপ। দেখতে একটুও ভাল না। রাফিকে দেখেই দু-পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে ফেলল।

ওটাকে দেখেই গলা ফাটিয়ে ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফি। কিশোরের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে কলার ছুটিয়ে নিয়ে দিল দৌড়।

'রাফি, রাফি, আয় বলছি!' চিৎকার করতে করতে তার পেছনে ছুটল কিশোর।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাফি। ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে কুকুরটা। চার পা শূন্যে তুলে দিয়ে কেঁউ কেঁউ করছে। তার কান কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল রাফি।

কুকুরটার চিৎকারে রান্নাঘরের দরজায় বেরিয়ে এল মিসেস টোড। হাতে একটা সসপ্যান।

'হেই কুত্তা, হেই!' বলে লাফ দিয়ে নামল নিচে। সসপ্যান দিয়ে বাড়ি মারল রাফিকে।

ঝট করে সরে গেল রাফি। বাড়িটা তার গায়ে না লেগে লাগল অন্য

কুকুরটার গায়ে। আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল ওটা।

টেরিও বেরিয়ে এল। একটা পাথর তুলে নিয়ে রাফিকে ছুঁড়ে মারার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'খবরদার! মেরে দেখো খালি! শয়তান ছেলে কোথাকার!'

ভীষণ চেঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পারকার আংকেল। ধমক দিলেন, 'অ্যাই, কি হচ্ছে! হচ্ছে কি এসব!'

দমকা বাতাসের মত যেন ঘর থেকে উড়ে বেরোল জিনা। ছুটে গেল রাফির দিকে।

আবার কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাফি। কান না ছিঁড়ে আর ছাড়বে না।

'অ্যাই, সরাও, সরাও কুত্তাটাকে!' ধমকে উঠলেন মিস্টার পারকার।

কাছেই একটা কল আছে। পাইপ লাগানো। বাগানে পানি দেয়া হয়। ছুটে গিয়ে পাইপটা তুলে নিয়ে কুকুর দুটোর ওপর পানি ছিটাতে শুরু করল রবিন। হঠাৎ এভাবে গায়ে পানি পড়ায় চমকে গিয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল রাফি। এই সুযোগে উঠে সোজা রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল অন্য কুকুরটা।

ইচ্ছে করেই পাইপের মুখ সামান্য সরিয়ে টেরিকেও ভিজিয়ে দিল রবিন। ছেলেটাও চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিল তার কুকুরের পেছনে।

কড়া চোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে ধমক লাগালেন আংকেল, 'ওকে ভেজালে কেন?...জিনা, তোকে না কতবার বলেছি কুত্তাটাকে বেঁধে রাখতে!...মিসেস টোড, তুমিও বাপু কথা শোনো না। রান্নাঘর থেকে বেরোতে দাও কেন কুত্তাটাকে? বেঁধে রাখলেই হয়।' সবাইকে শাসিয়ে বললেন, 'আর যেন এমন না হয়।'

চুপ করে আছে সবাই।

মিসেস টোডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাস্তা হয়েছে? বেলা তো দুপুর হয়ে গেল। রোজই এক অবস্থা!'

গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেল মিসেস টোড।

পারকারও ঘরে চলে গেলেন।

রাফির গলায় শেকল বাঁধতে বাঁধতে খেঁকিয়ে উঠল জিনা, 'কতবার মানা করেছি ওটার সঙ্গে লাগতে যাবি না। তা-ও যাস। আটকে থেকে এখন মজা বোঝ...বাবাকে রাগিয়েছিস, সারাটা দিনই আজ রেগে থাকবে। বুড়িটাকেও খেপিয়েছিস। চায়ের জন্যে কেক-টেক কিচ্ছু বানাবে না আর।'

বেচারা রাফি। খুব লজ্জা পেয়েছে। মাথা নিচু করে, লেজ গুটিয়ে মৃদু কুঁই কুঁই করল। থুক করে কয়েকটা লোম ফেলল দাঁতের আগা থেকে। কুকুরটার কান ছিঁড়তে পারেনি, তবে কানের ডগার লোম ছিঁড়তে পেরেছে। আপাতত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

পুরো ঘটনাটার জন্যেই নিজেকে দায়ী মনে করছে কিশোর। বলল, 'কি

করে যে ছুটে গেল...আসলে অনেক জোর ওর, ধরে রাখতে পারলাম না...'

'ওর গায়ে বাঘের জোর,' খুশি হয়ে বলল জিনা। 'বেঙাচির কুকুরটাকে দুই কামড়ে খেয়ে ফেলতে পারে ও।'

নাস্তা দেয়া হলো। কেরিআন্টি নেই টেবিলে। তাঁর বদলে রয়েছেন পারকার আংকেল, যেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছেলেমেয়েদের জন্যে। এমনিতেই তাঁর সঙ্গে খেতে বসতে চায় না কেউ, আজ তো মেজাজ আরও সপ্তমে চড়ে রয়েছে। কি যে করে বসবেন ঠিক নেই। শুরুতেই কয়েকটা বকা দিলেন জিনাকে। কড়া নজর বুলিয়ে আনলেন সবার ওপর একবার। কুঁকড়ে গেল রবিন। এখানে বেড়াতে এসেছে বলে এবার আফসোসই হতে লাগল তার।

পরিজের প্লেট এনে ঠকাস করে টেবিলে ফেলল মিসেস টোড।

'এটা কি রকম হলো!' ধমকে উঠলেন আংকেল, 'আস্তে রাখতে পারো না!'

তাঁকে ভয় পায় মহিলা। তাড়াতাড়ি চলে গেল। এরপর অন্যান্য প্লেট এনে যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে শব্দ না করে রাখল।

কয়েক মিনিট নীরবে খাওয়ার পর ছেলেমেয়েদের বিষণ্ন মুখগুলো দেখে মায়া হলো পারকারের। কণ্ঠস্বর কোমল করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ তোমাদের কি কি করার প্ল্যান?'

'ভাবছি কোথাও পিকনিকে চলে যাব,' জবাব দিল জিনা।

'যাও না, মন্দ কি। বাড়িটা শান্ত থাকবে।'

'যাব যে, খাব কি? মিসেস টোড কি স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেবে?'

'দেবে না কেন, নিশ্চয় দেবে। তাকে রাখাই হয়েছে খাবার তৈরির জন্যে। না দিলে আমার কথা বলবে।'

চুপ হয়ে গেল জিনা। মিসেস টোডকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেয়ার কথা বলার সাহস বা মানসিকতা কোনটাই নেই তার। মহিলার সামনে যেতেই ইচ্ছে করে না তার।

'কুত্তাটাকে কিছু কোরো না, তাহলেই আর রাগবে না তোমাদের ওপর,' পারকার বললেন।

'ডার্টিটাকে যে কেন আনতে গেল...'

'ডার্টি!' ভুরু কোঁচকালেন পারকার, 'ছেলেটার নাম বুঝি? এটা একটা নাম হলো।'

'ছেলে নয়, কুত্তাটার নাম। ওরা ডাকে ডারবি। এক্কেবারে নোংরা তো; গোসল করায় না, গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, উকুনে ভরা, তাই আমি রেখেছি ডার্টি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন পারকার। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। মাঝপথেই হাসি থামিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'খবরদার, মিসেস টোডের সামনে ডার্টি বলবে না। আর যেন ঝগড়াঝাঁটি না শুনি। আমি কাজ করতে চললাম।'

নিজে বলতে গেল না জিনা, স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেয়ার কথা মাকে দিয়ে বলাল।

মুখ কালো করে মিসেস টোড বলল, 'আরও তিনজনের খাবার রান্না করার কথা কিন্তু ছিল না আমার।'

'ছিল না তো কি হয়েছে,' জিনার আম্মা বললেন। 'এসেছে ওরা, তাড়িয়ে দেব নাকি? তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে করো, বেতন দেয়ার সময় বিবেচনা করব আমি। আমার শরীর ঠিক হয়ে গেলে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওদের যেন কোন অসুবিধে না হয়।'

খাবারের প্যাকেট নিয়ে বেরোল গোয়েন্দারা।

বাগানে টেরির সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'তাতে তোমার কি দরকার!' ঝাঁঝাল জবাব দিল জিনা।

'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে,' খাতির করতে চাইছে ছেলেটা। 'চলো না, ওই দ্বীপটায় যাই?'

'না!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল জিনার কণ্ঠ। 'ওটা আমার দ্বীপ! তোমার মত ছেলেকে ওখানে নিয়ে যাব ভাবলে কি করে...'

'তোমার দ্বীপ? হি-হি! গুল মারার আর জায়গা পাও না! উনার দ্বীপ, ছাগল পেয়েছে আমাকে।'

'ছাগল না, বেঙাচি। এই চলো, এটার সঙ্গে কে কথা বলে...'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে গেটের দিকে এগোল জিনা।

পেছনে সুর করে গেয়ে উঠল টেরি, 'জিনা, ঘিনা...'

ঘুরে দাঁড়াল মুসা।

খপ করে তার হাত চেপে ধরল জিনা, 'না না, মুসা, যেয়ো না! কিছু করলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে, আর ওর মা এসে হাউকাউ শুরু করবে।'

'এত্তবড় ছেলে কাঁদে!' রবিন অবাক।

'এই বেঙাচিটা কাঁদে।'

'অ্যাই, এভাবে কথা বলবে না...' রেগে উঠল ছেলেটা।

'তুমিও তাহলে খেপাবে না,' মুসা বলল।

'কি করবে?'

'খেপিয়েই দেখো!'

গেয়ে উঠল টেরি, 'জিনা, ঘিনা...'

তাকে শেষ করারই সুযোগ দিল না মুসা। সুর করে পাল্টা জবাব দিল,

ব্যাঙাচি করে ঘ্যানর-ঘ্যান
চাইরডা পয়সা ভিক্ষা দ্যান!

হেসে ফেলল জিনা।

রবিন আর কিশোরও হাসতে লাগল।

লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল টেরির, চিৎকার করে মাকে ডাকল, 'মা, দেখো, কেমন করে!'

ভুরু নাচাল মুসা, 'এখন কেমন লাগে? অন্যকে যে খেপাও?'

'বেশি বেশি করলে তোমাকেও খেপাব।'

'আমি অত সহজে খেপি না!'

'এই, চলো চলো, এটার পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' গেটের দিকে পা বাড়াল কিশোর।

পেছনে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল টেরি,

মুসা, ঘুসা, রামছাগলের ডিম...

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। 'তবে রে, শয়তান ছেলে...'

একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর টেরি। লাফিয়ে উঠে একদৌড়ে একেবারে রান্নাঘরে, মায়ের কাছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ভেঙচাল।

ঘুসি তুলে শাসাল মুসা, 'ধরতে পারব তো একবার না একবার, হাড্ডি গুঁড়ো করে দেব তখন!'

আবার মুখ ভেঙচাল টেরি।

গর্জে উঠল মুসা, 'কান ছিঁড়ে ফেলব কিন্তু বলে দিলাম!'

'আহ্, কি শুরু করলে!' ওর হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'তুমি নাকি সহজে খেপো না?'

'কিন্তু ওটা একটা শয়তান! বিতিকিচ্ছি জন্তু! ইঁদুর, বিড়াল, বেঙ, ছুঁচো, হনুমান...'

দুই

'কোথায় যাবে ঠিক করলে?' বাগান থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল রবিন।

রাগ এখনও পড়েনি মুসার। ফোঁস ফোঁস করছে।

কিশোর প্রস্তাব দিল, 'চলো, দ্বীপে চলে যাই।'

'আমার নৌকাটা রঙ করতে দিয়েছি,' জিনা বলল। 'হলো নাকি দেখি। হলে যাওয়া যাবে।'

নৌকা মেরামতের কারখানায় এসে দেখা গেল রঙ করা হয়েছে। লাল রঙ। দাঁড়গুলোর রঙও লাল।

যে লোকটা মেরামত করে তার নাম ডক হুফার। জিনাকে দেখে বলল, 'ও, জর্জ, এসে গেছ। কেমন লাগছে রঙ?'

জিনা যে ছেলে সেজে থাকতে পছন্দ করে, হুফার একথা জানে। জর্জ বলে ডাকলে যে খুশি হয় তা-ও জানে।

'খুব সুন্দর হয়েছে, আংকেল,' মাথা দুলিয়ে জিনা বলল। 'নিতে পারব?'

মাথা নাড়ল হুফার। 'রঙ তো শুকায়নি। কাল নাগাদ হয়ে যাবে।'

'আজ বিকেলেও হবে না?'

'না। পানিতে নামালেই নষ্ট হবে।'

কি আর করা। সৈকতে হাঁটতে লাগল ওরা।

মুসা বলল, 'সকালেই বুঝেছি, আজ দিনটা ভাল যাবে না। শুরুতেই গণ্ডগোল।'

হাঁটতে হাঁটতে উঁচু একটা পাড়ের কাছে চলে এল। বড় বড় ঘাস বাতাসে দোল খাচ্ছে। পাড়ের নিচের ঝকঝকে সাদা বালিতে পা ছড়িয়ে বসল সবাই। ও, না, ভুল হয়ে গেছে, সবাই না; রাফি বসল লেজ ছড়িয়ে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের খিদে পেয়েছে?'

মোটামুটি হ্যাঁ-ই করল সবাই।

খাবারের প্যাকেট খোলা হলো। কিন্তু স্যান্ডউইচে কামড় দিয়েই মুখ বাঁকাল কিশোর, 'এহ্‌হে, বাসি রুটি দিয়েছে!'

ইচ্ছে করে শয়তানিটা করেছে মিসেস টোড, বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। বাসি রুটি, গন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরে মাখন দেয়নি বললেই চলে। ফেলে দিল কিশোর, খেতে পারল না।

জিনা আর রবিনও খেল না।

জোরজার করে দুটো স্যান্ডউইচ গিলল কোনমতে মুসা।

কেবল রাফির কোন ভাবান্তর নেই। সে এসব পচা-বাসি সবই খেতে পারে। গপগপ করে গিলতে লাগল। নিজের ভাগেরগুলো তো খেলই, অন্যদেরগুলোও খেয়ে চলল।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে সকলের।

খানিকক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পর মুসা বলল, 'দূর, এভাবে বসে থাকতে ভাল্লাগছে না! ওঠো।'

'কোথায় যাব?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওই টিলাটার চূড়ায় গিয়ে বসি। দ্বীপে যখন যেতে পারলামই না, বসে বসে দেখিই এখান থেকে।'

'হুঁ,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আরকি। চলো।'

টিলার মাথায় এসে বসল ওরা। চারপাশে অনেক দূর দেখা যায় এখান থেকে। চমৎকার বাতাস।

জিনার দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'জিনা, সেই ভাঙা জাহাজটা এখনও আছে?'

কোন জাহাজের কথা বলছে, বুঝতে পারল জিনা। সেই যে সেবার, প্রথম যখন তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল তিন গোয়েন্দা, তখন এক সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েছিল ওরা। দ্বীপে গিয়েছিল বেড়াতে। প্রচণ্ড ঝড় হলো। ঝড়ে সাগরের নিচ থেকে উঠে এল পুরানো আমলের একটা ভাঙা কাঠের জাহাজ। ম্যাপ পাওয়া গিয়েছিল। সোনার বার পেয়েছিল।

'আছে,' জানাল জিনা।

চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ, 'আছে! আমি তো ভেবেছি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে গেছে এদ্দিনে।'

'না যায়নি। পাথরের মধ্যে তেমনি আটকে আছে। বড় বড় ঢেউও ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। দ্বীপে গেলেই দেখতে পাবে।'

'একেবারেই ভাঙেনি?'

'একেবারে ভাঙেনি তা নয়। খুলে খুলে পড়ছে তক্তা। দু-চারটে ঝড়ের বেশি আর হজম করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

দ্বীপের পুরানো ভাঙা দুর্গটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। দাঁড়কাকের বাসা ছিল যে টাওয়ারটাতে সেটা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করল, 'কাকগুলো এখনও আছে, না?'

'আছে,' জানাল জিনা। 'প্রতি বছরই বাসা বানায়। কমেতোনিই, আরও বেড়েছে।'

'এই দেখো, দেখো, ধোঁয়া,' মুসা বলল। 'দ্বীপে কেউ উঠেছে।'

'না, কে উঠতে যাবে। স্টীমারের ধোঁয়া হবে। দ্বীপের ওপাশে আছে, তাই দেখতে পাচ্ছি না আমরা।'

'ওরকম স্টীমার এখনও আছে নাকি এ-অঞ্চলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ফকফক করে ধোঁয়া ছাড়ে যেগুলো?'

'তার চেয়ে প্রাগৈতিহাসিকগুলোও আছে। জেলেরা মাছ ধরতে যায় ওসব নিয়ে।'

পুরানো জলযান নিয়ে আলোচনা চলল।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'এবার ওঠা যাক। চায়ের সময় হয়ে এসেছে। গিয়ে যদি দেখতাম আন্টি ভাল হয়ে গেছে, একটা চিন্তা যেত।'

'হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে মুসা বলল, 'আন্টি খাবার টেবিলে না থাকলে সবই বিস্বাদ।'

উঠল ওরা।

কিছুদূর এসে আবার ঘাড় ঘুরিয়ে দ্বীপটার দিকে তাকাল কিশোর। ঘুরে ঘুরে উড়ছে কয়েকটা সীগাল। ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে। ঠিকই বলেছে বোধহয় জিনা, স্টীমারই। সরে চলে গেছে, ফলে আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু একটা খুঁতখুঁতানি থেকেই গেল তার সন্দেহপ্রবণ মনে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল জিনা। 'কি হলো? ধোঁয়াতে রহস্য খুঁজে পেলে নাকি?'

নাক চুলকাল কিশোর। 'কি জানি!'

'ভেবো না, কালই চলে যাব। স্টীমারের ধোঁয়া ছিল, না কেউ দ্বীপে উঠে আগুন জ্বেলেছে, জানাটা কঠিন হবে না।'

বাড়ি ফিরে এল ওরা। বসার ঘরে ঢুকে দেখে মহাআরামে সোফায় বসে জিনার একটা বই পড়ছে আর পা নাচাচ্ছে টেরি।

'এই ছেলে, এখানে কি?' ধমক দিল জিনা। 'আমার বই ধরলে কেন?'

'তাতে ক্ষতিটা কি হলো? বইই তো পড়ছি, নষ্ট তো আর করছি না কিছু।'

'না বলে তুমি ধরলে কেন? সাহস তো তোমার কম না! আমার ঘরে ঢোকো…'

'ঘরে ঢোকা কি অন্যায়?'

'নিশ্চয় অন্যায়। না বলে যে অন্যের ঘরে ঢুকতে নেই এই শিক্ষাটাও দেয়নি তোমাকে কেউ? যা করেছ, করেছ। আব্বার স্টাডিতে যেন ঢুকতে যেয়ো না, পিঠের ছাল ছাড়াবে তাহলে…'

'ওখানেও ঢুকেছি,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল ছেলেটা। 'কি সব বিচ্ছিরি যন্ত্রপাতি। ওসব দিয়ে কি করে?'

রাগে ক্ষণিকের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল জিনা। চেঁচিয়ে উঠল, 'বলো কি! ওখানেও…আমরাই যেখানে সাহস পাই না…আব্বা কিছু বলেনি?'

'না।'

'ঘরে ছিল না বোধহয়, তাই বেঁচে গেছ। বলবে না আবার! দাঁড়াও গিয়ে বলছি, তারপর বুঝবে মজা…'

'বলোগে,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল টেরি। 'পাবে কোথায় তাকে?' জিনাকে আরও রাগানোর জন্যে সামনে-পেছনে শরীর দোলাতে লাগল। বইটা চোখের সামনে এনে গভীর মনযোগে পড়ার ভান করল।

ওর এই বেপরোয়া ভাবভঙ্গি সন্দেহ জাগাল জিনার মনে। 'পাব কোথায় মানে?'

'পাব কোথায় মানে, পাবে না।'

হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল জিনা। 'আম্মা কোথায়?'

'ডাকো না। থাকলে তো সাড়াই দেবে,' একই রকম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল ছেলেটা।

ভয় পেয়ে গেল সবাই। টেরি এমন করে কথা বলছে কেন?

'আম্মা, আম্মা!' বলে ডাকতে ডাকতে ওপরতলায় দৌড় দিল জিনা।

কিন্তু মায়ের বিছানা খালি। সব ক'টা বেডরুমে ছুটে বেড়াতে লাগল সে। কোথাও পাওয়া গেল না মাকে। সাড়াও দিলেন না মিসেস পারকার।

সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নিচে নামল জিনা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।

দাঁত বের করে হাসল টেরি। চোখ নাচিয়ে বলল, 'কি, বলেছিলাম না? যত খুশি চিল্লাও এখন, কেউ আসবে না।'

টেরির কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল জিনা। 'কোথায় ওরা? জবাব দাও, কোথায়!'

'নিজেই খুঁজে বের করো।'

ঠাস করে চড় মারল জিনা। যতটা জোরে পারল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল টেরি। গাল চেপে ধরেছে। বিশ্বাস করতে পারছে

না যেন। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল জিনার দিকে। তারপর সে-ও চড় তুলল।

চোখের পলকে সামনে চলে এল মুসা, আড়াল করে দাঁড়াল জিনাকে। 'মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? মারতেই যদি হয়, আমাকে মারো, দেখি কেমন জোর?'

টেনে তাকে সরানোর চেষ্টা করল জিনা। চিৎকার করে বলল, 'সরো তুমি, মুসা, সরো! অনেক সহ্য করেছি! পেয়েছে কি! আজ আমি ওর বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব!'

কিন্তু সরল না মুসা।

তার গায়ে হাত তোলার সাহস করল না টেরি। পিছিয়ে যেতে লাগল দরজার দিকে।

পথ আটকাল কিশোর। 'দাঁড়াও। আন্টি কোথায়, বলো।'

এই সময় টেরির বিপদ বাড়াতেই যেন ঘরে ঢুকল রাফি। এতক্ষণ বাগানে ছিল। ঢুকেই আঁচ করে ফেলল কিছু একটা ঘটেছে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গরগর করতে করতে এগোল।

'আরে, ধরো না কুত্তাটাকে!' কাঁপতে শুরু করল টেরি। 'কামড়ে দেবে তো!'

রাফির মাথায় হাত রাখল কিশোর। 'চুপ থাক্।...হ্যাঁ, টেরি, এবার বলো, আন্টি কোথায়?'

রাফির ওপর থেকে চোখ সরাল না টেরি। জানাল, 'হঠাৎ করে পেটব্যথা শুরু হলো। ডাক্তারকে খবর দিল জিনার আব্বা। ডাক্তার এসে দেখে বলল, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তখনই তাড়াহুড়া করে নিয়ে গেল।'

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল জিনা। দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'আম্মা...ও আম্মা, তোমার কি হলো...কেন আজ বেরোলাম ঘর থেকে...আম্মাগো...'

তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল সবাই, এই সুযোগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টেরি। রাফি একবার খেঁক করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে রান্নাঘরের দরজার কাছে চলে গেছে সে। দরজা পেরিয়েই দড়াম করে লাগিয়ে দিল পাল্লা।

ফিরেও তাকাল না গোয়েন্দারা।

জরুরী কণ্ঠে কিশোর বলল, 'নিশ্চয় নোট রেখে গেছেন আংকেল।'

খুঁজতে শুরু করল তিনজনে।

তিন

চিঠিটা খুঁজে পেল রবিন। জিনার আম্মার বড় ড্রেসিং টেবিলে চিরুনি চাপা দেয়া। ওপরে জিনার নাম লেখা। •

তাড়াতাড়ি খুলে জোরে জোরে পড়ল রবিন:

জিনা,

তোমার মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে থাকব। সেটা দু-দিনও হতে পারে, দুই হপ্তাও হতে পারে। রোজ সকাল ন'টায় ফোন করে তার খবরাখবর জানাব তোমাদের। চিন্তা কোরো না। মিসেস টোড তোমাদের খেয়াল রাখবেন। বাড়িঘর দেখেশুনে রাখবে।

—তোমার বাবা।

বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল জিনা। বলতে লাগল, 'আম্মা, আম্মাগো, তুমি আর আসবে না! আমি জানি! তোমাকে ছাড়া কি করে থাকব আমি!'

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। সহজে কাঁদে না জিনা। তাকে এভাবে বিলাপ করতে দেখে অস্থির হয়ে পড়ল ওরাও।

রাফিও জিনাকে কাঁদতে দেখেনি। প্রথমে অবাক হলো, তারপর অস্থির হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দার মতই। জিনার হাঁটুতে মুখ রেখে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

অনেকক্ষণ কেঁদেকেটে অবশেষে কিছুটা শান্ত হলো জিনা। মুখ তুলে বলল, 'আমি আম্মাকে দেখতে যাব।'

'কোথায় যাবে?' কিশোর বলল, 'কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জানি না। আর আমরা গেলেও ঢুকতে দেবে না। সারাদিন কিছু খাওনি। চায়ের সময় হয়ে গেছে। চলো, কিছু খেয়ে নিলে ভাল লাগবে।'

'আমি কিচ্ছু খাব না!' প্রায় ফুঁসে উঠল জিনা। 'তোমাদের ইচ্ছে হলে যাও!' আবার মুখ গুঁজল বিছানায়।

চুপ করে রইল কিশোর। জিনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে।

কয়েক মিনিট পর আবার মুখ তুলল জিনা। চোখ মুছল। মলিন হাসি ফুটল ঠোঁটে। বলল, 'সরি! কিছু মনে কোরো না! যাও, চায়ের কথা বলে এসো।'

কিন্তু কে যাবে মিসেস টোডকে চায়ের কথা বলতে? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাওয়ার অবস্থা হলো যেন ইঁদুরদের। মুসা রাজি হলো না। রবিনও আমতা আমতা করতে লাগল। শেষে কিশোরই উঠল যাওয়ার জন্যে।

রান্নাঘরের দরজা খুলে উঁকি দিল সে। টেরি বসে আছে গুম হয়ে। গালের একপাশ লাল, যেখানে চড় মেরেছিল জিনা।

মুখ ভয়ানক গম্ভীর করে মিসেস টোড বলল, 'আরেকবার খালি আমার ছেলেকে মেরে দেখুক, ওর অবস্থা কাহিল করে দেব আমি!'

'চড় খাওয়ার কাজ করেছে, খেয়েছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওসব আলোচনা করতে আসিনি আমি।'

'তাহলে কি জন্যে এসেছ?'

'চা দিতে হবে।'

'পারব না!'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে গরগর করে উঠল ঘরের কোণে বসে থাকা ডারবি, কিন্তু কাছে আসার সাহস করল না।

কুকুরটাকে পাত্তাই দিল না কিশোর। 'আপনি না দিলে আমিই নেব। রুটি কোথায় রেখেছেন? কেক?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মিসেস টোড। কিশোরও তাকিয়ে রইল একই ভঙ্গিতে। এরকম বাজে মহিলার সঙ্গে ভদ্রতা করার কোন প্রয়োজন মনে করল না সে।

দৃষ্টির লড়াইয়ে হার মানল মিসেস টোড। বলল, 'বেশ, এবারকার মত দিচ্ছি। কিন্তু এরপর শয়তানি করলে খাওয়া বন্ধ করে দেব।'

'অত সহজ না। সোজা পুলিশের কাছে যাব,' কথাটা কিছু ভেবে বলেনি কিশোর, আপনাআপনি মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।

চমকে গেল মিসেস টোড। তাড়াতাড়ি বলল, 'থাকগে, যা হওয়ার হয়েছে, কিছু মনে কোরো না। এই ডাক্তার, হাসপাতালে অস্থির করে দিয়েছে সবাইকে···যাও, আমি চা নিয়ে আসছি।'

মহিলার এই হঠাৎ পরিবর্তন অবাক করল কিশোরকে। পুলিশের কথায় এমন চমকে গেল কেন? ভাবতে ভাবতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। একটা কারণ হতে পারে, পুলিশ এলে পারকার আংকেলকে খবর দেবে। ভয়ানক রেগে যাবেন তিনি। মিসেস টোডকেও ছাড়বেন না। তাঁকে ভয় পায় মহিলা।

সবাইকে এসে খবর দিল কিশোর, 'চা আসছে।'

চা খাওয়া জমল না। কান্না থামালেও মন খারাপ করে রেখেছে জিনা। রবিন আর মুসা তাকে নানা ভাবে খুশি করার চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। চায়ের সঙ্গে কি দিয়ে গেল মিসেস টোড, খেয়ালই করল না কেউ।

যদি কোন কারণে মিস্টার পারকার ফোন করেন, এ-জন্যে খাওয়ার পর দূরে কোথাও গেল না ওরা, বাগানে বসে রইল।

রান্নাঘর থেকে হঠাৎ শোনা গেল:

জিনা, ঘিনা···

উঠে দাঁড়াল কিশোর। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। একা বসে আছে টেরি।

'এই, বেরিয়ে এসো!' কঠিন কণ্ঠে ডাকল কিশোর।

নড়ল না টেরি। 'গানও গাইতে পারব না?'

'নিশ্চয় পারবে। সে-জন্যেই তো ডাকছি। এটা পুরানো হয়ে গেছে, এসো, নতুন আরেকটা শিখিয়ে দিই।'

'বেরোলেই আমাকে মারবে।'

'না না, মারব কেন, আদর করব! একটা মেয়ের মায়ের অসুখ, তার এমনিতেই মন খারাপ, তাকে খেপাতে লজ্জা করে না! বেরোবে, না কান

ধরে বের করে আনব?'

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল মুসা।

ভয় পেয়ে গেল টেরি। চিৎকার করে ডাকল, 'মা, ও মা! কোথায় তুমি!'

জানালা দিয়ে আচমকা হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা। টেরির কান চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল।

'ছাড়ো, ছাড়ো!...ওহ্, কান ছিঁড়ে ফেলল...মা!'

ঘরে ঢুকল তার মা। এক চিৎকার দিয়ে দৌড়ে এল জানালার দিকে।

কান ছেড়ে হাতটা বের করে আনল মুসা। পালাতে গিয়েও পালাল না। কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে রইল।

চেঁচাতে লাগল মিসেস টোড, 'কত্তবড় সাহস! আমার ছেলেকে চড় মারে...কান টানে! কি, ভেবেছ কি তোমরা!'

'কিছুই না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'তবে আপনার ছেলের খানিকটা শিক্ষা দরকার। আপনারই সেটা দেয়া উচিত ছিল। পারেননি যখন আমাদেরই দিতে হচ্ছে।'

'তুমি...তুমি একটা শয়তান!'

'গাল দেবেন না। যদি কাউকে দিতেই হয়, আপনার ছেলেকে দিন। ও ওই ডার্টি কুত্তাটার চেয়েও খারাপ।'

আরও রেগে গেল মিসেস টোড, 'ওর নাম ডার্টি নয়, ডারবি!'

'ডার্টি। অত নোংরা কুত্তার এটাই ঠিক নাম। গা-টা ধোয়ান, উকুন পরিষ্কার করান, গন্ধ যাক, তারপর ভাবব ডারবি বলা যায় কিনা।'

প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে লাগল মিসেস টোড।

কেয়ারই করল না কিশোর। মুসাকে নিয়ে ফিরে এল জিনা আর রবিন যেখানে বসে আছে।

'যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে,' ঘাসের ওপর বসতে বসতে বলল কিশোর।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

'মুসা টেরির কান টেনেছে। সেটা দেখে ফেলেছে ওর মা। এরপর আর আমাদের খেতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে।'

'না দিলে নিজেরাই নিয়ে খাব,' জিনা বলল। 'শয়তান মহিলাটাকে যে কেন জায়গা দিতে গেল মা...'

'ওই দেখো, ডার্টি,' বলে উঠল মুসা।

'রাফি, যাসনে, যাসনে!' কলার ধরে আটকানোর জন্যে থাবা মারল কিশোর। ধরতে পারল না।

কেউ নেই ভেবে বেরিয়ে পড়েছিল ডারবি। রাফিকে দেখেই এমন এক চিৎকার দিল, মনে হলো মেরে ফেলা হচ্ছে ওকে।

তার ঘাড় কামড়ে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল রাফি।

লাঠি নিয়ে বেরোল মিসেস টোড। এলোপাতাড়ি বাড়ি মারতে শুরু করল। কোন কুকুরটার গায়ে লাগছে, দেখল না। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে।

পানির পাইপের দিকে দৌড় দিল রবিন।

দরজায় দেখা দিল টেরি। রবিনকে পাইপের দিকে যেতে দেখেই ঘরে ঢুকে গেল আবার। গা ভেজাতে চায় না।

গায়ে পানির ঝাপটা লাগতে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল রাফি। চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে গিয়ে মিসেস টোডের স্কার্টের নিচে লুকাল ডারবি।

'বিষ খাওয়াব আমি কুত্তাটাকে!' মুখচোখ ভয়ঙ্কর করে গজরাতে লাগল মিসেস টোড। 'এত্তবড় শয়তান! বিষ খাইয়ে না মেরেছি তো…'

গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

আগের জায়গায় এসে বসল গোয়েন্দারা।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিনা বলল, 'সত্যিই কি বিষ খাওয়াবে?'

'বলা যায় না,' কিশোর বলল, 'ওই মহিলাকে বিশ্বাস নেই। চোখে চোখে রাখতে হবে রাফিকে। আমাদের নিজেদের খাবার থেকে ভাগ দিতে হবে।'

কুকুরটাকে কাছে টেনে নিল জিনা। গলা জড়িয়ে ধরল। 'ইস্, আম্মা-আব্বা যে কবে আসবে! এই যন্ত্রণা থেকে তাহলে মুক্তি পাই!'

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দ চমকে দিল সবাইকে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল ওরা। প্রায় উড়ে এসে ঘরে ঢুকল জিনা। থাবা দিয়ে তুলে নিল রিসিভার।

'জিনা?' বাবার গলা শুনে দুরুদুরু করে উঠল জিনার বুক।

'আব্বা, আম্মা কেমন আছে? জলদি বলো!'

'পরশুর আগে বলা যাবে না। নানা রকম টেস্ট করছে ডাক্তাররা।'

'তুমি কবে আসছ?'

'বলতে পারছি না। তোমার মাকে ফেলে আসি কি করে? চিন্তা কোরো না। কাল সকালে আবার ফোন করব।'

'আব্বা,' ককিয়ে উঠল জিনা, 'তোমরা নেই, খুব অশান্তিতে আছি। মিসেস টোড একটুও ভাল না।'

'শোনো, জিনা,' অধৈর্য হয়ে বললেন মিস্টার পারকার, 'নিজে ভাল তো জগৎ ভাল। তোমরা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোরো, সে-ও তোমাদের সঙ্গে করবে। এসব ফালতু কথা নিয়ে বিরক্ত করবে না আমাকে। এমনিতেই অনেক ঝামেলায় আছি।'

'আমি আসব। আম্মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'না, আসবে না, বাড়িতে থাকো। বাড়ি থেকে যাবে না কোথাও। আরও হপ্তা দুয়েকের আগে তোমার আম্মাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। দেখি, ঝামেলা কেটে গেলে আমি একবার এসে দেখে যাব তোমাদের। গুড-বাই।'

লাইন কেটে দিলেন তিনি।

রিসিভার রেখে বন্ধুদের দিকে ফিরল জিনা। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'পরশুর আগে ওরা বলতেই পারবে না আম্মার কি অবস্থা। আব্বার আসারও কোন ঠিক নেই। ততদিন আমাদের কাটাতে হবে মিসেস টোডের সঙ্গে। ওই

বুড়িটার সঙ্গে থাকার কথা ভাবতেই এখন কেমন লাগছে আমার!'

চার

এতটাই রেগেছে মিসেস টোড, সেদিন সন্ধ্যায় ওদেরকে খাবারই দিল না। রাতের খাওয়া বন্ধ। বলতে গিয়ে কিশোর দেখে, রান্নাঘরে তালা লাগানো।

ফিরে এসে সবাইকে জানাল খবরটা। 'তালা লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে আমরা কিছু বের করে আনতে না পারি। এত্তবড় শয়তান মহিলা জীবনে দেখিনি আমি!'

'ঘুমাক, তারপর ভাঁড়ারে গিয়ে খুঁজে দেখব কিছু আছে কিনা,' জিনা বলল।

খিদেয় পেট জ্বলছে। কান পেতে শুনছে কিশোর, মিসেস টোড আর টেরি ঘুমাতে গেল কিনা। ওপরতলায় উঠে গেল ওরা. দরজা লাগানোর শব্দ হলো, তারও কিছুক্ষণ পর পা টিপে টিপে নামল সে, রান্নাঘরের দিকে এগোল।

ঘর অন্ধকার, আলো জ্বালতে যাবে, হঠাৎ কানে এল ভারী নাক ডাকানোর শব্দ। কে? ডার্টি? না, কুকুর তো ওরকম করে নিঃশ্বাস ফেলে না! মানুষের মত লাগছে।

সুইচে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। চোর-টোর ঢুকল না তো?

নাহ্, দেখতেই হচ্ছে। আলো জ্বেলে দিল সে।

ছোটখাট একজন মানুষ শুয়ে আছে সোফায়। গভীর ঘুম। হাঁ করে শ্বাস টানছে।

দেখতে মোটেও ভাল না লোকটা। কতদিন শেভ করেনি কে জানে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোসল করে না, এমনকি হাতমুখও বোধহয় ধোয় না, হাতে ময়লা, নখের ভেতর ময়লা ঢুকে কালো হয়ে আছে। মানুষ এত নোংরা হতে পারে ভাবা যায় না। চুল আর নাক টেরির মত।

'ও, তাহলে এই ব্যাপার,' ভাবল কিশোর। 'ইনি তাহলে টেরি মিয়ারই বাপ। বাপ-মা যার এরকম, সে আর ভাল হবে কি।'

নাক ডাকিয়েই চলেছে লোকটা। কি করবে ভাবতে লাগল কিশোর। ভাঁড়ারে ঢুকতে গেলে যদি শব্দ শুনে জেগে যায় লোকটা? চেঁচামেচি শুরু করে দেবে না তো? অন্যায় ভাবে ঢুকেছে বলে যে বেরিয়ে যেতে বলবে তারও উপায় নেই। তার স্ত্রী চাকরি করে এখানে। তাকে দেখতে আসতেই পারে স্বামী। আংকেল-আন্টিও এতে দোষের কিছু দেখবেন না। বিপদেই পড়া গেল!

খুব খিদে পেয়েছে তার। এবার জিনাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই খাওয়া মোটেও সুবিধের হচ্ছে না। ফলে পেটের চাহিদা রয়েই যাচ্ছে। ভাঁড়ারে লোভনীয় খাবার আছে ভাবতেই জিভে পানি এসে গেল তার। আলো

নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে এগোল আবার।

দরজা খুলল। অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে তাক হাতড়াতে শুরু করল। হাতে ঠেকল একটা পাত্র, খাবার আছে। গন্ধ শুঁকে বুঝল, মাংস।

আরেকটা পাত্র রয়েছে ওটার পাশে। বেশ বড়। এটা আর শুঁকতে হলো না, আঙুল ছুঁইয়েই বুঝল, ভেজিটেবল। বাহ্, চমৎকার! মাংস, ভেজিটেবল, আর কি চাই? রুটি হলেই হয়ে যায় এখন। সেটা পেতে দেরি হলো না। ট্রেতে অনেক আছে।

পাত্রগুলো ট্রেতে গুছিয়ে নিয়ে ভাঁড়ার থেকে বেরিয়ে এল সে। পা দিয়ে ঠেলে আস্তে লাগিয়ে দিল পাল্লা।

অন্ধকারে এগোতে গিয়ে পথ ভুল করে ফেলল। সোজা এসে হোঁচট খেল সোফায়। ঝাঁকি লেগে ছলকে পড়ল তরকারির ঝোল, কয়েক টুকরো তরকারিও পড়ল। আর পড়বি তো পড় একেবারে মিস্টার টোডের হাঁ করা মুখে।

চমকে জেগে গেল লোকটা।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল কিশোর। কোন শব্দ না শুনলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে লোকটা। হয়তো পড়তও, কিন্তু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া তরকারির ঝোল বিরক্ত করছে তাকে। ঝটকা দিয়ে উঠে বসল। 'কে? কে ওখানে? টেরি? কি করছিস?'

জবাব দিল না কিশোর। আন্দাজে দরজার দিকে সরে যেতে লাগল।

সন্দেহ হলো লোকটার। লাফ দিয়ে সোফা থেকে নেমে গিয়ে দেয়ালে সুইচবোর্ড হাতড়াতে লাগল। পেয়েও গেল।

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। *'তাকাও এদিকে!* কি করছ?'

'আমিও তো সে-কথাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। আপনি এখানে কি করছেন?'

'তুমি কে?' হাত দিয়ে মুখে লেগে থাকা তরকারির ঝোল মুছতে মুছতে বিড়বিড় করে বলল, *'তাকাও এদিকে!'*

'বললে তো আর চিনবেন না। এটা আমার আংকেলের বাড়ি।'

'আমার স্ত্রী এখানে চাকরি করে,' খসখসে গলায় বলল লোকটা। 'আমার জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে। ছুটি পেয়েছি। দেখতে এসেছি তাকে। তোমার আংকেলের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে আমার স্ত্রী, আমাকে আসার অনুমতি দিয়েছেন।'

এই ভয়ই করছিল কিশোর। মহিলা টোড, আর একটা পুঁচকে টোডের জ্বালায়ই অস্থির হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখন জলজ্যান্ত এক পুরুষ টোড! বাড়িতে আর টিকতে দেবে না ওদেরেকে।

'অনুমতি দিয়েছেন, না? বেশ, কাল সকালে তো আংকেল ফোন করবেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করব। এখন সরুন সামনে থেকে। দোতলায়

যাব।'

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে টোড। কিশোরের হাতের ট্রে-র দিকে চোখ সরু করে তাকাল। 'আংকেলের বাড়ি, না! ভাঁড়ার থেকে খাবার চুরি করছ কেন তাহলে? চোর কোথাকার...'

'বাজে কথা বলবেন না, সরুন!' ধমকে উঠল কিশোর। 'কাল সকালেই একটা ব্যবস্থা করব আপনার। চুরি করে অন্যের বাড়িতে রাতদুপুরে শুয়ে থাকা বের করব।'

ধমকে কাজ হলো না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল টোড। সরার কোন লক্ষণ নেই। কিশোরের সমানই লম্বা। মুখে শয়তানি হাসি।

ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা নোংরা চেহারাটা সহ্য করতে পারছে না কিশোর। ঠোঁট গোল করে জোরে শিস দিয়ে ডাকল রাফিকে।

লাফ দিয়ে জিনার বিছানা থেকে নামল রাফি। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এল। দরজার কাছে এসেই গন্ধ পেল টোডের। একটুও পছন্দ হলো না। গেল খেপে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গরগর করতে করতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

'তাকাও এদিকে!' একটানে পাল্লা লাগিয়ে দিল টোড। বাইরে রয়ে গেল রাফি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে নোংরা হলদেটে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'এখন?'

'এই তরকারিগুলো তোমার মাথায় ঢালব!' ভেজিটেবলের পাত্রটা তুলে এগিয়ে এল কিশোর। মেজাজ পুরো খারাপ হয়ে গেছে।

ঝট করে মাথার ওপর দু-হাত তুলে নিচু হয়ে গেল টোড। 'না না, এমনি...দুষ্টুমি করছিলাম তোমার সঙ্গে!...*তাকাও এদিকে,* খাবারগুলো নষ্ট কোরো না। ওপরতলায় যাবে তো, যাও।'

সোফার কাছে সরে গেল আবার সে।

দরজা খুলল কিশোর।

গরগর করছে রাফি। 'শয়তান লোকটার' ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি চাইছে।

তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল টোড। 'ওটাকে আটকাও! কুত্তা দেখতে পারি না আমি!'

'ডারবিটাকে সহ্য করো কিভাবে তাহলে? বৌকে ভয় পাও বুঝি?...রাফি, ছেড়ে দে। তোর গরগরানি শোনার যোগ্যও না ও।'

ওপরে উঠে এল কিশোর। নিচতলায় কথা কাটাকাটির শব্দ শুনেছে, কি হয়েছে শোনার জন্যে তাকে ঘিরে এল সবাই।

জানাল কিশোর। টোডের মুখে তরকারি পড়ার কথা শুনে হেসেই অস্থির সব। রাফি পর্যন্ত কিছু না বুঝে খেঁক খেঁক করে হাসল।

হাসতে হাসতে বলল রবিন, 'সবটা তরকারি মাথায় না ফেলে ভালই করেছ। তাহলে আমাদের খাওয়াটা যেত। মিসেস টোড শুনলে কি করবে ভাবছি।'

'কি আর করবে,' খাওয়া শুরু করে দিয়েছে মুসা। 'বড়জোর নিজের মাথার চুল ছিঁড়বে···যা-ই বলো, রাঁধে কিন্তু ভাল। মাংসটা চমৎকার হয়েছে।'

চেটেপুটে সব সাফ করে ফেলল ওরা।

এরপর টোড পরিবারকে নিয়ে আলোচনায় বসল।

'বেঙনি আর বেঙাচির জ্বালায়ই মরছি, আবার এসেছে একটা বেঙ,' মুসা বলল তিক্তকণ্ঠে। 'এবার বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে আমাদের। জিনা, কাল তোমার আব্বাকে বুঝিয়ে বলো সব।'

'বলব। তবে শুনবে বলে মনে হয় না। কিছু শুনতেও চায় না, বুঝতেও চায় না, আব্বাকে নিয়ে এই হলো সমস্যা,' হাই তুলতে শুরু করল জিনা। 'ঘুম পাচ্ছে আমার। রাফি, চল।'

ছেলেদেরকে তাদের ঘরে রেখে নিজের ঘরে শুতে চলে গেল সে।

পেটে খিদে ছিল বলে এতক্ষণ ছটফট করেছে। কিন্তু এখন শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল চারজনেই।

সকালে ওদেরকে অবাক করে দিয়ে নাস্তা তৈরি করে দিল মিসেস টোড।

কিশোর অনুমান করল, 'আংকেল ফোন করবেন তো, আমরা যদি কিছু বলে দিই, এ-জন্যে বানিয়ে দিয়ে গেল। মহা ধড়িবাজ মহিলা।'

খাওয়ার পর ঘড়ি দেখল মুসা। মাত্র আটটা বেজেছে। বলল, 'ফোন তো করবেন ন'টায়। এখনও একঘণ্টা বাকি। চলো, সৈকত থেকে হেঁটে আসি।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাগানে বসে আছে টেরি। জিনাকে দেখে মুখ ভেঙচাল। রাফি ঘাউ করে উঠতেই কুঁকড়ে গেল।

বাগানের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। রবিন বলল, 'আমার মনে হয় মাথায় দোষ আছে ছেলেটার। নইলে এরকম করে না।'

'বাদ দাও ওর কথা,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর।

ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে বাড়ি ফিরল ওরা। বাগানে ঢুকতেই কানে এল টেলিফোনের শব্দ।

দৌড় দিল জিনা। তার আগেই মিসেস টোড ধরে ফেলুক, এটা চায় না।

কিন্তু কাছেই ছিল মহিলা, যেন ফোন ধরতেই তৈরি হয়ে ছিল, ধরে ফেলল।

হলে ঢুকতেই গোয়েন্দাদের কানে এল, মিসেস টোড বলছে, '···হ্যাঁ, স্যার, সব ঠিক আছে, স্যার।···না, কোন অসুবিধে নেই, স্যার। আমার স্বামীও চলে এসেছে, ছুটি পেয়েছে জাহাজ থেকে। আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না, স্যার। সব সামলে রাখব। আপনার যখন ইচ্ছে আসুন···না না, বাচ্চাদের নিয়ে একটুও ভাববেন না···'

আর সহ্য করতে পারল না জিনা। বন্য হয়ে উঠেছে সে। একথাবায় কেড়ে নিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল, 'আব্বা, আম্মা কেমন আছে?'

'আর খারাপ হয়নি। কিন্তু কালকের আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

তোমাদের জন্যে খুব চিন্তায় ছিলাম। মিস্টার টোড এসেছে শুনে বাঁচলাম। আর কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের। বাড়িঘরের জন্যেও চিন্তা নেই। তোমার আম্মাকে বলব সব ঠিক আছে…'

'না, নেই! ভয়ানক অবস্থা এখানে। আব্বা, শোনো, টোডদের বিদেয় করে দিই, আমরাই সব সামলাতে পারব…'

'বলো কি!' আঁতকে উঠলেন যেন মিস্টার পারকার। 'অসম্ভব! তোমরা পারবে না…যা বলি শোনো…'

'আব্বা, কিশোর কথা বলবে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কিশোরের হাতে রিসিভার গুঁজে দিল জিনা। যদি সে কিছু করতে পারে, বোঝাতে পারে তার আব্বাকে।

'হ্যালো, আংকেল, আন্টি কেমন?'

'আগের মতই। তবে আর খারাপ হয়নি।'

'ভাল। শুনে খুশি হলাম। আংকেল, শুনুন, মিসেস টোডরা বড্ড জ্বালাচ্ছে…'

'আরে, তুমিও তো জিনার মতই কথা বলছ দেখছি!' রেগে গেলেন মিস্টার পারকার। 'মহিলার বয়েস হয়েছে, সেটা দেখবে না? জোয়ান মানুষের মত কি আর সব ঠিকমত পারে? কোথায় জিনাকে বোঝাবে, তা না, তোমরাও অভিযোগ শুরু করলে। দেখো, যদি থাকতে পারো থাকো, বেশি কষ্ট হলে বাড়ি চলে যাও। তোমার আন্টি ভাল হলে আবার এসো। আমার আর কিছু বলার নেই।'

অন্য কেউ এভাবে কথা বললে স্তব্ধ হয়ে যেত কিশোর। কিন্তু পারকার আংকেলকে চেনা আছে। তাই রাগল না। বোঝানোর চেষ্টা করল, 'আংকেল, আপনি বুঝতে পারছেন না, ওরা লোক ভাল না…'

'যত খারাপই হোক, বারো-চোদ্দ দিনে আর কিছু এসে যাবে না… রাখলাম…'

কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। কাছেই যে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস টোড, ভুলে গিয়ে, জিনার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না, হলো না…'

মিস্টার পারকার কি বলেছেন আন্দাজ করে ফেলেছে কুটিলা মহিলা। হাসিমুখে বলে উঠল, 'আমরা ভাল না, না? খারাপের কিছু তো দেখোনি এতদিন, এইবার দেখবে। মিস্টার পারকার থাকার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন, আমরা থাকব, দেখি তোমরা কি করো?'

পাঁচ

গটমট করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল মিসেস টোড। চেঁচিয়ে কথা বলে সুখবরটা শোনাতে লাগল স্বামী আর ছেলেকে।

বসার ঘরে সোফায় বসে রইল ছেলেমেয়েরা। সবারই মুখ কালো। নীরবে তাকাচ্ছে একে অন্যের দিকে।

'আব্বাটাকে যে দেখতে পারি না আমি, এ-জন্যেই!' হঠাৎ ফুঁসে উঠল জিনা। 'কোন কথা কখনও শুনতে চায় না!'

'আসলে আন্টিকে নিয়ে খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন তো,' মুসা বলল। 'আমাদের কপালই খারাপ, ন'টার আগেই ফোন করেছেন। কোন আক্কেলে যে বেরিয়েছিলাম!'

'আব্বা তোমাকে কি বলেছে, বলো তো?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'বলেছেন, বেশি কষ্ট হলে বাড়ি চলে যেতে। আন্টি ভাল হলে আবার আসতে...'

'তুমি তো খালি আব্বাকে *ভাল ভাল* বলো, বোঝো এখন কার সঙ্গে বাস করি! শোনো, এখানে থেকে তোমাদের কষ্ট করার কোন দরকার নেই। চলে যাও। বেড়াতে এসে অযথা কেন অত্যাচার সহ্য করবে।'

'কি যে বলো না। তোমাকে একা বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাব ভাবলে কি করে? যা-ই ঘটে ঘটুক, আমরা থাকছি। মাত্র তো দুটো হপ্তা, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'না, যাবে না! এত শয়তান লোকের সঙ্গে থাকতে গেলে দুই হপ্তা দুশো বছরেও শেষ হবে না। বাড়ি সামলে রাখার জন্যে ওদেরকে জায়গা দিয়েছে তো আব্বা, রাখুক ওরা। তোমরা বাড়ি চলে যাও, আমিও আমার মত চলব।'

ঘাবড়ে গেল কিশোর। খেপিয়ে দেয়া হয়েছে জিনাকে। কি করে বসবে এখন, তার ঠিক নেই।

'বোকার মত কথা বোলো না। কিভাবে চললে ভাল হবে, সবাই মিলে আলোচনা করে একটা উপায় বের করে ফেলতে পারব।'

'দেখো, টিকতে পারবে না এখানে, চলে তোমাদের যেতেই হবে।... রাফি, চলো, ঘুরে আসি।'

'আমরাও যাব তোমার সঙ্গে,' মুসা বলল।

বাধা দিল না জিনা।

সৈকতে এসে বসল ওরা।

গুম হয়ে আছে জিনা। মায়ের জন্যে দুঃখ, বাবার ওপর রাগ-অভিমান,

টোডদের ওপর ঘৃণা, সব মিলিয়ে অস্থির করে তুলেছে তাকে। চিরকাল সুখে থেকে থেকে মানুষ, এসব সহ্য করতে পারছে না।

কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আমরা চলে গেলে কি করার ইচ্ছে তোমার, বলো তো? কিছু একটা প্ল্যান তো নিশ্চয় করেছ।'

'না, বলব না। বললে আমাকে করতে দেবে না তোমরা।'

'কেন দেব না?' রবিন বলল, 'খারাপ তো আর কিছু করবে না…'

'যদি করিই, তোমাদের কি?' রেগে উঠতে গিয়ে সামলে নিল জিনা, 'সরি, ঝগড়া করতে চাই না। অহেতুক দাওয়াত দিয়ে এনে তোমাদের ছুটিটা পণ্ড করলাম।'

'পণ্ড হতে দিচ্ছি না, নিশ্চিন্ত থাকো,' জোরগলায় বলল মুসা। 'দরকার হয় পিটিয়ে বের করব বেঙগুলোকে…বাড়িঘর যদি ঠিকঠাক রাখতে পারি আমরা, আংকেলের কিছু বলার থাকবে না…'

'ওই বাড়িটাতে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না আমার আর। বাইরেই ভাল।'

'চলো তাহলে,' কিশোর বলল, 'দূরে কোথাও চলে যাই। তোমরা এখানে বসো, আমি খাবার নিয়ে আসি।'

'হুঁহ্, গেলেই দেবে আরকি…'

'দেখোই না দেয় কিনা,' উঠে বাড়ি রওনা হলো কিশোর।

রান্নাঘরে তখন হাসাহাসি চলছে, কথা বলছে তিন টোড। কিশোরকে ঢুকতে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেল।

পাত্তাই দিল না কিশোর। ভারী গলায় বলল, 'স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিন। বেড়াতে যাব আমরা।'

'বা-বা, আব্দার!' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল মিসেস টোড। 'রাতের বেলা সব চুরি করে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলেছে, এখন এসেছে স্যান্ডউইচের জন্যে। শুধু রুটি আছে ওখানে, নিলে নাও, নইলে বিদেয় হও।'

সোফায় শুয়ে আছে টেরি। হাতে একটা কমিকের বই। সুর করে বলে উঠল, *'কিশোর, বিশোর…'*

'এক চড় মেরে দাঁত ফেলে দেব, শয়তান ছেলে কোথাকার!'

কিশোরকে ভয় পায় টেরি। ধমক খেয়ে চুপ হয়ে গেল।

খেঁকিয়ে উঠল মিসেস টোড, 'মারো তো দেখি চড়, কত্তবড় সাহস!'

'মারলে ধরে রাখতে পারবেন না। বজ্জাত বানিয়েছেন, আবার বড় বড় কথা…'

গলা খাঁকারি দিল এককোণে বসা মিস্টার টোড। 'দেখো ছেলে, *তাকাও এদিকে…'*

'আপনার দিকে কে তাকায়!'

'দেখো, *তাকাও এদিকে,'* রেগে গেছে টোড। বসা থেকে উঠল।

'বার বার *তাকাও এদিকে, তাকাও এদিকে* করছেন কেন? বললাম না তাকাব না। দেখার মত আহামরি কোন চেহারা নয়।'

চেঁচিয়ে উঠল মিসেস টোড, 'খবরদার, মুখ সামলে…'

'মুখ সামলে আপনি কথা বলবেন,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল মহিলার দিকে।

কয়েক মুহূর্তের বেশি তার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে পারল না মিসেস টোড। ছেলেটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা অস্বস্তিতে ফেলে দেয় তাকে। শান্তকণ্ঠে কথা বলে, কিন্তু জিভে যেন বিছুটির জ্বালা। সসপ্যান দিয়ে মাথায় একটা বাড়ি মারতে ইচ্ছে করছে তার, কিন্তু অতটা সাহস করল না। এই ছেলে বিপজ্জনক ছেলে।

কিশোরের মাথায় তো মারতে পারল না, টেবিলেই ধ্রাম করে সসপ্যান আছড়ে ফেলল মিসেস টোড।

আচমকা এই শব্দে ভড়কে গিয়ে গোওও করে উঠল ডারবি।

'হাল্লো, ডার্টি!' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল কিশোরের কণ্ঠে, 'আছিস কেমন? গোসল করানো হয়েছে তোকে? মনে তো হচ্ছে না…'

'ওর নাম ডার্টি নয়!' ঝাঁঝিয়ে উঠল মিসেস টোড।

'ধুয়েমুছে গন্ধ দূর করুন, ডারবিই বলব। যতক্ষণ গন্ধে বমি আসবে, ততক্ষণ ডার্টি…যাকগে, ফালতু কথা বলার সময় নেই। আপনি ব্যস্ত, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, স্যান্ডউইচই তো ক'টা, লাগবে না। বাইরে থেকেই কিনে খেয়ে নেব। তবে রাতের খাওয়াটা যেন ভাল হয়, বলে দিলাম।'

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরল কিশোর। শিস দিতে দিতে এগোল দরজার দিকে। বেরিয়ে যাবে, ঠিক এই সময় আবার বলে উঠল টেরি, *'কিশোর, বিশোর…'*

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল কিশোর, 'কি বললে!'

কুঁকড়ে গেল টেরি। গোওও করে উঠল ডারবি।

বরফের মত শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর, 'বলো তো আবার শুনি!'

কিন্তু আর বলার সাহস করল না টেরি। কুকুরটাও ভয় পাচ্ছে কিশোরকে। মিসেস টোড চুপ। মিস্টার টোড স্তব্ধ।

সবার ওপর একবার করে কড়া নজর বোলাল কিশোর। মিস্টার পারকার থাকার অনুমতি দিয়েছেন বলেই সাত খুন মাপ হয়ে যায়নি; ওদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে ওরাও ছাড়বে না, বুঝিয়ে দিল এটা। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমন ভঙ্গিতে আবার শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এল।

বন্ধুদেরকে সব জানাল সে।

জিনা বলল, 'কিন্তু এভাবে মুখ কালাকালি করে বাড়িতে বাস করা যায়!'

সারাটা দিন চুপচাপ রইল সে। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই তার মুখে হাসি ফোটাতে পারল না তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'জিনা, চলো, তোমার দ্বীপ থেকে ঘুরে আসি।'

মাথা নাড়ল জিনা। 'ভাল লাগছে না। বাড়ির কাছাকাছি থাকতে চাই। আব্বা আবার ফোন করতে পারে। বুড়িটাকে ধরতে দেব না। ধরলেই

সাতখান করে লাগাবে আব্বার কাছে।'

চায়ের সময় বাড়ি ফিরল ওরা। রুটি, মাখন আর জ্যাম দিল ওদেরকে মিসেস টোড, কেকটেক কিচ্ছু না। রুটিও এত কম, শুধু ওদের চারজনেরই হবে, রাফির জন্যে নেই। দুধ টক হয়ে গেছে, খাওয়া গেল না। চায়ে যে মিশিয়ে খাবে, তারও উপায় নেই। বাধ্য হয়ে দুধ ছাড়াই চা খেল ওরা।

জানালায় দেখা দিল টেরি। হাতে একটা বাসন। বলল, 'এই যে, কুত্তাটার খাবার।'

জানালার নিচে ঘাসের ওপর ওটা নামিয়ে রেখে পালাল সে।

মাংসের গন্ধ পেয়ে ছুটে বেরোল রাফি

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জিনা। 'যাসনে, রাফি, যাসনে!'

বেরিয়ে দেখল বাসনের মাংস শুঁকছে কুকুরটা।

'খেয়ে ফেলিসনি তো!'

জানালা দিয়ে রবিন বলল, 'না, খায়নি। কেবল শুঁকেছে। আমি দেখেছি।'

জিনার পিছু পিছু বেরিয়ে এসেছে কিশোর। বাসনটা তুলে নিয়ে শুঁকল। কাঁচা মাংসের গন্ধ। আর কোন গন্ধ পাওয়া গেল না।

রবিন আর মুসাও বেরোল।

'খাইছে!' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'বিষটিষ দেয়নি তো?'

'দাঁড়াও, দেখি।' গলা চড়িয়ে ডাক দিল কিশোর, 'ডারবি! ডারবি!'

লেজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল ছোট্ট কুকুরটা। মাংস দেখাতেই দৌড়ে আসতে লাগল।

আরেক দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল টেরি। 'ডারবি, যাবি না, ডারবি! খবরদার, ওই মাংস খেতে দেবে না ওকে!'

'কেন দেব না? বলো, কেন দেব না?'

'ও মাংস খায় না। কেবল কুকুরের বিস্কুট।'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'কালও ওকে মাংস খেতে দেখেছি! এখনও তো মাংস দেখে ছুটে এল!'

হঠাৎ একটান দিয়ে কিশোরের হাত থেকে বাসনটা কেড়ে নিয়ে দৌড় দিল টেরি। রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

পেছনে দৌড় দিতে গেল মুসা, হাত ধরে তাকে থামাল কিশোর। 'যেয়ো না। গিয়ে দেখবে আগুনে ফেলে দিয়েছে। ওই মাংস আর পাবে না।'

'নিশ্চয় বিষ দিয়েছিল!' শিউরে উঠল জিনা।

'ইঁদুরের বিষটিষ হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'যাকগে, ভয় পেয়ো না। মুখে তো আর দেয়নি রাফি।'

'কিন্তু দিতে তো পারত...আবার খাওয়ানোর চেষ্টা করবে ওরা...'

'আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। শুধু হুমকি দিয়েছে ভেবেছিলাম। কিন্তু সত্যিই যে দেবে ভাবিনি।'

'আমাদেরও খাইয়ে দেবে না তো!' শঙ্কিত হয়ে পড়েছে রবিন।

'কুকুরকে যখন দিয়েছে, মানুষকেও দিতে পারে…'

'অত সাহস করবে না। চার-চারজন মানুষকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে, অতই সোজা!'

ছয়

রাত হলো।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ল মুসা। বলল, 'রাতে খেতে দেবে বলে তো মনে হয় না। কিশোর, আজও কি চুরি করতে হবে নাকি?'

যতই কঠোরতা দেখাক, গালাগাল করুক, আরেকবার টোডের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। ভয় পেয়েছে, তা নয়, আসলে বিরক্ত লাগছে। হঠাৎ করেই রাগ হতে লাগল নিজের ওপর। জিনাদের বাড়ি মানে ওদেরও বাড়ি, টোডদের চেয়ে এখানে তাদের অধিকার অনেক অনেক বেশি, ওদের ভয়ে চুরি করতে যায় কেন সে? খাবারের জন্যে অনুরোধই বা করতে যায় কেন?

উঠে দাঁড়াল সে, 'রাফি, আয় তো আমার সঙ্গে।'

'আমি আসব?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে আজ বেঙের বাচ্চার নাক ফাটিয়ে দেব।'

'না, তুমি থাকো। নাক ফাটানোর সময় এখনও হয়নি।'

প্যাসেজ ধরে রান্নাঘরের দিকে এগোল কিশোর। রেডিও বাজছে। তাই ঘরের কেউ কিশোরের পায়ের আওয়াজ শুনল না। সে দরজায় গিয়ে দাঁড়ানোর আগে জানতে পারল না কিছু। সবার আগে চোখ পড়ল টেরির। দেখে দরজায় কিশোর, তার পেছনে রাফি।

বিশাল কুকুরটাকে বাঘের মত ভয় পায় সে। তাকে দেখে রাফি ঘাউ ঘাউ করে উঠতেই লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে সোফার পেছনে লুকাল।

রেডিও অফ করে দিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল মিসেস টোড, 'কি চাই?'

'রাতের খাবার দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'রুটি আর কিছু পনির পাবে, ব্যস, আর কিছু না। নিয়ে যাও।'

'কেন, আপনার বাবার টাকায় কেনা খাবার, ভাল কিছু দিতে এত কষ্ট হয়?'

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল মিসেস টোড। চেঁচিয়ে উঠল, 'গাল দিচ্ছ কোন সাহসে!'

'কথা না শুনলে আরও খারাপ কিছু করব,' কোনও বয়স্ক মহিলার সঙ্গে এতটা অভদ্র আচরণ জীবনে করেনি কিশোর। সহ্যের শেষ সীমায় চলে গেছে সে। 'রাফি, খেয়াল রাখ। সোজা কামড়ে দিবি, বলে রাখলাম তোকে।'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল রাফির চেহারা। গরগর করে গজরাতে লাগল।

জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর, মৃদু শিস দিতে দিতে এগোল ভাঁড়ারের দিকে। জানে তার এই আচরণ আরও খেপিয়ে দেয় মিসেস টোডকে, সে-জন্যেই আরও বেশি করতে লাগল এরকম। 'বাহ্, ভাঁড়ার কি করে বোঝাই করে রাখতে হয় আপনি জানেন, মিসেস টোড। মুরগীর রোস্ট! আহ্, গন্ধেই পানি এসে যাচ্ছে জিভে। মনে হচ্ছে কত বছর খাই না। নিশ্চয় আজ সকালে জবাই করেছে মিস্টার টোড। অনেক কঁক-কঁক শুনেছি। আরে, টমেটো! চমৎকার! গাঁয়ের সবচেয়ে ভালটা নিয়ে আসা হয়েছে, বুঝতে পারছি। আরি সব্বোনাশ, আপেল-পাইও আছে! আপনি সত্যি ভাল রাঁধেন মিসেস টোড, স্বীকার করতেই হবে।'

বড় একটা ট্রে নিয়ে এক এক করে তাতে পাত্রগুলো তুলতে শুরু করল সে।

চিৎকার করে বলল মিসেস টোড, 'জলদি রাখো! ওগুলো আমাদের খাবার!'

'ভুল করলেন,' মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর। 'এগুলো আমাদের খাবার। আজ সারাদিন খাওয়াটা ভাল হয়নি, রাতেও না খেয়ে থাকতে পারব না।'

'দেখো ছেলে, *এদিকে তাকাও!'* এত সুস্বাদু খাবারগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল মিস্টার টোড।

'আপনার দিকে তাকাব? কেন?' যেন সাংঘাতিক অবাক হয়েছে কিশোর, 'এমন কি মহামানব হয়ে গেছেন আপনি? শেভ করেছেন? গোসল করেছেন? মনে তো হয় না। না, মিস্টার টোড, আপনার দিকে তাকানোর রুচি হচ্ছে না।'

বাকহারা হয়ে গেল মিস্টার টোড। একটা ছেলের জিভে যে এতটা ধার থাকতে পারে, কল্পনাই করেনি। আরও দু-বার আনমনেই বিড়বিড় করল, 'দেখো, *এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও!'*

'উফ্, আবারও সেই একই কথা! অসহ্য! আচ্ছা মিস্টার টোড, দুনিয়ায় এত নাম থাকতে আপনার নাম টোড রাখতে গিয়েছিল কেন? টোড কাকে বলে জানেন তো? বেঙ। তা-ও ভাল জাতের হলে এককথা ছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে যেগুলো চলে সেগুলো...'

'চুপ করো পাজি ছেলে কোথাকার!' আর সহ্য করতে না পেরে ধমকে উঠল মিসেস টোড।

কিশোরকে কিছু বলতে হলো না, ঘাউ করে বিকট হাঁক ছাড়ল রাফি।

চমকে উঠে পিছিয়ে গেল মিসেস টোড। কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, 'সব নিয়ে গেলে আমরা কি খাব, বলো?'

'কেন, রুটি আর পনির রয়েছে না, যেগুলো আমাদের জন্যে রেখেছিলেন। তাই খেয়ে নিন।'

কুকুরের কথা ভুলে গিয়ে একটা চামচ তুলে কিশোরকে বাড়ি মারতে গেল মিসেস টোড।

আবার ঘাউ করে লাফিয়ে এসে সামনে পড়ল রাফি। কামড়ে দিতে গেল।

'বাবাগো!' বলে লাফ দিয়ে সরে গেল মিসেস টোড। 'কি শয়তান কুত্তারে বাবা! আরেকটু হলেই আমার হাত কেটে নিয়েছিল!'

'আপনাকে তো বলেছি, গোলমাল করবেন না, করছেন কেন?'

'দাঁড়াও, এমন শিক্ষা দেব একদিন···' ফোঁস ফোঁস করতে লাগল মিসেস টোড।

'চেষ্টা তো আজও কম করেননি, পেরেছেন? আজকে মাপ করে দিলাম, আবার যদি এরকম করেন, ওই যে বলেছি, সোজা পুলিশের কাছে যাব।'

আগের বারের মতই পুলিশের কথায় ভয় পেয়ে গেল মহিলা। চট করে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে গেল।

সন্দেহ হলো কিশোরের, কোন অপরাধ করে এসে এখানে লুকায়নি তো লোকটা? নইলে পুলিশের কথা শুনলেই ঘাবড়ে যায় কেন? আসার পর থেকে একটিবারের জন্যে ঘরের বাইরেও যায়নি, এটাও সন্দেহজনক।

খাবারের ট্রে হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। পেছনে রাফি; খুব হতাশ হয়েছে কারও পায়ে একটা অন্তত কামড় বসাতে পারেনি বলে।

যুদ্ধজেতা বীরের ভঙ্গিতে বসার ঘরে ঢুকল কিশোর। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এসো, দেখে যাও, কি নিয়ে এসেছি।'

সব কথা শুনে হুল্লোড় করে উঠল সবাই।

রবিন বলল, 'সাহস আছে তোমার, কিশোর। ওই মহিলাটার সামনে যেতেই ভয় করে আমার।'

'ভয় কি আমারও কম করছিল। কেবল সঙ্গে রাফি থাকাতেই পার হয়ে এলাম।'

ছুরি-চামচ-প্লেটের অভাব হলো না। সাইডবোর্ড থেকে বের করে আনল জিনা। চায়ের সময় খাওয়ার পর রুটি বেঁচে গিয়েছিল, তারপরেও রান্নাঘর থেকে বড় আরেকটা নিয়ে এসেছে কিশোর। কারোরই কম পড়ল না, এমন কি রাফিরও পেট ভরল।

খাওয়ার পরই হাই তুলতে শুরু করল রবিন। 'আমি আর বসে থাকতে পারছি না।'

'আজকাল বড় বেশি ঘুমকাতুরে হয়ে পড়েছ তুমি, রবিন,' অভিযোগ করল মুসা।

'কি আর করব, বলো,' হেসে বলল রবিন। 'সারাদিন থাকি খাবারের চিন্তায়। কখন পাব, কখন পাব এই টেনশনেই শরীর হয়ে থাকে ক্লান্ত। খাওয়ার পর আর থাকতে পারি না।'

বিষণ্ণকণ্ঠে জিনা বলল, 'তোমাদের আসতে বলে এবার ভুলই করলাম···'

'সববারই তো শুদ্ধ হয়, এবার নাহয় একটু ভুল হলোই,' পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বলল রবিন, 'তাছাড়া তুমি তো আর জানতে না আন্টির শরীর এতটা খারাপ হয়ে যাবে।'

শুতে গেল ওরা। গোয়েন্দারা তাদের ঘরে, জিনা তার ঘরে। রাফি শুয়ে থাকল জিনার বিছানার কাছে। কান পেতে রইল সন্দেহজনক শব্দ শোনার জন্যে। টোডদেরকে শুতে যেতে শুনল সে। দরজা বন্ধ হতে শুনল। ডারবি গোঙাল একবার, তারপর সব নীরব।

থুঁতনি নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রাফি। তবে একটা কান খাড়াই রইল ঘুমের মধ্যেও। টোড পরিবারকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না সে।

রাতে তাড়াতাড়ি শুয়েছে, পরদিন খুব সকালে বিছানা ছাড়ল ছেলেমেয়েরা। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। সুন্দর দিন। আকাশের রঙ ফ্যাকাসে নীল, মাঝে মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে গোলাপি মেঘ। সাগর শান্ত, আকাশের মতই নীল। মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র ধোপাখানা থেকে ধুয়ে এনে বিছানো হয়েছে বিশাল এক নীল চাদর।

নাস্তার আগে সাগরে গোসল করতে গেল ওরা। বাড়ি ফিরে এল সাড়ে আটটার মধ্যে। আগের দিনের মত যদি ন'টার আগেই ফোন করেন মিস্টার পারকার, তাহলে যাতে ধরতে পারে। আজ আর মিসেস টোডকে ফোন ধরার সুযোগ দিতে চায় না।

মহিলাকে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর, 'আংকেল ফোন করেছেন?'

'না,' মেজাজ দেখিয়ে বলল মিসেস টোড। সে আশা করেছিল, আজও আগেই ফোন ধরে ফেলবে। পারল না বলেই এই রাগ।

'নাস্তা দিতে হবে। ভাল জিনিস। আংকেলকে যাতে বলতে পারি ভাল খাবারই খাওয়ানো হচ্ছে আমাদের।'

ছেলেটাকে বিশ্বাস নেই। খারাপ কিছু দিলে সত্যি বলে দিতে পারে। বানিয়েও বলতে পারে অনেক কিছু। তাই শুকনো রুটি আর মাখন দেয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করতে হলো মিসেস টোডকে।

খানিক পরেই রান্নাঘর থেকে মাংস ভাজার গন্ধ পেল কিশোর।

মাংস, ডিম ভাজা, টমেটোর সালাদ আর রুটির ট্রে ধ্রাম করে টেবিলে নামিয়ে রাখল মিসেস টোড। মুচকি হাসল শুধু কিশোর, কিছু বলল না। যত খুশি মেজাজ দেখাক, খাবার না দিয়ে তো পারল না।

টেরি ঢুকল আরেকটা ট্রে হাতে। তাতে চায়ের সরঞ্জাম।

'বাহ্, এই তো লক্ষ্মী ছেলে,' হেসে বলল কিশোর।

বিড়বিড় করে কি যেন বলল টেরি, বোঝা গেল না। মায়ের মতই আছাড় দিয়ে ট্রে রাখল টেবিলে। ঝনঝন করে উঠল কাপ-পিরিচ। এই শব্দ সহ্য করল না রাফি, 'হাঁউক!' করে ধমক লাগাল।

প্রায় উড়ে পালাল টেরি।

খবর শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে জিনা। খাবারের দিকে নজর নেই। তার প্লেটে মাংস, ডিম বেড়ে দিল কিশোর।

খাওয়ার মাঝপথে বাজল টেলিফোন। হাতের চামচটা প্লেটে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেল জিনা। দ্বিতীয়বার রিঙ হওয়ার আগেই ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। 'আব্বা?…আম্মার খবর কি?'

শুনল ওপাশের কথা।

তিন গোয়েন্দাও খাওয়া থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'তাই নাকি?' জিনা বলল, 'উফ্, বাঁচলাম! আম্মাকে বোলো, তাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে আছি আমি! তুমি তো আবার ভুলে যাবে, বলবে না কিছু! বলবে কিন্তু বলে দিলাম! আব্বা, আমি আসতে চাই, কিছু হবে?'

আবার ওপাশের কথা শুনতে লাগল সে।

শোনার পর আস্তে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

রবিন বলল, 'নিশ্চয় যেতে মানা করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। আবার টেবিলে এসে বসল। 'আম্মার অপারেশন হয়েছে। ব্যথা নেই। ডাক্তাররা বলছে, দিন দশেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে। আব্বা আম্মাকে নিয়েই একবারে আসবে।'

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, 'এতদিনে একটা সুখবর পাওয়া গেল।'

'কিন্তু কুখবর যে ঘাড়েই চেপে আছে এখনও,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'বেঙ পরিবার। দশটা দিন ওদের সহ্য করব কি ভাবে?'

সাত

জিনা ফোন ধরার সময় কাছেই ছিল মিসেস টোড। সব শুনল। মিসেস পারকার আসতে আসতে আরও দিন দশেক লাগবে। এ ক'দিন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে এ-বাড়িতে।

হঠাৎ করেই যেন রাক্ষুসে খিদে পেয়ে বসল জিনাকে। এতক্ষণ কেবল চামচ নাড়াচাড়া করছিল, এখন গপ গপ করে গিলতে শুরু করল।

'আমার যে কি ভাল লাগছে!' আবার হাসি ফুটেছে তার মুখে।

এরপর যে কথাটা বলল জিনা, সেটা আর ভাল লাগল না কিশোরের।

জিনা বলল, 'আম্মা ভাল হয়ে যাচ্ছে, টোডের গোষ্ঠীকে আর ভয় পাই না আমি। তোমরা রকি বীচে ফিরে যাও, খামাকা ছুটিটা নষ্ট কোরো না। আমি আর রাফিই সামলাতে পারব ওদের।'

গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর, 'দেখো, জিনা, এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। একবার কিছু ঠিক করলে তুমি যেমন না করে ছাড়ো না, আমিও ছাড়ি না, ভাল করেই জানা আছে তোমার। আমাকে কিন্তু রাগিয়ে দিচ্ছ।'

'বেশ,' জিনা বলল, 'তাহলে আমি যা ঠিক করেছি তাই করব। বাড়ি না যেতে চাইলে এখানেই থাকো, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি যে প্ল্যান করেছি, সেটা আমার একার। তোমরা এতে থাকছ না।'

'কি প্ল্যান তোমার? বলতে অসুবিধে কি? আমাদের বিশ্বাস করো না?'

'করি। কিন্তু বললে আমাকে করতে দেবে না, ঠেকাতে চাইবে।'

'তাহলে তো আরও বেশি করে শোনা দরকার,' শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর। জিনাকে বিশ্বাস নেই, কারও ওপর রেগে গেলে যা খুশি করে বসতে পারে।

কিন্তু কোনভাবেই জিনার মুখ থেকে তার প্ল্যান সম্পর্কে একটা কথা আদায় করা গেল না।

গোপনে তার ওপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

জিনাও কম চালাক নয়। অস্বাভাবিক কিছুই করল না। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে সৈকতে বেড়াল, সাঁতার কাটল, খেলল। তার মায়ের শরীর ভাল হওয়ার খবর শুনেছে, আজ তার মন ভাল। দ্বীপে যাওয়ার কথা বলল একবার মুসা, এড়িয়ে গেল জিনা। অকে আর চাপাচাপি করা হলো না এ-ব্যাপারে।

দিনটা ভালই কাটতে লাগল। বাড়ি গিয়ে খাবারের জন্যে মিসেস টোডের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হলো না কারও, তাই বেকারি থেকে স্যান্ডউইচ কিনে খেল।

বিকেলে জিনা বলল, 'বাজারে যেতে হবে। আমি কয়েকটা জিনিস কিনব। চায়ের সময় হয়েছে, তোমরা বাড়ি যাও। আমি যাব আর আসব।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। রাফিকে নিয়ে রবিন আর মুসা চলে যাক। তিনজনে মিলে ভালই সামলাতে পারবে মিসেস টোডকে।'

'না, আমি একা যাব। তোমরা যাও।'

শেষ পর্যন্ত সবাইকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলো জিনা। কারণ, কিশোর তাকে একা যেতে দেবে না, ওদিকে মুসা আর রবিনও মিসেস টোডের মুখোমুখি হতে রাজি নয়।

একটা দোকানে ঢুকে টর্চের জন্যে নতুন ব্যাটারি কিনল জিনা। দুই বাক্স দিয়াশলাই, আর এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট কিনল।

'এসব কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কাজে লাগে না এসব?' এড়িয়ে গেল জিনা, 'দরকারী জিনিস।'

জিনার কেনাকাটা এ-পর্যন্তই। বাড়ি ফিরে এল ওরা। অবাক হয়ে দেখল, টেবিলে চা দেয়াই আছে। যদিও আহামরি কিছু নয়—রুটি, জ্যাম আর চা, তবু আছে তো। দেয়ার জন্যে যে মিসেস টোডকে কিছু বলতে হয়নি এতেই খুশি ওরা। যা পেল খেয়ে ফেলল।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামল। ঘর থেকে বেরোনোর উপায় নেই। বসে বসে ক্যারম খেলতে লাগল ওরা। কেরিআন্টির খবর শুনে মন অনেকটা হালকা ওদের।

এক সময় উঠে গিয়ে বেল বাজাল কিশোর।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'বেল বাজালে কেন?'

'মিসেস টোডকে ডাকলাম, খাবার দিতে বলব।'

কিন্তু তার ঘণ্টার জবাব দিতে এল না কেউ।

আবার বাজাল সে। আবার। যতক্ষণ না রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মিসেস টোড। মুখ কালো করে, চোখ পাকিয়ে. কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল সে। 'বেল বাজাচ্ছ কেন? তোমার বেলের জবাব দিতে যাচ্ছে কে?'

'আপনি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'আর কে আছে বাড়িতে? খাবার দিন। ফালতু জিনিস আনলে ভাল হবে না। কাল রাতে কাউকে কামড়াতে পারেনি বলে খুব বিরক্ত হয়ে আছে রাফি।'

'আজ যদি কিছু করতে আসো রান্নাঘরে...আমি...আমি...'

'কি করবেন? পুলিশে খবর দেবেন তো? আমিও সেটাই চাইছি। পুলিশকে বেশ কিছু কথা বলার আছে আমার। ডাকবেন নাকি এখনই?'

চোখের দৃষ্টিতে কিশোরকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা চালাল যেন মিসেস টোড, ব্যর্থ হয়ে ক্ষুব্ধ আক্রোশে হাত মুঠো করে ফেলল। বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে, বোধহয় তাকে অভিশাপ দিতে দিতেই চলে গেল রান্নাঘরে। বাসন-পেয়ালা আছড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল বসার ঘর থেকেও।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

আগের দিনের মত এতটা ভাল খাবার পেল না ওরা, তবে তেমন খারাপও না। ঠাণ্ডা মাংস, পনির আর খানিকটা পুডিং। রাফির জন্যেও খানিকটা রান্না করা মাংস এনে দিল মিসেস টোড।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জিনার দৃষ্টি। কড়া গলায় বলল, 'ওটা লাগবে না, নিয়ে যান। বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন তো? আপনাকে বিশ্বাস নেই...'

'না, থাক,' বাধা দিল কিশোর, 'নিতে হবে না। কাল এই মাংস কেমিস্টের কাছে নিয়ে যাব পরীক্ষা করাতে। দেখি, কি জিনিস মেশানো আছে ওতে। তারপর পুলিশের কাছে যাওয়ার আরও একটা ছুতো পেয়ে যাব।'

একটা কথা বলল না মিসেস টোড। কারও দিকে তাকালও না। নীরবে বাসনটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

'খাইছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মুসা, 'কি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষরে বাবা!'

মেঘ জমেছে জিনার মুখে। রাফিকে কাছে টেনে নিতে নিতে বলল, 'সাংঘাতিক অবস্থা! রাফিকে তো মেরে ফেলবে! কতক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখব!'

এই ঘটনা দিল ওদের সন্ধ্যাটাকে মাটি করে।

খেলা তো নয়ই, আলাপ-আলোচনাও আর তেমন জমল না। হাই তুলল কিশোর। ঘড়ি দেখে বলল, 'রাত দশটা। বসে থেকে লাভ নেই। ঘুমাতে যাই।'

সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করেছে, সাঁতার কেটেছে, হাঁটাহাঁটি করেছে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই, এমন কি কিশোরও।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। মনে হলো, কোন একটা শব্দ শুনেছে। সব চুপচাপ। মুসা আর রবিনের নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। কেন ঘুমটা ভাঙল? টোডদের কেউ শব্দ করেছে? না, তাহলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত রাফি। তাহলে?

বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল জিনার কথা; *প্ল্যান করেছে!* লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল তার ঘরের দিকে।

দরজা খোলা। 'জিনা, জিনা' বলে ডাকল সে। জবাব নেই। উঁকি দিল ঘরে। খালি ঘর। খুব অল্প পাওয়ারের একটা সবুজ আলো জ্বলছে। জিনাও নেই, রাফিও না।

আবার দৌড়ে ঘরে ফিরে এল কিশোর। ডেকে তুলল মুসা আর রবিনকে।

ঘুমজড়িত কণ্ঠে মুসা বলল, 'আবার কি হলো? টোডের মুখে তরকারি ফেলেছ?'

'জলদি ওঠো! জিনা নেই ঘরে!'

'গেল কোথায়?' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল রবিন।

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। তোমরা এসো। আমি ওর ঘরে গিয়ে খুঁজে দেখি।'

সুইচ টিপে উজ্জ্বল আলো জ্বালল কিশোর। বালিশে পিন দিয়ে আটকানো চিঠিটা চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি খুলে আনল সেটা। জিনা লিখেছে ঃ

কিশোর,

রাগ কোরো না। রাফিকে নিয়ে আর ঘরে থাকার সাহস পেলাম না। ওর কিছু হলে যে আমি বাঁচব না তোমরা জানো। মিসেস টোডকে বিশ্বাস নেই। রাফিকে মেরে ফেলবে ও। আমি কয়েক দিনের জন্যে চলে যাচ্ছি, আব্বা-আম্মা না এলে ফিরব না। তোমরা কাল বাড়ি চলে যেয়ো। আমাদের বাড়ি পাহারা দেয়ার দরকার নেই। টোডদেরকে যখন এতই বিশ্বাস আব্বার, ওরাই থাকুক, পাহারা দিক। ধ্বংস করে দিক বাড়িঘর, আমার কিছু না। আবার অনুরোধ করছি, রাগ কোরো না।

—জিনা।

ঘরে ঢুকল মুসা ও রবিন।

নীরবে রবিনের দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে আনমনে বলল কিশোর, 'ইস্, এরকম কিছু যে করবে আগে ভাবলাম না কেন!' নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে শুরু করল সে। পুরোদমে চালু হয়ে গেছে মগজ।

চিঠিটা দ্রুত পড়ে ফেলল রবিন। নিজেকেই জিজ্ঞেস করল যেন, 'কোথায় যেতে পারে?'

বিড়বিড় করছে কিশোর, 'টর্চ…স্পিরিট…দেশলাই…' তুড়ি বাজাল দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে। 'বুঝে গেছি! জলদি এসো আমার সঙ্গে!'

কিছুই জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করল না দু-জনে, করার সময়ও নেই, দরজার কাছে চলে গেছে কিশোর। তার পেছনে ছুটল ওরা।

নিজেদের ঘরে এসে টর্চটা বের করে নিল কিশোর। ছুটল সিঁড়ির দিকে।

বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু মেঘ জমে আছে এখনও। সহসা কাটবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকার রাত।

গেটের দিকে দৌড় দিল কিশোর। তার পাশে ছুটতে ছুটতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গেছে?'

'এখনও বোধহয় যেতে পারেনি। দ্বীপে যাবে ও।'

'তাহলে আর অসুবিধে কি? যাক না। কাল আমরাও গিয়ে হাজির হব।'

'ভয় তো সেটা নয়, ভয় হলো অন্ধকারের। সাগরের অবস্থাও ভাল না, বড় বড় ঢেউ। এই ঢেউয়ে দ্বীপে নৌকা ভেড়াবে কি করে সে? ডুবে মরবে।'

সৈকতে বেরিয়ে এল ওরা। নৌকাটা কোথায় রাখে জিনা, জানা আছে। সেদিকে তাকাতে টর্চের আলো চোখে পড়ল।

কিছু বলতে হলো না মুসাকে। ভেজা বালি মাড়িয়ে ছুটল। দেখতে দেখতে অনেক পেছনে ফেলে এল কিশোর ও রবিনকে।

'জিনা, জিনা, থামো, যেয়ো না!' চিৎকার করে বলল সে।

জোরে এক ধাক্কা মেরে নৌকা পানিতে ঠেলে দিল জিনা। ফিরেও তাকাল না। লাফিয়ে উঠে বসল। আগেই চড়ে বসে আছে রাফি। কিশোরদের আসতে দেখে ভাবল, রাতদুপুরে এ-এক মজার খেলা, খেঁক খেঁক করে চেঁচাতে শুরু করল।

ঝপাৎ করে পানিতে দাঁড় ফেলল জিনা।

একটুও দ্বিধা করল না মুসা। ড্রেসিংগাউন নিয়েই নেমে পড়ল পানিতে। চিৎকার করে বলছে, 'জিনা, শোনো, এই অন্ধকারে গেলে মরবে…'

'না, আমি যাবই। বাড়ি আর যাচ্ছি না,' জোরে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল জিনা।

নৌকার একটা গলুই ধরে ফেলল মুসা। টানতে লাগল। কিশোর আর রবিনও পৌঁছে গেল। ওরাও ধরে ফেলল নৌকাটা।

আর এগোতে পারল না জিনা।

লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল মুসা। জিনার হাত থেকে দাঁড় কেড়ে নিল।

'আমার সর্বনাশ করে দিলে তোমরা!' গুঙিয়ে উঠল জিনা। 'যা-ই করো, আমি আর ও-বাড়িতে ফিরে যাব না…'

'শোনো, জিনা,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'না যাও, নেই। কিন্তু তোমার প্ল্যানের কথাটা আমাদের বলতে কি অসুবিধে ছিল? আমরা কি বাধা দিতাম? তুমি যদি বাড়ি ছাড়তে চাও, আমরাও ছাড়ব। দ্বীপেই চলে যাব। এভাবে তোমার একা একা যাওয়ার চেয়ে, চলো, সবাই মিলেই যাই।'

এক মুহূর্ত ভাবল জিনা। 'বেশ, চলো।'

'এখন না। এই অন্ধকারে গিয়ে মরার কোন মানে হয় না। কাল যাব আমরা। দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে, তৈরি হয়ে, যাতে আরামে থাকতে পারি। খালি হাতে গিয়ে শুধু শুধু কষ্ট করব কেন?'

আট

টেনে নৌকাটাকে আবার বালিতে তুলল ওরা।

জিনা বলল, 'কিছু জিনিস আছে। নিয়ে নেব, নাকি নৌকায়ই থাকবে?'

টর্চের আলো ফেলল কিশোর। 'বাহ্, অনেক খাবার নিয়েছ তো। রুটি, মাখন, মাংস···টোডদের চোখ এড়িয়ে বের করলে কি করে?'

'রান্নাঘরে কেউ নেই। টোডও না। বোধহয় সে-ও আজ ওপরতলায় শুতে গেছে।'

'থাক এগুলো এখানেই। আরও আনতে হবে। অনেক। অন্তত দশদিনের খাবার।'

'কোথায় পাবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'কিনে নেবে?'

'আর কোন উপায় না থাকলে তাই করতে হবে।'

জিনা বলল, 'আরেক কাজ করতে পারি কিন্তু। আম্মার ঘরে একটা বিশাল আলমারি দেখেছ না? ওটাতে কি আছে জানো? খাবার। সব টিনের খাবার। পর পর দু-বছর শীতকালে সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছিল গোবেল বীচে। এমন তুষারপাত শুরু হয়েছিল, লোকে ঘর থেকে বেরোতে পারেনি অনেকদিন। খাবারের এত অভাব হয়ে গিয়েছিল, না খেয়ে থেকেছে অনেকে। তারপর থেকেই সাবধান হয়ে গেছে আম্মা। আলমারিটাতে প্রচুর খাবার জমিয়ে রাখে, যাতে আর বিপদে না পড়তে হয়।'

'ভেরি গুড,' খুশি হয়ে বলল কিশোর, 'তাহলে তো কোন কথাই নেই। যা যা নেব লিখে রাখব আমরা। কেরিআন্টি এলে বাজার থেকে কিনে এনে আবার ভরে রাখব ওসব জিনিস।'

'তালা দেয়া দেখেছি,' মুসা বলল। 'চাবি পাবে কোথায়?'

'আমি জানি আম্মা কোথায় রাখে,' জবাব দিল জিনা।

বাড়ি ফিরল ওরা। পা টিপে টিপে চলে এল জিনার মায়ের ঘরে। শব্দ করলে টোডরা উঠে যেতে পারে, তাই রাফিকেও চুপ থাকতে বলে দিল জিনা।

চাবি দিয়ে তালা খুলে আলমারি খুলল সে।

মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। পরক্ষণেই চুপ হয়ে গেল, টোডদের কানে শিসের শব্দ চলে যাওয়ার ভয়ে। জেগে উঠলে আবার কোন্ গণ্ডগোল বাধাবে ওরা, কে জানে।

গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে খাবার। সব টিনে ভর্তি। স্যুপ, মাংস, ফল, দুধ, মাছ, মাখন, বিস্কুট, সব্জি, কিছুরই অভাব নেই।

বড় দেখে দুটো কাপড়ের থলে বের করে আনল জিনা। তাতে খাবার ভরতে শুরু করল সবাই মিলে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল খাবারের, সেটা মিটে যাওয়াতে খুশি হলো কিশোর।

বৃষ্টি হলে গোবেল দ্বীপে খাবারের পানির সাধারণত অভাব হয় না। তবু প্ল্যাস্টিকের কয়েকটা বোতল ভরে বিশুদ্ধ খাবার পানি নিয়ে নেয়া হলো, বাড়তি সাবধানতা।

ভাঁড়ার থেকে নিয়ে আসা হলো ভেড়ার মাংসের দুটো আস্ত রান। পরিষ্কার কাপড়ে পেঁচিয়ে নেয়া হলো ওগুলো।

এছাড়া প্রয়োজনীয় আরও অনেক টুকিটাকি জিনিস নিল ওরা; যেমন, মোম, দড়ি, বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্যে সোফার কুশন, বিছানো আর গায়ে দেয়ার জন্যে কম্বল। জিনা মাত্র দুটো দেশলাই কিনেছে, তাতে হবে না, তাই আরও কিছু দেশলাইও নিয়ে নিল কিশোর।

মুসা বলল, 'সবই তো হলো। আসল জিনিসই বাকি।'

'কী?' জানতে চাইল রবিন।

'রুটি।'

'ও নিয়ে ভাবনা নেই,' কিশোর বলল। 'সকালে বেকারি থেকে নিয়ে নিলেই হবে।'

'কিন্তু এত সকালে দোকান খুলবে?'

'না খুললে ঘর থেকে ডেকে বের করে এনে খোলাব,' জিনা বলল, 'অসুবিধে হবে না।'

'বেঙের গোষ্ঠী যখন দেখবে আমরা নেই,' হেসে বলল মুসা, 'আকাশ থেকে পড়বে। তাজ্জব হয়ে ভাববে, কোথায় উধাও হলাম আমরা। ভয়ও পাবে নিশ্চয়।'

'উঁহু, ভয় পাওয়ানো চলবে না,' কিশোর বলল। 'ওরা পারকার আংকেলকে বলে দেবে তাহলে। হয়তো ছুটে আসবেন তিনি। আমাদের বাড়ি ফিরতে বাধ্য করবেন।'

'করলে কি? আমরা না গেলেই হলো।'

'তাঁর মুখের ওপর না বলতে পারবে না। থাক, এসব নিয়ে ভাবার অনেক সময় আছে। জরুরী কাজটা আগে সারি। অন্ধকার থাকতে থাকতেই মালপত্রগুলো নিয়ে নৌকায় তুলতে হবে।'

মালের বোঝার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'এত জিনিস নেব কি করে? নিতে নিতেই ভোর হয়ে যাবে তো। ক'বার যেতে-আসতে হবে ভেবে দেখেছ?'

একমুহূর্ত চিন্তা করে জিনা বলল, 'ছাউনিতে দুটো ঠেলাগাড়ি আছে

আমাদের। একটাতে করেই সব নেয়া যাবে। গাড়িটা আবার জায়গামত রেখে দিয়ে গেলেই হবে।'

গাড়ি বের করা হলো। চাকার অতি মৃদু শব্দও ঠিকই কানে গেল ডারবির, কিন্তু একবার চাপা গলায় গোঁওও করে উঠল শুধু। রাফির ভয়ে জোরে চিৎকার করার সাহস পাচ্ছে না। তার গোঙানিটা মিসেস টোডের কানে গেল না। গভীর ঘুমে অচেতন। নাক ডাকছে জোরে জোরে। জানতেই পারল না, নিচে কি চলছে।

নৌকায় মাল বোঝাই করা হলো। গাড়িটা রেখে দেয়া হলো আবার ছাউনিতে। রাত এখনও বাকি। এত জিনিস এভাবে নৌকায় ফেলে সবার চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে মুসাকে পাহারায় থাকতে বলল কিশোর।

মুসারও আপত্তি নেই। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল নৌকার পাটাতনে।

'সব নেয়া হয়েছে তো?' প্রয়োজনীয় কিছু নেয়া বাকি আছে কিনা দেখছে কিশোর। 'নাহ্, হয়েছে···ওহ্হো, আসল জিনিসটাই তো ভুলে গেছি, টিন ওপেনার। টিনের মুখ কাটব কি দিয়ে?'

'রাফির জন্যে একব্যাগ ডগ-বিস্কুটও নিতে হবে,' জিনা বলল।

'তা নেয়া যাবে। মুসা, চলি। আরামসে ঘুমাও। ভোরেই চলে আসব আমরা।'

বাড়ি রওনা হয়ে গেল কিশোররা, সঙ্গে গেল রাফি।

সাগরের পাড়ে বেশ ঠাণ্ডা, শীত লাগে। কম্বল মুড়ি দিয়ে আকাশের তারা গুণতে লাগল মুসা। কখন জড়িয়ে এল চোখ, বলতে পারবে না।

হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, 'সকাল আটটায় একটা ট্রেন আছে। রেলওয়ের একটা টাইম-টেবল নিয়ে ডাইনিং টেবিলে খুলে ফেলে রাখব। টোডদের দেখিয়ে দেখিয়ে চলে যাব স্টেশনের দিকে। তারপর ঘুরে আরেক দিক দিয়ে গিয়ে উঠব নৌকায়।'

'ওরা ভাববে আমরা রকি বীচে ফিরে গেছি,' হেসে বলল রবিন। 'কল্পনাই করবে না, খাবার-দাবার নিয়ে দ্বীপে চলে গেছি পিকনিক করার জন্যে।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' জিনা বলল, 'এতে খানিকটা দুশ্চিন্তায়ও থাকবে ওরা। পুলিশকে ভয় পায়, ওদের সাহায্য নিতে পারবে না। আব্বাকেও কিছু বোঝাতে পারবে না। বোঝাতে গেলেই তো নিজেদের শয়তানির কথা ফাঁস করতে হবে। কিন্তু দশদিনের আগেই যদি আব্বা-আম্মা চলে আসে, জানব কি করে?'

'তা-ও তো কথা,' কিশোর বলল। 'এখানে এমন কেউ আছে, যাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলে যেতে পারো?'

একমুহূর্ত ভাবল জিনা। 'আছে। ফগ। ওই যে, সেই জেলের ছেলেটা, যার কাছে রাফিকে লুকিয়ে রেখেছিলাম···'

'হ্যাঁ, মনে আছে। তাহলে তাকে বলে যেতে হবে।'

বাড়ি ফিরে মায়ের লেখার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা টাইম-টেবল বের করে আনল জিনা।

কোন ট্রেনটায় যাচ্ছে ওরা, মোটা করে তার নিচে দাগ দিয়ে রাখল কিশোর। বইটা খোলা রেখেই উপুড় করে ফেলে রাখল টেবিলে।

এরপর একটা টিন ওপেনার বের করে পকেটে ভরল কিশোর।

শেষ হয়ে আসছে রাত। ঘুমানোর আর সময় নেই। বসার ঘরেই বসে রইল ওরা।

ফর্সা হয়ে এল পুবের আকাশ। সোনালি রোদ এসে পড়ল বাগানে।

'এত সকালে কি বেকারি খুলবে, জিনা?' জানতে চাইল কিশোর।

'ছ'টা তো বাজে। চলো, গিয়ে দেখি।'

দোকান খোলেনি রুটিওয়ালা। সামনের রাস্তায় পায়চারি করছে। ছেলেমেয়েদের চেনে। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'এত সকালে এদিকে? কি ব্যাপার?'

'রুটি লাগবে,' জিনা বলল।

'ক'টা?'

'ছ'টা। বড় দেখে।'

'এত রুটি! কি করবে?'

'খাব,' হেসে জবাব দিল জিনা।

অবাক হলেও আর কিছু বলল না রুটিওয়ালা। দিয়ে দিল।

দোকান খুলে সবে ঝাড়পোঁছ করছে এক মুদী। তার কাছ থেকে একব্যাগ কুকুরের বিস্কুট কিনল জিনা।

জিনিসগুলো নৌকায় রাখতে চলল ওরা।

কম্বল মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ি-বুকড়ি হয়ে তখনও ঘুমাচ্ছে মুসা।

ডাক দিল রবিন, 'এই মুসা, ওঠো। আরামেই আছো দেখি...'

'আরাম আর কই,' হাই তুলতে তুলতে জবাব দিল মুসা, 'উফ্, শীতে মরে গেছি।'

কিশোর বলল, 'এত মালপত্রসহ নৌকাটা এখানে থাকলে লোকের চোখে পড়ে যাবে। জিনা, কি করা যায়? এটাকে লুকাতে হবে।'

হাত তুলে একদিক দেখিয়ে জিনা বলল, 'ওদিকে একটা সরু খালমত আছে, একটা গুহার ভেতরে ঢুকেছে। গুহাটাতে লুকানো যেতে পারে। মুসা, বেয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'আশা তো করি।'

'তাহলে যাও,' কিশোর বলল।

'খিদে পেয়েছে। কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'খিদে পেলে খাবে। খাবারের কি অভাব আছে নাকি? আগে নৌকাটা এখান থেকে সরাও, তারপর খেয়ো।'

'তোমরা খাবে না?'

'পরে এসে। আগে কাজ সেরে নিই।'

সবাই মিলে ঠেলে নৌকাটা পানিতে নামাল। দাঁড় তুলে নিল মুসা।

বাড়ি ফিরে এল কিশোররা। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। টোডরা কেউ ঢুকতে দেখল না ওদের।

ওপরতলায় উঠে জোরে জোরে কথা বলতে লাগল, নানা রকম শব্দ শুরু করল, যেন এইমাত্র উঠল ঘুম থেকে। হুড়ুম-ধাড়ুম করে নামল নিচতলায়। বাগানে বেরিয়ে গেটের দিকে এগোল।

রান্নাঘরের জানালার দিকে তাকাল রবিন। নিচু স্বরে বলল, 'বেঙাচিটা চেয়ে আছে।'

'থাকুক,' কিশোর বলল। 'দেখুক, আমরা কোনদিকে যাচ্ছি।'

গেট খুলে বেরিয়ে এল ওরা।

নয়

শান্ত সাগর। এই আবহাওয়ায় রাত থাকতেই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে জেলেরা। সুতরাং পরিচিত কোন জেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। হলোও না। গোবেল দ্বীপের যে প্রাকৃতিক বন্দরটা আছে, প্রণালী দিয়ে ঢুকতে হয়, নিরাপদেই তাতে নৌকা নিয়ে এল ওরা।

টেনে নৌকাটাকে তুলে আনল সৈকতের অনেক ওপরে। ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে। এখানকার সাগরে যখন-তখন ঝড় ওঠে, কোন ঠিকঠিকানা নেই। আর সে ঝড়ও যে-সে ঝড় নয়, ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে যায় সাগরের।

দাঁড় টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মুসা ও জিনা। মসৃণ সাদা বালিতে হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়েই পড়ল।

'শুয়ে পড়লে যে,' রবিন বলল।

'কি করব?' পাথরের টিলায় বসা একটা সীগালের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'খাওয়া লাগবে না? তোমার তো পেট ভরা, কিন্তু আমরা এখনও নাস্তাই করিনি।'

'আমিও খাইনি। ভাবলাম, একবারেই খাব।'

টিন ওপেনার বের করে খাবারের টিন কাটতে বসল কিশোর।

ঘেউ ঘেউ করে একটা খরগোশকে তাড়া করে গেল রাফি। ধমক দিয়ে তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনল জিনা।

'আহ্,' হাত-পা টানটান করতে করতে বলল কিশোর, 'মনে হচ্ছে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম।'

'আমারও সে-রকমই লাগছে,' রবিন বলল। 'আসলে, খারাপ মানুষের সঙ্গে বাস করা যায় না।'

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।'

'কেন, তাড়াতাড়ি কেন?' ভুরু নাচাল মুসা, 'কি কাজ আছে আমাদের? সময় তো অফুরন্ত।'

'অনেক কাজ। প্রথমেই রাতে থাকার একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তো আর বাইরে থাকা যাবে না। সেখানে সরিয়ে রাখতে হবে মালপত্রগুলো। তারপর আমরা ঝাড়া হাত-পা। চুটিয়ে আনন্দ করব তখন।'

রুটি, মাখন, ঠাণ্ডা মাংস, টমেটো আর কেক দিয়ে নাস্তা সারল ওরা। তারপর রওনা হলো দুর্গে।

প্রথমবার এসে যেখানে রাত কাটিয়েছিল, সে জায়গাটা এবার আর পছন্দ করতে পারল না কিশোর। দেয়াল আরও অনেকখানি ধসে পড়েছে, ছাত প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে থাকা যাবে না।

জিনা প্রস্তাব দিল, 'পাতালঘরে থাকলে কেমন হয়?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল মুসা, 'ওই অন্ধকারে! আমি বাপু এর মধ্যে নেই। ভূতের আড্ডায় কে যায়...'

মুসার কথা কানে তুলল না কিশোর, 'আর কোন জায়গা না পেলে থাকতেই হবে ওখানে। তবে খুব গরম লাগবে।'

কথা বলতে বলতে দুর্গটার একধারে পাথরের চত্বরে এসে দাঁড়াল ওরা। এখান থেকে সাগর দেখা যায়।

হাত তুলে জিনা দেখাল, 'ওই দেখো, আমাদের জাহাজটা।'

দেখল তিন গোয়েন্দা। ঝড়ে ভেসে উঠেছিল যেটা। একটা নকশা পেয়েছিল ওরা, খুঁজে বের করেছিল সোনার বার।

পাথরের খাঁজে আটকে রয়েছে জাহাজটা, বড় বড় ঢেউও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

'এক কাজ করলে কেমন হয়!' ওটার দিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করে উঠল কিশোরের। 'ওটাতেই গিয়ে থাকি না কেন? চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা হবে...'

'খাইছে, বলে কি!' আঁতকে উঠল মুসা। 'পোড়ো জাহাজে বাসা! ও-তো মেছো ভূতের আড্ডা! জলদস্যুরা মরে গিয়ে সব ভূত হয়ে ওতে বাসা বেঁধেছে।'

'দেখো মুসা, তোমার এই ভূতের কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। আর ভাল্লাগে না। দয়া করে ভূতটুতগুলোকে মাথা থেকে একটু বের করো।...এই, চলো সবাই। দেখে আসি জাহাজটা।'

কিছুদূর এগিয়েই থমকে দাঁড়াল জিনা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওই যে কুয়াটা!'

সেদিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। জানে ওরা, এই কুয়া নেমে গেছে অনেক নিচে, সাগর সমতলেরও নিচে, মিষ্টি পানি আছে ওটাতে। লোহার আঙটা বেয়ে নিচে নামা যায়। বেশ কিছুটা নামার পর একটা ফোকর আছে, ওটা দিয়ে ঢোকা যায় পাতালঘরে।

'চমকালে কি দেখে?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'দেখছ না, কুয়ার মুখের কাঠের ঢাকনাটা সরানো?'

'তাতে কি?'

'কে সরাল? আমি তো সরাইনি। নিশ্চয় কারও পানি খাওয়ার দরকার হয়েছিল!'

'কত লোক আছে এ কাজ করার,' ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দিল না মুসা। 'আমরা সোনার বারগুলো খুঁজে পাওয়ার পর তো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল দ্বীপটা। নিশ্চয় লোকে দেখতে এসেছে। তাদেরই কেউ করেছে একাজ।'

'সেটা তো অনেক আগের কথা,' রবিন বলল। 'জিনা, তারপর কি আর দ্বীপে এসেছ তুমি?'

'কতবার! সে জন্যেই তো বলছি···আরে, এই ঢাকনাটাও তো সরানো!'

'কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিশোর। জিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে সে-ও দেখে ফেলল। দুর্গের নিচে পাতালঘরে নামার একটা সিঁড়ি আছে, কুয়ার মুখের মতই সিঁড়ির গর্তের মুখটাও ঢাকা থাকে ঢাকনা দিয়ে। সেটা সরানো। অর্ধেক বেরিয়ে আছে গর্তের মুখ।

'আমার দ্বীপে আমার অনুমতি ছাড়া নামে কার এতবড় সাহস! জিনিস উলট-পালট করে! ধরতে পারলে···'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'আচ্ছা, সেদিন যে ধোঁয়া দেখলাম, এসব তার জবাব নয় তো?'

কৃত্রিম হতাশায় মাথা নাড়ল মুসা, 'এই তো, শুরু করল গ্রীক ভাষা!'

'খালি কথা ভুলে যাও, সে-জন্যেই তো এত কঠিন লাগে। সেদিন যাকে আমরা স্টীমারের ধোঁয়া ভেবেছি সেটা হয়তো ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়া। দ্বীপে নেমে আগুন জ্বেলেছিল কেউ।'

কিশোরের সন্দেহই যে ঠিক, তার আরও প্রমাণ মিলল। একজায়গায় পাওয়া গেল আগুন জ্বালানোর চিহ্ন। রান্না করে খেয়েছে কেউ। একটা সিগারেটের গোড়াও পড়ে আছে। দিন কয়েকের মধ্যে যে কেউ দ্বীপে উঠেছিল, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও।

তবে ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না তিন গোয়েন্দা। নির্জন দ্বীপ, যে কেউ উঠতে পারে এখানে, পিকনিক করার জন্যেও আসতে পারে। জিনা তো আর পাহারা দিয়ে রাখে না।

কিন্তু জিনা এত সহজে মেনে নিতে পারল না, ফুঁসতে লাগল, তাকে না

বলে তার দ্বীপে লোকটা উঠেছিল বলে।

ভাটার সময় এখন। পানি নেমে যাওয়ায় মাথা উঁচু করে রয়েছে অসংখ্য পাথর। একটা থেকে আরেকটায় লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজটার কাছে পৌঁছানো যাবে।

তবে কাজটা মোটেও সহজ নয়। ক্রমাগত ভিজে ভিজে, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে পাথরগুলো। পা পিছালানোর সম্ভাবনা প্রচুর।

খুব সাবধানে এগোল ওরা। নিরাপদেই এসে পৌঁছল জাহাজের পাশে। দূর থেকে যতটা মনে হয়, কাছে এলে তার চেয়ে অনেক বেশি বড় লাগে ওটা। আগের বার যেমন দেখেছিল, প্রায় তেমনি আছে, খুব একটা বদলায়নি। নিচের দিকটা পানিতে তলিয়ে আছে। শ্যাওলায় ঢাকা। কাঠ আঁকড়ে রয়েছে নানা রকম শামুক-গুগলি। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে জাহাজের গা থেকে।

সঙ্গে করে দড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। বার তিনেক চেষ্টা করে জাহাজের ভাঙা মাস্তুলের গোড়ায় দড়ির ফাঁস আটকে ফেলল মুসা। দড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

একে একে উঠে এল অন্য তিনজন। রাফিকে কিনারে রেখে আসা হয়েছে। চুপচাপ থাকতে নির্দেশ দিয়েছে তাকে জিনা। এদিকেই তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে সে, আসতে পারেনি বলে মন খারাপ।

আগের চেয়ে করুণ অবস্থা জাহাজটার। ফোকরের সংখ্যা বেড়েছে। গন্ধও যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি। হাত নেড়ে রবিন বলল, 'অসম্ভব! এখানে বাস করা যাবে না! নিচেই নামব না আমি।'

জলজ প্রাণী, শ্যাওলা আর কাঠ পচে হয়েছে এই ভয়াবহ গন্ধ। নিঃশ্বাস নিতেই যেন কষ্ট হয়।

কিশোর বলল, 'এসেছি যখন না দেখে যাব না। তোমার সহ্য না হলে এখানেই থাকো। আমরা নেমে দেখে আসি।'

এখানে যে থাকা যাবে না, বোঝা হয়ে গেছে। তবু পুরানো স্মৃতির আকর্ষণই যেন নিচে টেনে নামাল কিশোরকে। ক্যাপ্টেনের ঘরটা সবচেয়ে বড়। তবে তাতে ঘুমানো তো দূরের কথা, জিনিসপত্র রাখারও প্রশ্ন ওঠে না। পুরো জায়গাটাই দুর্গন্ধে ভরা, ভেজা ভেজা। কাঠ এত পিচ্ছিল হয়ে আছে কোথাও কোথাও, পা রাখাই মুশকিল।

'চলো, যাইগে,' মুসা বলল। 'ইকটুও ভাল লাগছে না।'

মই বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা, এই সময় কানে এল রবিনের চিৎকার, 'কিশোর, দেখে যাও, দেখে যাও!'

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরেকটু হলেই পিছলে পড়ে হাঁটু ভাঙত মুসা। ডেকে উঠে এল সবার আগে। 'কি হয়েছে? কি দেখেছ?'

চোখ চকচক করছে রবিনের। হাত তুলে দেখাল। 'আগের বার যখন এসেছিলাম, ওটা ছিল না!'

ডেকের একধারে একটা লকার, হাঁ হয়ে খুলে আছে। তার মধ্যে একটা কালো ট্রাংক।

'তাই তো?' রবিনের মতই অবাক হয়েছে কিশোর। 'আগের বার তো এটা ছিল না! একেবারে নতুন জিনিস! কে রেখে গেল? কি আছে এর মধ্যে?'

ডেকও পিচ্ছিল। সাবধানে লকারটার দিকে এগোল ওরা। দরজাটা বন্ধই থাকার কথা, কিন্তু বাতাসেই হোক, কিংবা ঢেউয়ের দোলায়ই হোক, খুলে গেছে।

ট্রাংকটা ছোট। বের করে আনল কিশোর।

'ওখানে এই জিনিস রাখতে গেল কে?' মুসার প্রশ্ন। 'চোর-ডাকাত নয় তো? স্মাগলার?'

'হতে পারে,' ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'চোরাই মাল লুকানোর দারুণ জায়গা এই জাহাজ। কেউ আসে না এখানে। হঠাৎ করে দেখে ফেলারও ভয় নেই।'

'যদিও আমরা দেখে ফেললাম,' জিনা বলল।

'আমাদের মত তো আর ছোঁক ছোঁক করে না কেউ,' মুসা বলল।

'কি আছে ভেতরে?' ঝুঁকে ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'এই কিশোর, কোকেন-টোকেন নয় তো? স্মাগল করে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে!'

দুটো নতুন তালা লাগানো রয়েছে। চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।

'ভেঙে ফেললেই হয়,' জিনা বলল।

'না। এটার কথা যে আর গোপন নেই, তালা ভাঙা দেখলেই বুঝে যাবে। চোরই হোক, আর চোরাচালানিই হোক, তাকে বুঝতে দেব না যে আমরা দেখে ফেলেছি।'

'ধরার ইচ্ছে?'

'নয় কেন?' নিজেকেই যেন বোঝাচ্ছে কিশোর, 'আমরা যে দ্বীপে উঠেছি, কেউ জানে না। লুকিয়ে থেকে চোখ রাখব। কোনও বোট আসে কিনা দেখব।'

'মন্দ হয় না,' মুসা বলল। 'একটা কাজ পেয়ে গেলাম। একঘেয়ে লাগবে না আর এখানে…'

'এমনিতেও লাগত না,' বাধা দিয়ে বলল জিনা।

'এখন আরও বেশি লাগবে না।'

সাগরের দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল কিশোর, 'জোয়ার আসছে! জলদি নেমে যাওয়া দরকার।'

ট্রাংকটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল সে।

'সমস্যা কিন্তু একটা হবে,' রবিন বলল। 'দড়িটা রেখে যেতে হবে আমাদের। লোকটা এসে এই দড়ি দেখলেই তো বুঝে যাবে, কেউ উঠেছিল।'

'ভাল কথা মনে করেছ!' ঘুরে তার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি করা যায়?'

সমাধান করে দিল মুসা, 'তোমরা নেমে যাও। দড়িটা খুলে নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ব আমি।'

'না না, পা ভাঙবে।'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি মুসা আমান। টারজানের চেয়ে কম যাই কিসে? নামো তোমরা।'

'আর কিসে কম যাও বলতে পারব না, তবে খাওয়ার ব্যাপারে যে যাও না, গলাবাজি করে বলতে পারব,' হেসে বলল রবিন।

অন্যেরাও হাসল।

টারজানের চেয়ে কম যে যায় না, প্রমাণ করে ছেড়ে দিল মুসা। সবাই নেমে যেতেই মাস্তুলের গোড়া থেকে দড়িটা খুলে নিল। সেটা কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জাহাজের কিনার ধরে ঝুলে পড়ল। নিচে ওখানটায় পাথর আছে কিনা দেখে নিয়েছে আগেই। আলগোছে ছেড়ে দিল হাতটা। ঝপ করে পড়ল পানিতে। পানি ওখানে নেহায়েত কম নয়, পাথরও নেই, কিছুই হলো না ওর।

এবারও নিরাপদেই কিনারে ফিরে এল সবাই। পিছলে পড়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটাল না।

এতক্ষণ একা বসে থেকে অস্থির হয়ে পড়েছিল বেচারা রাফি। আনন্দে হাত চেটে দিতে লাগল সবার।

কিশোর বলল, 'জাহাজে তো জায়গা হলো না, রাতে থাকি কোথায় বলো তো? জিনা, তোমার কোন জায়গা জানা আছে? গুহাটুহা হলে ভাল হত...'

'আছে!' তুড়ি বাজাল জিনা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চেহারা। 'এসো আমার সঙ্গে।'

একটা পাহাড়ের কাছে ওদেরকে নিয়ে এল জিনা। ঢালে ঝোপঝাড় যেমন ঘন, পাথরেরও ছড়াছড়ি। হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে।'

কিছুই দেখতে পেল না তিন গোয়েন্দা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কই?'

'ওই তো। চলো, আরও কাছে, তাহলেই দেখবে।'

ঝোপঝাড় আর লতায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে গুহামুখটা। এখানে আছে ওটা জানা না থাকলে চোখেই পড়ে না।

আগে আগে ঢুকল জিনা। পেছনে অন্যেরা।

'খাইছে!' ঢুকেই বলে উঠল মুসা, 'দারুণ তো!'

গুহার ভেতরটা আসলেও সুন্দর। সাদা পাউডারের মত মিহি, শুকনো বালিতে ঢাকা মেঝে। সমুদ্র সমতল থেকে অনেক ওপরে, সাংঘাতিক

জলোচ্ছ্বাসের সময়ও এখানে পানি ঢোকে কিনা সন্দেহ। একধারের দেয়ালে একটা তাকমত রয়েছে।

'বাহ্,' খুশি হয়ে বলল রবিন, 'এক্কেবারে যেন আমাদের জন্যে বানিয়ে রাখা হয়েছে। জিনিসপত্র রাখতে পারব ওটাতে। কিশোর, ওই দেখো, স্কাইলাইটও আছে।'

গুহাটা অনেক বড়। ছাতের একধারে একটা ফোকর। আলো আসছে সে পথে। ফোকর দিয়ে বৃষ্টির পানি গুহায় ঢোকে, তবে সরাসরি মেঝেতে না পরে দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে চলে যায় একটা গর্তের দিকে। দীর্ঘদিন পানি পড়ে পড়েই বোধহয় তৈরি হয়েছে গর্তটা। নিশ্চয় নালাও আছে পাহাড়ের ভেতরে।

কিশোর বলল, 'নৌকা থেকে আমাদের জিনিসগুলো এনে দড়িতে বেঁধে ওখান দিয়ে নামিয়ে দেয়াটা সহজ হবে, বার বার পাহাড়ের খাড়া দেয়াল বাইতে হবে না আর।' যে দিক দিয়ে ঢুকেছে সে পথটা দেখিয়ে বলল, 'সৈকত থেকে এ পথ দিয়ে আসা কঠিন।'

গুহা থেকে বেরিয়ে প্রায় খাড়া দেয়াল বেয়ে পাহাড়ে চড়তে শুরু করল ওরা। প্রথম কাজ, বাইরে থেকে স্কাইলাইটের ফোকরটা খুঁজে বের করা।

ঢাল বেয়ে উঠতে সবচেয়ে অসুবিধে হলো রাফির। মানুষের মত হাত নেই তার, ঝোপ কিংবা লতা ধরে যে পতন ঠেকাবে, সে উপায়ও নেই। হড়হড় করে পিছলে পড়ে যেতে চায়। হাস্যকর ভঙ্গিতে শরীরটাকে বাঁকিয়ে নখ দিয়ে মাটি খামচে ধরে উঠতে লাগল সে।

ওপরে উঠে এল ওরা। ফোকরটা কোনখানে, মোটামুটি আন্দাজ থাকায় খুঁজে বের করা কঠিন হলো না। জানা না থাকলে গুহামুখের মতই এটাও সহজে দেখতে পেত না। এক ধরনের কাঁটাঝোপে ঢেকে রেখেছে।

কাঁটাডাল সরিয়ে নিচে উঁকি দিল কিশোর। ফোকরটা একটা সুড়ঙ্গমুখ। মাত্র কয়েক ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ, ওপর থেকে মোটা একটা পাইপের মত নেমে গেছে ঢালু হয়ে। গুহার ছাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখেটেখে মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, বেশি নিচে না। কিন্তু বিপজ্জনক। না দেখে এই গর্তে পা দিলে নিচে পড়ে হাত-পা ভাঙতে পারে।'

সবাই মিলে গর্তের মুখের কাছের ঝোপ আর লতা পরিষ্কার করে ফেলল। কাঁটার আঁচড় লাগল হাতে।

নিচের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'দড়ি ছাড়াও কিন্তু লাফিয়ে নামা যায়।'

'দরকারটা কি ঝুঁকি নেয়ার,' কিশোর বলল। 'চলো, মালগুলো নিয়ে আসি।'

সৈকতে চলে এল ওরা। যে যতটা পারল, জিনিসপত্র হাতে তুলে নিল। নিয়ে এল ফোকরের কাছে। সেগুলো রেখে আরও মাল আনতে ফিরে গেল। এভাবে কয়েকবারে সমস্ত মাল এনে জমা করল একজায়গায়। এইবার নিচে নামানোর পালা।

লম্বা একটা দড়িতে এক ফুট পর পর গিঁট দিল কিশোর। দড়ির একমাথা

বাঁধল একটা বড় ঝোপের গোড়ায়। গাছটার শেকড় অনেক গভীরে, ভার রাখতে পারবে। দড়ি বেয়ে নেমে যেতে বলল জিনা আর রবিনকে। ওপর থেকে সে আর মুসা দড়িতে মাল বেঁধে নামিয়ে দেবে, নিচে থেকে ওরা দু-জনে খুলে নেবে। তারপর আবার মাল পাঠানো হবে।

নেমে গেল রবিন ও জিনা। দড়িতে গিঁট থাকায় সুবিধে হলো, হাত পিছলে গেল না।

মাল নামানোটা আরও সহজ কাজ।

সমস্যা হলো রাফিকে নিয়ে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ওকে নামাব কি ভাবে?'

'বেঁধে নামাতে হবে, আর তো কোন উপায় দেখি না।'

তবে সমস্যার সমাধান রাফি নিজেই করে দিল। হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা খরগোশ। কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়ে বিরাট লাফ দিয়ে ফোকর পেরিয়ে চলে গেল অন্যপাশে।

তাড়া করল রাফি। উত্তেজিত না হলে, সাবধান থাকলে সে-ও ফোকরটা পেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তাড়াহুড়োয় কোন কিছু খেয়াল না করে লাফ দিয়ে বসল, পড়ল একেবারে ফোকরে। নিমেষে ঢালু সুড়ঙ্গ গলে পিছলে নেমে গেল নিচে। ধপ করে পড়ল মেঝেতে।

ওপর থেকে জিনার তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল মুসা আর কিশোর।

রাফির কিছু হয়েছে কিনা দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি দড়ি বেয়ে নেমে গেল মুসা।

তার পেছনেই নামল কিশোর।

রাফির কিছু হয়নি দেখে হাঁপ ছাড়ল। মিহি নরম বালি বাঁচিয়ে দিয়েছে কুকুরটাকে। হাড়টাড় ভাঙেনি।

প্রচুর পরিশ্রম করেছে। খিদে পেয়েছে সবারই। খাবারের টিন খুলে খেতে বসে গেল ওরা।

পেট কিছুটা শান্ত হয়ে এলে কিশোর বলল, 'কাজ কিন্তু আরও আছে। বিছানার জন্যে লতাপাতা জোগাড় করে আনতে হবে।'

মুসা বলল, 'কি দরকার কষ্ট করার। যা মিহি আর নরম বালি, এর ওপরই কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ব।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সবাই ক্লান্ত। গুহা থেকে এখন আর বেরোতে ইচ্ছে করল না কারও।

মোম জ্বালল রবিন। গুহার দেয়ালে ছায়ার নাচন। কেমন রহস্যময় হয়ে উঠল গুহার পরিবেশ।

আরও কিছুক্ষণ জেগে রইল ওরা। কম্বলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পগুজব করল। ঘুমে কখন জড়িয়ে এল চোখ, বলতে পারবে না।

গলে গলে শেষ হলো মোম, নিভে গেল আলো; কেউ দেখল না সেটা, একমাত্র রাফি ছাড়া···

দশ

পরের দিনটাও যেন ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। হেসেখেলে, সাঁতার কেটে, আর দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিল ওরা। সঙ্গে খাবার নিয়ে বেরিয়েছিল, ফলে আর একবারও গুহায় ঢোকার প্রয়োজন বোধ করেনি। ঢুকল একেবারে সন্ধ্যাবেলায়। মোম জ্বেলে খাওয়া সারল।

দেয়ালে ছায়া নাচছে। সেদিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দিল মুসার। বলল, 'আগুন জ্বালতে পারলে ভাল হত। আলো আরও বেশি পেতাম...'

হেসে ফেলল রবিন, 'ভূতের ভয় পাচ্ছ তো? আগুনে আলো বেশি পাবে বটে, কিন্তু গরম হয়ে যাবে গুহার ভেতর। ধোঁয়ায় যাবে দম আটকে। বেরোনোর তো পথ নেই।'

'আছে,' ওপর দিকে আঙুল তুলল মুসা। 'ফোকরটা চিমনির কাজ করবে।'

'তা করবে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু বাইরে থেকে ধোঁয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্মাগলারদের চোখে পড়ে যেতে পারে। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা এখানে লুকিয়ে আছি। এমন কিছু করা চলবে না, যাতে ওদের চোখে পড়ে যাই।'

আগুন জ্বালানো আর হলো না। আগের দিনের মতই গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। জেগে রইল কেবল রাফি। কান খাড়া।

হঠাৎ গরগর করে উঠল।

ঘুম ভেঙে গেল পাশে শোয়া জিনার। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'রাফি, কি হয়েছে?'

রবিনও জেগে গেছে। মুসা আর কিশোর অনেকটা দূরে, তাই রাফির চাপা গরগর ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

নিচু স্বরে রবিন বলল, 'মনে হয় স্মাগলাররা এসেছে!'

'চলো, দেখি।'

'চলো।'

দড়িটা বাঁধাই আছে, ঝুলে আছে ফোকর থেকে। সেটা বেয়ে প্রথমে উঠে এল রবিন। সাবধানে মাথা বের করল ফোকরের বাইরে। শরীরটা বের করার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নিল কিছু আছে কিনা।

রাফিকে চুপ থাকার নির্দেশ দিয়ে তার পেছনে উঠল জিনা।

সাগরের দিকে তাকাল ওরা। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত। চাঁদ ওঠেনি এখনও। কোন জাহাজ চোখে পড়ল না। এমন কি ভাঙা জাহাজটাও না।

'চাঁদ থাকলে ভাল হত,' রবিন বলল।

'নেই যখন, কি আর করা।'

হঠাৎ রবিনের চোখে পড়ল আলোটা। 'দেখেছ!'

'হ্যাঁ।' উত্তেজিত হয়ে বলল জিনা, 'ভাঙা জাহাজটার কাছ থেকে আসছে! কেউ উঠেছে ওটাতে! হ্যারিকেনের আলো!'

'স্মাগলারই! আরও মাল এনে লুকাচ্ছে।'

'কিংবা ট্রাংকটা নিতে এসেছে।...দেখো, নড়ছে আলোটা। নৌকা নিয়ে এসেছে ওরা। জাহাজের গায়ে বেঁধে রেখে উঠেছে।'

যতটা সম্ভব কান খাড়া করে রেখেছে দু-জনে, শব্দ শোনার আশায়। কিছুই শুনল না। জাহাজটা অনেক দূরে।

কয়েক মিনিট পর নিভে গেল আলো।

দাঁড়ের শব্দ শোনার অপেক্ষায় রইল ওরা। কিন্তু ঢেউয়ের একটানা শব্দের জন্যে আর কিছুই কানে ঢুকল না।

আরও মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে নেমে চলে এল ওরা।

কিশোর আর মুসা ঘুমিয়েই আছে। খবরটা ওরা জানল পরদিন সকালে।

'আমাদের ডাকলে না কেন?' অনুযোগের সুরে বলল মুসা।

'তেমন কিছু তো আর দেখিনি,' জিনা বলল, 'শুধু হ্যারিকেনের আলো। এটা দেখানোর জন্যে আর কি ডাকব। ভাবলাম, ঘুমিয়ে আছ, থাকো।'

'তারমানেই মানুষ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'খেয়ে নাও। দেখতে যাব।'

ভাটার সময় জাহাজটা দেখতে চলল ওরা। আগের বারের মতই পিচ্ছিল পাথর টপকে টপকে এসে দাঁড়াল জাহাজের ধারে। দড়ির সাহায্যে ডেকে উঠল।

লকারের দরজাটা বাতাসে আপনাআপনি খুলে যায় বলে ফাঁকে একটা কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

গোঁজটা খুলে নিল কিশোর। দরজা খুলতে অসুবিধে হলো না।

পিচ্ছিল ডেকের ওপর সাবধানে পা ফেলে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'ট্রাংকটা আছে?'

'আছে। অবাক কাণ্ড! আরও কি সব রেখে গেছে, দেখো! খাবারের টিন, কাপ, প্লেট, মোমবাতি, হ্যারিকেন, কম্বল, আমাদের মতই যেন দ্বীপে বাস করতে এসেছে কেউ!' বার দুই ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'নিশ্চয় কেউ থাকতে এসেছে। চোরাই মাল আসার অপেক্ষায় থাকবে বোধহয়। দিন-রাত নজর রাখতে হবে আমাদের।'

উত্তেজিত হয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল ওরা। লুকিয়ে থেকে বাস করার চমৎকার একটা জায়গা পেয়ে গেছে বলে খুশি। এখানে থাকলে ওরা কারও চোখে পড়বে না, কিন্তু কেউ এলে ওদের চোখে ঠিকই পড়বে।

'নৌকাটা লুকিয়ে ফেলতে হবে!' হঠাৎ বলে উঠল জিনা। 'ও পথে ঢোকার সম্ভাবনাই বেশি। জাহাজটার এদিক দিয়ে ঢোকা ডেঞ্জারাস। বোকা না হলে এদিক দিয়ে দ্বীপে ওঠার কথা ভাববে না কেউ।'

'ভাববে, দক্ষ নাবিক হলে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'সামান্য একটু সরে গেলেই নৌকা ভেড়াতে পারবে।'

'কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার দরকার কি?' মুসা বলল, 'নৌকাটা লুকিয়ে ফেলাই ভাল। চলো, এক্ষুণি।'

'কিন্তু লুকাব কোথায়?' রবিনের প্রশ্ন, 'এতবড় একটা নৌকা?'

'জানি না,' চিন্তায় পড়ে গেছে কিশোর। 'চলো আগে, যাই। এখানে বসে কিছু বোঝা যাবে না।'

দল বেঁধে সৈকতে চলে এল ওরা। সাগর থেকে এসে প্রণালীটা যেখানে খাঁড়িতে ঢুকেছে, তার একধারে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহা আছে। সব সময় পানি থাকে। সেটা দেখিয়ে জিনা বলল, 'এর মধ্যে লুকানো যেতে পারে। ভেতরে অনেক বড় একটা পাথরের চাঙড় আছে। তার ওপাশে রাখলে সহজে চোখে পড়বে না। তবে ঝড় এলে, পানি ফেঁপে উঠলে আছাড় মেরে চুরমার করে দিতে পারে নৌকাটা।'

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল সবাই। কিন্তু আর কোন উপায়ই দেখল না। শেষে ওই গুহাতেই নৌকা ঢোকানো হলো। চাঙড়ের ওপাশে নেয়ার পরও পুরোটা আড়াল হলো না নৌকার। উজ্জ্বল লাল রঙের জন্যে হয়েছে বিপদ। তবে এই সমস্যারও সমাধান হলো। ডুব দিয়ে দিয়ে জলজ আগাছা আর শ্যাওলা তুলে ঢেকে দিল জিনা আর মুসা।

'গুড!' এপাশ থেকে ওপাশ থেকে দেখে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'দেখা যায় না। চলো, চায়ের সময় হয়েছে।' গুহা থেকে বেরিয়ে আসার পর বলল, 'একটা বোকামি কিন্তু করে ফেলেছি। পাহারা দেয়ার জন্যে একজনকে পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকা উচিত ছিল।'

'তাই তো!' একমত হয়ে বলল রবিন, 'বোকামিই হয়ে গেছে। কি আর করা। তবে আমার মনে হয় না দিনে কেউ উঠবে। স্মাগলাররা এলে আসবে রাতের বেলা।'

নিজেদের আস্তানায় ফিরে চলল ওরা।

কিছুদূর এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রাফি। গরগর শুরু করল।

দুর্গের দিকে এগোচ্ছিল ওরা, ওখান দিয়ে ঘুরে এসে ফোকর দিয়ে গুহায় নামার ইচ্ছে ছিল। এই সময় হুঁশিয়ার করল রাফি।

কিশোরের নির্দেশে তাড়াতাড়ি একটা ঝোপে ঢুকে পড়ল ওরা। রাফিকে চুপ থাকতে বলল জিনা।

আস্তে ডাল সরিয়ে ফাঁক করে উঁকি দিল কিশোর। কাঁটার খোঁচা লাগল। কিন্তু উত্তেজনায় খেয়ালই করল না সেটা। চত্বরে মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে তাকাতে না তাকাতেই অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো।

জিনাও দেখতে পেয়েছে। ফিসফিস করে বলল, 'কিশোর, পাতালঘরে চলে গেল না তো?'

'মনে হয়। ঢাকনা ওরাই সরিয়েছে। চোরাই মাল জমা করে রেখেছে

হয়তো নিচে। মানুষ লুকিয়ে থাকতেও অসুবিধে নেই। চোর-ডাকাতের জন্যে স্বর্গ।' ভাবল একমুহূর্ত। 'এখান থেকে ভালমত দেখতে পারব না। চলো, গুহায়। নিচের মুখটা দিয়ে ঢুকব। তারপর একজন উঠে বসে থাকব ফোকরের কাছে। দেখব, ব্যাটারা কি করে।...রাফি, একদম চুপ, একটা শব্দ করবি না!'

ওপর দিয়ে আর গেল না ওরা। নিচে নেমে দ্বীপের কিনার ঘুরে চলে এল গুহামুখের কাছে। ভাল করে তাকাল একবার আশপাশে। কেউ নেই। দেখছে না ওদেরকে। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ঢুকেই রবিনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নজর রাখার জন্যে।

দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল রবিন। ফোকর দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে রইল দুর্গের দিকে। ঝোপের ডাল তার মাথা আড়াল করে রেখেছে, ওদিক থেকে কেউ দেখতে পাবে না।

নিচে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল রাফি। ঘেউ ঘেউ করে দু-বার ডাক দিয়েই বেরিয়ে গেল গুহা থেকে। তাকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারল না জিনা।

গুহামুখের কাছে এসে ডাকল সে, 'রাফি! কোথায় গেলি তুই! এই রাফি?'

সাড়া দিল না কুকুরটা।

একটু পরেই তাকে দেখতে পেল রবিন। এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে আরেক ঝোপে ঢুকল রাফি। যেন শিকারের সন্ধান পেয়েছে চিতাবাঘ, ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে এখন।

কিসের সন্ধান পেয়েছে সেটা জানতেও দেরি হলো না। চত্বরের দিক থেকে ল্যাগব্যাগ করতে করতে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট কুকুর। চোখের পলকে ঝোপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাফি।

এমন চিৎকার জুড়ে দিল ছোট কুকুরটা, যেন খুন করে ফেলা হচ্ছে তাকে। কঁউউ কঁউউ করে যেন চেঁচিয়ে বলছে, *বাবাগো! মেরে ফেললগো! বাঁচাওগো!*

শঙ্কিত হলো রবিন। সর্বনাশ করে দিল রাফি। চেঁচামেচি শুনে এখন বেরিয়ে আসবে স্মাগলাররা। রাফিকে সরে আসার জন্যে ডাক দিতে গেল...

কিন্তু মুখ খোলার আগেই যারা বেরিয়ে এল, তাদের দেখবে কল্পনাই করেনি সে। টোড পরিবার—মা, বাবা, ছেলে, তিনজনেই আছে! ও, এ কারণেই কুত্তাটাকে চেনা চেনা লাগছিল!

ঝট করে ফোকরে মাথা নামিয়ে ফেলল রবিন। তার ধারণা, নিশ্চয় কোনভাবে টোডরা জেনে গেছে ওরা দ্বীপে পালিয়ে এসেছে। ধরে নিতে এসেছে এখন। খবরটা বন্ধুদের জানানোর জন্যে তাড়াতাড়ি নেমে এল নিচে।

কুকুরের ঝগড়া গুহার ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছে। রবিন বলল, 'জিনা, রাফিকে জলদি ডাকো! ডারবির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে!'

অবাক হলেও প্রশ্ন করল না জিনা। আগে রাফিকে ডেকে আনা দরকার।

দুই আঙুল মুখে পুরে তীক্ষ্ণ শিস দিল। ডাকটা শুনতে পেল রাফি। এই আদেশ না মানার অর্থ তার জানা আছে। ভীষণ রাগ করবে জিনা। পিটুনিও লাগাতে পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডারবির কান কাটা স্থগিত রেখে ফিরে আসতে হলো তাকে। প্রথমবার যে ভাবে ঢুকেছিল, সে ভাবেই ফোকর গলে ধপ করে এসে পড়ল গুহার মেঝেতে। আরেকটু হলেই পড়েছিল মুসার মাথায়।

রাফির পিছু পিছু ছুটে এসেছে টেরি। হঠাৎ দেখল, কুকুরটা নেই। চোখের সামনে হাওয়া। একেবারে ভোজবাজি! চোখ ডলল। বিশ্বাস করতে পারছে না।

তার কাছে এসে দাঁড়াল তার বাবা-মা।

মিসেস টোড জিজ্ঞেস করল, 'কুত্তাটা গেল কোথায়? দেখতে কেমন?'

'মা, বললে বিশ্বাস করবে না,' টেরি বলল, 'কুত্তাটা দেখতে ঠিক জিনার শয়তান কুত্তাটার মত!'

গুহায় বসে তাদের কথা স্পষ্ট শুনতে পেল গোয়েন্দারা। ফিসফিস করে রাফিকে সতর্ক করল জিনা, শব্দ না করার জন্যে।

'তা কি করে হয়!' মিসেস টোড বলছে, 'ওরা তো গেছে রকি বীচে। কুত্তাটাকেও নিয়ে গেছে। নিজের চোখেই তো দেখলাম স্টেশনের দিকে যেতে। নিশ্চয় এটা অন্য কুত্তা। কেউ ফেলে গেছে।'

'তা তো বুঝলাম,' শোনা গেল টোডের খসখসে কণ্ঠ, 'কিন্তু গেল কোথায়?'

'মাটিতে তলিয়ে গেছে!' জবাব দিল টেরি।

'তোর মাথা!' ধমকে উঠল টোড। 'গাধা যে গাধাই রয়ে গেছে! মাটিতে তলায় কি করে! তুই তলাতে পারবি? মাটি কি পানি? এক হতে পারে, চূড়া থেকে নিচে পড়ে যেতে পারে। পড়লে মরবে। না মরলেও হাড্ডিগুড্ডি ভাঙবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'চূড়ার কাছে গর্তটর্তও থাকতে পারে,' মিসেস টোড বলল। 'হয়তো তাতে লুকিয়েছে। এসো না, দেখি।'

নিথর হয়ে বসে রইল গোয়েন্দারা। রাফির কলার চেপে ধরে রাখল জিনা। ঝোপঝাড়ের ডালপাতা সরানোর শব্দ কানে আসছে। সেই সঙ্গে কাঁটার আঁচড় খেয়ে উহ্-আহ্। ফোকরের মুখের কাছ থেকে দূরে রইল ওরা। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে না জেনে গর্তে পা দিয়ে বসতে পারে কোন টোড, গুহায় এসে পড়তে পারে।

কিন্তু কাঁটার জন্যেই বোধহয়, গর্তটার বেশি কাছে এল না ওরা। ফলে দেখতেও পেল না।

মিসেস টোডের কথা শোনা গেল, 'টেরি, সত্যি ওই কুত্তাটাকেই দেখেছিস তো? তোর তো আবার কথার কোন ঠিকঠিকানা নেই।'

'খোদার কসম, মা, ওটার মতই লাগল!'

'হুঁ! বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানেই এসে লুকিয়েছে হয়তো বিচ্ছুগুলো।

আমাদের বুঝিয়েছে, ট্রেনে করে চলে গেছে। এখানে এসে থাকলে আমাদের কাজ সব গড়বড় করে দেবে। নৌকা ছাড়া তো আসতে পারবে না, সেটা কোথায় আছে বের করা দরকার।'

'অত অস্থির হওয়ার কিছু নেই,' টোড বলল। 'এসে থাকলে খুঁজে পাবই। এত ছোট দ্বীপে লুকানোর জায়গা কম। বিশেষ করে নৌকাটা। পেয়েই যাব।'

'এখন খুঁজতে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধে নেই। টেরি, তুই ওদিক দিয়ে ঘুরে যা। ডোরিয়া, তুমি দুর্গের দিকে যাও। আমি এদিকটায় খুঁজছি।'

গুহার মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে রইল ছেলেমেয়েরা, যেন এভাবে থাকলেই আর খুঁজে পাবে না ওদেরকে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছে, যাতে নৌকাটা চোখে পড়ে না যায়।

তিন গোয়েন্দা, জিনা, রাফি; এদের কারও সামনেই পড়তে চায় না টেরি। ভয়ে ভয়ে এগোল। চলে এল ছোট্ট সৈকতে। বালিতে নৌকার দাগ দেখতে পেল বটে, কিন্তু চিনতে পারল না। জোয়ারের সময় পানি এসে অনেকখানিই মুছে দিয়ে গেছে দাগ। পানি ঢুকে থাকা ছোট গুহাটার দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। একবার এগোয় একবার পিছোয়, এরকম করতে করতে শেষমেষ এসে উঁকি দিল ভেতরে। অন্ধকার। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। ভেতরে ঢোকার আর সাহস করতে পারল না। ভাবল, কাজ কি বাবা ঢুকে! কোন জলদানব লুকিয়ে আছে এখানে কে জানে! ফিরে এল তার বাবা যেখানে খোঁজাখুঁজি করছে সেখানে।

'ওদিকটায় কিচ্ছু নেই,' জানাল টেরি।

তার মা-ও সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেল না, ফিরে এল।

টোডও কিছু না পেয়ে বলল, 'না, ওই ছেলেমেয়েগুলো নয়। তাহলে নৌকা থাকতই। ওটা অন্য কুত্তা। কেউ ফেলে গেছে এখানে। আস্তে আস্তে বুনো হয়ে উঠেছে। সে জন্যেই কামড়াতে এসেছে ডারবিকে।'

'তাহলে তো ভয়ের কথা,' মিসেস টোড বলল। 'আবারও আসতে পারে। আমাদেরকেই যে কামড়ে দেবে না তার ঠিক কি?'

'সাবধান থাকতে হবে। দেখলেই গুলি করে মারব এবার।'

হাঁপ ছাড়ল গোয়েন্দারা। যাক, আপাতত ফাঁড়া কাটল। ফোকরটা দেখতে পায়নি কানাগুলো। নৌকাটাও না। তবে রাফির জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠল জিনা। তার বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার একটা বড় কারণ, টোডেরা বিষ খাইয়ে রাফিকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এখানে এসেও নিশ্চিত হওয়া গেল না। সেই মেরে ফেলার ভয়। এখন বলছে, গুলি করে মারবে!

কথা বলতে বলতে সরে গেল টোডেরা।

শেকল দিয়ে রাফিকে বেঁধে ফেলল জিনা। গুহা থেকেই বেরোতে দেবে না আর। ডারবির গন্ধ পেলেই ও খেপে যায়, এ এক অদ্ভুত কাণ্ড! সাধারণত

এমন করে না রাফি। অন্য কুকুর দেখলে বরং বন্ধুত্বই করতে যায়।

খিদে পেয়েছে। টিন খুলে খাবার বের করতে লাগল রবিন। তাকে সাহায্য করল মুসা।

কিশোর বলল, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার, আমাদের খোঁজে আসেনি ওরা। ট্রেনে করে রকি বীচে চলে গেছি, এটাই বিশ্বাস করেছে।'

'তাহলে কেন এল?' মুসার প্রশ্ন।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

'আমরা পালিয়েছি বলেই হয়তো ওরাও ভয়ে পালিয়েছে,' আনারসের টিন খুলে রেখে মাংসের টিন টেনে নিল রবিন। 'পারকার আংকেলকে কি জবাব দেবে?'

'জবাব তো সহজ। বলবে, আমরা বাড়ি ফিরে গেছি। আংকেলও কিছু সন্দেহ করবেন না। তিনিই তো আমাদের চলে যেতে বলেছেন।'

'ভয়ে পালিয়েছে, না মরতে এসেছে, ওসব জানার দরকার নেই আমার!' ফুঁসে উঠল জিনা, 'এটা আমার দ্বীপ! এখানে আসার কোন অধিকার নেই ওদের! চলো, ঘাড় ধরে গিয়ে বের করে দিয়ে আসি!'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'ওদের সামনে যাওয়া যাবে না। আমাদের দেখলেই এখন গিয়ে বলে দেবে আংকেলকে। আংকেলেরও বিশ্বাস নেই। রেগেমেগে এসে হাজির হতে পারেন, আমাদের কান ধরে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে।' টিন থেকে চামচ দিয়ে আনারসের একটা টুকরো বের করে মুখে পুরল সে। চিবিয়ে গিলে নিয়ে বলল, 'তাছাড়া, আরও একটা কারণে ওদের সামনে যাব না এখন আমরা।'

'কি কারণ?' গলা বাড়াল মুসা।

অন্য দু-জনও আগ্রহ নিয়ে তাকাল।

'কেন, সন্দেহটা ঢোকেনি তোমাদের মাথায়?' কিশোর বলল, 'টোডরাও হয়তো স্মাগলিঙে জড়িত। ওরা এখানে আসে স্মাগলারদের রেখে যাওয়া মাল সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেশের ভেতর চালান দিতে। টোড নাবিক। নৌকায় করে এখানে যাতায়াত করা তার জন্যে কোন ব্যাপারই না। কি, খুব একটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে?'

'না,' মাথা নাড়ল জিনা, 'মোটেও অসম্ভব না!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'টোডরা চলে যাক, তারপর গিয়ে পাতালঘরে ঢুকব আমরা। দেখব, কিছু আছে কিনা। ব্যাটাদের শয়তানি বন্ধ করতেই হবে!'

এগারো

গেল না টোডেরা।

ফোকর দিয়ে মুখ বের করে দুর্গের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ

ব্যথা করে ফেলল গোয়েন্দারা, কিন্তু টোডদের যাওয়ার কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। চত্বরে এক-আধবারের জন্যে বেরোনো ছাড়া তেমন একটা বাইরে বেরোতেও দেখা গেল না ওদের। যেন ছুঁচো হয়ে গেছে, পাতালঘরের অন্ধকারে বসে থাকাটাই বেশি আরামের, দিনের আলো সহ্য করতে পারে না।

ইতিমধ্যে আরেকটা কাজ করে এসেছে রবিন। পাহাড়ে চড়ায় ওস্তাদ সে। তাই তাকেই পাঠিয়েছিল কিশোর, টোডরা কিসে করে এসেছে দেখে আসার জন্যে। এ পাহাড় সে পাহাড় করে ঘুরে ঘুরে একটা পাহাড়ের গোড়ায় যেই নেমেছে, অমনি একটা পাথরের আড়ালে দেখতে পেয়েছে ছোট নৌকাটা।

প্রণালী দিয়ে ঢোকেনি টোডরা, সে-জন্যেই জিনার নৌকাটা দেখতে পায়নি। তবে ওস্তাদ নাবিক বলতে হবে টোডকে। দ্বীপের যেখানে এনে নৌকা ভিড়িয়েছে, সেখানে আনাটা সত্যি কঠিন। ভাঙা জাহাজটার কাছাকাছিই, কিশোর যেখানে সন্দেহ করেছিল।

বিকেল পেরিয়ে গেল। আরেকটু পরেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই ছায়া নামতে শুরু করেছে পাহাড়ের গোড়ায়।

কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে রাতটা এখানেই কাটাবে ওরা।'

'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কোন লাভ হলো না,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'যাদের যন্ত্রণায় পালালাম, তারাই এসে হাজির। ধুর!'

গুহার ভেতরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। মোম জ্বালিল রবিন। বলল, 'চলো, ভয় দেখাই ব্যাটাদের।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা।

'আছে তো পাতালঘরে। তোমার মত ওদেরও ভূতের ভয় থাকতে পারে।'

রবিনের পরিকল্পনা কিছুটা আন্দাজ করে ফেলেছে কিশোর। মুচকি হাসল।

মুসা বুঝল না। 'খুলেই বলো না ছাই!'

রবিন বলল, 'বুঝলে না? দুর্গের নিচে কিছু কিছু জায়গায় প্রতিধ্বনি খুব বেশি হয়, ভুলে গেছ? পাতালঘরের কাছে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করব আমরা। ভূতের ভয় দেখাব ওদের।'

চটাস করে নিজের উরুতেই চাটি মারল মুসা; 'দারুণ আইডিয়া! এক্ষুণি চলো! ব্যাটাদের কলজে শুকিয়ে না দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়!'

'এখন না,' মুচকি হাসল কিশোর, 'আরেকটু রাত হোক।'

জিনা বলল, 'রাফিকে কি করব? ও তো গিয়েই ঘেউ ঘেউ শুরু করবে। ভূত যে নয়, বুঝে ফেলবে টোড। ভাববে, বুনো কুকুরটাই, মারতে বেরোবে।'

'ওকে সিঁড়ির মুখে পাহারায় রেখে যাব। স্মাগলারদের কেউ এলে সতর্ক করতে পারবে আমাদের।'

আরও প্রায় ঘন্টাখানেক পর রওনা হলো ওরা। চলে এল দুর্গের চত্বরে। টোডদের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। আগুন নেই, আলো নেই। পাতালঘরে নামার সিঁড়ির মুখের পাথরগুলো সরানো, তাতে বোঝা গেল নিচেই রয়েছে ওরা।

'রাফি, একদম চুপ করে থাকবি,' কড়া নির্দেশ দিল জিনা। 'কেউ এলে আমাদের হুঁশিয়ার করবি। মানুষ না দেখলে চেঁচাবি না, খবরদার!'

'ও কি আর বুঝবে নাকি কিছু?' কিশোর বলল, 'খরগোশ দেখলেও চেঁচানো শুরু করবে। একজনকে এখানে থাকা দরকার।'

কে থাকবে? ভয় পেয়ে টোডরা কি করে, মজা দেখার লোভ সবারই। শেষে জিনা নিজেই বলল, 'তোমরাই যাও। আমি থাকি। রাফিকে একা একা ছেড়ে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না আমি।'

সিঁড়ি বেয়ে পাতালঘরে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। নিচে অনেক ঘর, কোনওটা সেলার, কোনওটা ডানজন। বদ্ধ বাতাসে একধরনের ভাপসা গন্ধ।

বড় একটা ঘরে ঢুকল ওরা। টর্চের আলোয় দেয়ালে গাঁথা লোহার সারি সারি আঙটা দেখা গেল। একসময় এটা বোধহয় জেলখানা ছিল, কিংবা টর্চার চেম্বার। দুর্ভাগা বন্দিদের ধরে এনে এখানে বন্দি করে রাখা হত, লোহার আঙটায় শেকল দিয়ে বেঁধে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হত তাদের ওপর। মধ্যযুগীয় এসব বর্বতার ইতিহাস অনেক পড়েছে রবিন। মুসারও জানা আছে কিছু কিছু। তার মনে হতে লাগল, ভয়াবহ যন্ত্রণা পেয়ে মারা যাওয়া সে সব মানুষের প্রেতাত্মারা এখনও ঘুরে বেড়ায় পাতালের এসব ঘরে ঘরে, করিডরে। গায়ে কাঁটা দিল তার।

সঙ্গে টর্চ আছে। কিন্তু পারতপক্ষে সেটা জ্বালছে না কিশোর। প্যাসেজ ধরে যাওয়ার সময় দেয়ালে চক দিয়ে এঁকে চিহ্ন দিয়ে রাখল, যাতে ফেরার সময় অসুবিধে না হয়।

হঠাৎ কথার শব্দ কানে এল। আরেকটু আগে বাড়তেই একটা ফোকর দিয়ে আলো চোখে পড়ল। সেই ঘরটায় আস্তানা গেড়েছে টোডরা, যেখানে সোনার বারগুলো খুঁজে পেয়েছিল তিন গোয়েন্দা।

ফিসফিসিয়ে মুসা বলল, 'আমি গরু।'

'মানে!' চমকে গেল রবিন। ভাবল, ভূতের ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সহকারী গোয়েন্দার।

'আমি গরুর ডাক ডাকব।'

'ও, তাই বলো। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। বেশ, আমি তাহলে ছাগল। কিশোর, তুমি? গাধা?'

'জন্তু-জানোয়ারের ডাক আমি ভাল পারি না। তবু দেখি, পারি কিনা।'

একটা পাথরের থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে গরুর ডাক ডেকে উঠল মুসা।

শব্দ শুনে সে নিজেই চমকে গেল। বিকট শব্দ হয়েছে বদ্ধ জায়গায়, সেই সঙ্গে প্রতিধ্বনি; মূল শব্দটাকে ভয়াবহ করে তুলেছে।

ফোকর দিয়ে তাকিয়ে আছে রবিন ও কিশোর। টোডদের প্রতিক্রিয়া দেখছে।

ভীষণ চমকে গিয়ে প্রায় ককিয়ে উঠল টেরি, 'মা, কিসের শব্দ!'

তার কুকুরটা তার চেয়েও ভীতু। গিয়ে লুকাল ঘরের কোণে।

'গরু,' বলেই টোড নিজেও থমকে গেল। 'এখানে গরু আসবে কোত্থেকে!'

মুসা সরে এল থামের আড়াল থেকে। সেখানে চলে গেল রবিন। ম্যাঁ-ম্যাঁ করে উঠল ছাগলের মত। থামল না, ডেকেই চলল।

'আরিসব্বোনাশ!' চোখ বড় বড় করে ফেলল মিসেস টোড। 'এসব এল কোত্থেকে!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টোড। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ।

কয়েকবার ডেকে চুপ হয়ে গেল রবিন।

কিশোরের গায়ে গুঁতো দিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল মুসা। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে।

কিশোর ব্যাঁ-ব্যাঁ করে যে ডাকটা ডাকল, সেটা গাধায় শুনলেও চমকে যেত, এতটাই বিকৃত আর ভয়ঙ্কর, পিলে চমকে দেয়ার মত; এবং সত্যি সত্যি চমকেও দিল টোড পরিবারের।

শুধু ডাকাডাকি করেই থামল না কিশোর, এমন করে লাথি মারতে লাগল, মনে হচ্ছে সাংঘাতিক রেগে গিয়ে মেঝেতে পা ঠুকছে সাংঘাতিক জানোয়ারটা।

ঘরের দরজার কাছে সরে এল মিসেস টোড। ভয়ে ভয়ে বলল, 'হেই হেই, যাহ্, যাহ্!'

ফিক করে হেসে ফেলল রবিন। কিন্তু তার হাসিটা শুনতে পেল না মিসেস টোড, কিশোরের চিৎকারে। নাকি স্বরে চেঁচিয়ে টেনে টেনে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'সাঁব-ধাঁন!' তারপর আবার গাধার ডাক, মেঝেতে পা ঠোকাঠুকি।

লাফ দিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতরে পড়ল মিসেস টোড। দড়াম করে লাগিয়ে দিল ভারি কাঠের দরজাটা। কাঁপা গলায় বলল, 'রোজ রাতেই যদি এই কাণ্ড চলে, এখানে থাকা যাবে না!'

দাঁতাল শুয়োর রেগে গেলে যেমন করে তেমনি ভাবে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল মুসা।

হা-হা করে হেসে ফেলল রবিন। ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠল।

কিশোরও হাসছে। বলল, 'আর পারি না! চলো এখান থেকে! বেরোও!'

বিকৃত হয়ে প্রতিধ্বনিত হলো তার কথা : *পারি না! পারি না! পারি*

না!...খান থেকে! খান থেকে! খান থেকে!...বেরোও! বেরোও! বেরোও!

সিঁড়ির ওপরে উঠেও তাদের হাসি থামল না।

সব শুনে জিনাও হেসে গড়িয়ে পড়ল।

গুহায় ফিরে চলল ওরা। কিন্তু হাসি আর থামতে চায় না। কিছুই না বুঝে ঘউ ঘউ করল কয়েকবার রাফি।

আস্তে আস্তে কমে এল হাসি।

কিশোর বলল, 'ওরা যে আমাদের খুঁজতে আসেনি, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। স্মাগলারদের সঙ্গে জড়িত। এ কাজে সুবিধে হবে বলেই হয়তো মিসেস টোড চাকরি নিয়েছিল জিনাদের বাড়িতে।'

'এবার তো তাহলে বাড়ি ফেরা যায়,' রবিন বলল।

'চোরগুলোকে হাতেনাতে না ধরেই?'

কথা বলতে বলতে পাহাড়ের চূড়ায় চলে এল ওরা। ফোকর দিয়ে গুহায় নামবে। টর্চ জ্বালতে যাবে কিশোর, এই সময় তার হাত খামচে ধরল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'ওই দেখো!'

সাগরের মাঝে একটা আলো, জ্বলছে-নিভছে।

কিশোরের মনে হলো, কোন বোট কিংবা জাহাজ থেকে টর্চের সাহায্যে সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে। আবার বোধহয় পুরানো জাহাজের লকারে চোরাই মাল রেখে যাওয়া হয়েছে। সঙ্কেত দিচ্ছে টোডকে সে কথা জানানোর জন্যে।

অনেকক্ষণ ধরে চলল এই সঙ্কেত দেয়া।

'এতক্ষণ কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'হয়তো এপাশ থেকে জবাব আশা করছে। না পেয়ে সঙ্কেত দিয়েই চলেছে।'

আবার হাসতে শুরু করল মুসা, 'তাহলে জবাবের আশা আজ ওদের ছাড়তে হবে। মেরে ফেললেও জনাব বেঙ আজ আর গর্ত থেকে বেরোবে না।'

একসময় থেমে গেল আলোর সঙ্কেত। আর জ্বলল না।

গুহায় ঢুকল গোয়েন্দারা।

কোন রকম অঘটন ঘটল না আর। নিরাপদে কাটিয়ে দিল রাতটা।

বারো

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে বসেও প্রথমেই টোডদের কথা উঠল।

রেগে উঠল জিনা, 'বুড়িটা নাম্বার ওয়ান চোর! আমাদের ঘরের জিনিসপত্র সব ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে, দেখোগে!'

'তা তো কিছু এনেছেই,' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'আন্টি এসে তাঁর ঘরের এ হাল দেখলে খুব কষ্ট পাবেন।'

'ভালমত একটা শিক্ষা দিয়ে দেয়া দরকার,' গজগজ করতে লাগল মুসা।
'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন।
'নৌকায় করে এনেছে, সেটা তো বোঝাই গেছে,' বলল কিশোর। 'মালগুলো কোথায় রেখেছে দেখা দরকার। নিশ্চয় পাতালঘরে।'
'চলো, দেখে আসি।'
'ওরা যদি থাকে?' মুসার প্রশ্ন।
'আছে তো জানা কথাই,' রবিন বলল। 'নজর রাখব। তারপর যেই দেখব সরেছে, অমনি নেমে যাব পাতালে।'
'বুদ্ধিটা মন্দ না,' কিশোর বলল। 'চলো।'
'রাফিকে কি করব?' জিজ্ঞেস করল জিনা।
'এখানেই রেখে যেতে হবে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে সব ভজঘট করে দিতে পারে।'
'একা থাকবে? কেঁদেই মরে যাবে ও। এক কাজ করো, তোমরা যাও। আমি বরং ওর সঙ্গে থেকে যাই,' আসলে গুহার মধ্যেও রাফিকে একা রেখে যেতে ভয় পাচ্ছে জিনা। যদি কোন কারণে ডাকতে শুরু করে কুকুরটা? আর তার ডাক শুনে এসে হাজির হয় টোড?
'থাকবে? ঠিক আছে, থাকো।'
দড়ি বেয়ে ফোকরের কাছে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। বড় একটা ঝোপে ঢুকে চোখ রাখল দুর্গের ওপর।
'উফ্, কি কাঁটার কাঁটারে বাবা!' কনুই ডলতে ডলতে গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'সব ছিলে ফেলেছে!'
'চুপ!' সাবধান করল রবিন, 'বেঙের গোষ্ঠী বেরোচ্ছে।'
একে একে বেরিয়ে এল তিন টোড। পাতালঘরে অমাবস্যার অন্ধকার। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে খুশি হয়েছে, ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যায়।
এদিক এদিক তাকাতে লাগল ওরা। ডারবি রয়েছে মিসেস টোডের পা ঘেঁষে। পায়ের ফাঁকে ঢোকানো লেজ।
'গরু-ছাগল খুঁজছে!' হেসে ফেলল মুসা।
'চুপ! আস্তে!' সাবধান করল তাকে কিশোর, 'শুনে ফেলবে!'
দু-তিন মিনিট কথা বলল মিসেস আর মিস্টার টোড, তারপর এগিয়ে গেল দুর্গের কিনারের দিকে, যেখান থেকে ভাঙা জাহাজটা দেখা যায়। টেরি গেল দেয়াল ধসে পড়া একটা ঘরের দিকে। ছাতও বেশির ভাগই নেই ওটার।
'আমি টোডদের পিছে যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'টেরি কি করে দেখো তোমরা।'
ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল সে।
মুসা আর রবিনও ঝোপ থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে চলে এল দুর্গের কাছাকাছি, টেরি দেখে ফেলার আগেই চট করে বসে পড়ল আরেকটা ঝোপের আড়ালে।

খোলা চত্বরে ছোটাছুটি করছে ডারবি। শিস দিতে দিতে ভাঙা ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল টেরি। দু-হাতে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে রেখেছে কয়েকটা গদি।

'জিনাদের জিনিস!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মুসা, 'সবচেয়ে ভালগুলো নিয়ে এসেছে!'

'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা,' বলে একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল রবিন। টেরি এবং ডারবির মাঝখানে পড়ে ভাঙল ওটা।

হাত থেকে গদিগুলো ছেড়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল টেরি। ভয় পেয়েছে।

আরেকটা ঢেলা নিয়ে আবার ছুঁড়ে মারল রবিন। নিশানা ঠিক হলো, পড়ল ডারবির ওপর। ঘেঁউক করে উঠে একলাফে গিয়ে সিঁড়ির গর্তে ঝাঁপ দিল কুকুরটা।

আবার আকাশের দিকে তাকাল টেরি। তারপর চারপাশে তাকাতে লাগল। ঢিল কোনখান থেকে আসছে বুঝতে পারছে না।

মুচকি হাসল মুসা। বুদ্ধিটা ভালই করেছে রবিন। টেরি ওদের দিকে পেছন করতেই অনেক বড় একটা ঢেলা তুলে ছুঁড়ে মারল সে। টেরির পায়ের কাছে পড়ে ভাঙল ঢেলাটা।

অবাক হয়ে নিচের দিকে তাকাল টেরি। তাকে কিছু বোঝার সামান্যতম সময় না দিয়ে ঢিল ছুঁড়ল রবিন।

কাঁধে পড়ল টেরির। 'মা-গো!' করে চেঁচিয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল সে।

চিৎকার করে গরুর ডাক ডেকে উঠল মুসা।

আর সহ্য করতে পারল না টেরি। দুই হাত তুলে চিৎকার করতে করতে গিয়ে তার কুকুরটার মতই লাফ দিয়ে পড়ল সিঁড়িতে।

শেষ ঢিলটা ছুঁড়ল মুসা। নিখুঁত নিশানা। সিঁড়ির গর্তে গিয়ে পড়ল ওটা। ভেতর থেকে আর্তচিৎকার শোনা গেল। নিশ্চয় মাথায় পড়েছে টেরির।

'জলদি!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন, 'এটাই সুযোগ!'

একদৌড়ে দু-জনে গিয়ে চত্বর থেকে গদিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে এল ঝোপের কাছে।

'ভেতরে কি আছে দেখে আসতে পারি,' রবিন বলল। 'তুমি এক কাজ করো। সিঁড়ির মুখের কাছে গিয়ে বসে থাকো। টেরির মাথা দেখলেই গরু হয়ে যাবে। ব্যস, আর কিছু করা লাগবে না। মাটি ফেড়ে ভেতরে ঢুকে যেতে চাইবে ও। আমি গিয়ে কুয়ার ভেতর দিয়ে পাতালঘরে নামব। দেখে আসি, কি কি জিনিস চুরি করেছে ধাড়ি বেঙগুলো।'

আঙটা ধরে নামতে মোটেও অসুবিধে হলো রবিনের। এই কাজ আগেও একাধিকবার করেছে সে। দুর্গের নিচে নামা লাগতে পারে, এ জন্যে তৈরিই হয়ে এসেছে ওরা। কোমর থেকে টর্চ খুলে জ্বালল। রাতে যে ঘর থেকে ভয় দেখিয়েছে টোডদের, তার পাশের ঘরটায় এসে ঢুকল।

জিনিসপত্র কম আনেনি টোডেরা, তিনজনের সাধ্যে যা কুলিয়েছে, এনেছে। কম্বল, তৈজসপত্র, খাবার তো আছেই, হাতে করে আনা যায় দামী এরকম যা যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে এখানে ওদের।

কুয়া থেকে উঠে এসে দেখল রবিন, সিঁড়ির মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুসা। তাকে নিয়ে সরে চলে এল ঝোপের কাছে। জানাল, কি দেখে এসেছে।

ফিসফাস করে কথা বলছে ওরা, এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো কিশোর। বলল, 'পাথরের আড়ালে নৌকা লুকিয়ে রাখে টোড। বের করে নিয়ে ভাঙা জাহাজটায় গেছে, বোধহয় ট্রাংকটা আনতে। তীরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে মিসেস টোড।'

মুসা আর রবিনও জানাল, ওরা কি কি করেছে।

শুনে হাসল কিশোর। 'তাহলে এটাই সুযোগ।'

'কিসের?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'জিনিসগুলো নিয়ে আসার।' মুখ বাঁকাল কিশোর, 'আস্ত চোর! কেন যে এগুলোকে জায়গা দিয়েছিলেন কেরিআন্টি··· দাঁড়াও, সব নিয়ে আসব। একটা জিনিসও রেখে আসব না।'

মুসাকে আবার সিঁড়ির মুখে পাহারায় রেখে নিচে নেমে গেল কিশোর আর রবিন। টেরি আর তার ভীতু কুকুরটার ছায়াও চোখে পড়ল না। নিশ্চয় সিঁড়ির নিচে কোথাও লুকিয়ে বসে আছে।

ব্যাগে ভরে জিনিসগুলো এনেছে টোডেরা। সেই সব ব্যাগে ভরেই আবার দড়িতে বেঁধে কুয়া দিয়ে বের করে আনল গোয়েন্দারা। একটা জিনিসও রাখল না।

দুই টোড এখনও ফেরেনি। এখানে আর থাকার প্রয়োজন মনে করল না তিন গোয়েন্দা। জিনিসগুলো সব বয়ে নিয়ে এল ফোকরের কাছে। দড়িতে বেঁধে গুহায় নামাল।

'সর্বনাশ করে দিয়েছিল শয়তানগুলো!' ফুঁসতে লাগল জিনা। তবে তার রাগ বেশিক্ষণ থাকল না। টেরিকে কি ভাবে ভয় দেখিয়েছে রবিন ও মুসা, শুনে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

কিশোর বলল, 'ট্রাংকটাও রাখতে দেব না ওদেরকে। মুসা, চলো, দেখি। এনে থাকলে ওটাও কেড়ে আনব।'

ফোকর দিয়ে আবার বেরোল দু-জনে। দেখে, ট্রাংকটা দুর্গের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুই টোড। চত্বরের কাছে গিয়ে ওটা নামিয়ে রেখে এদিক ওদিক তাকাল মিসেস, 'টেরি গেল কোথায়?···টেরি! টেরি!'

মায়ের ডাক শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল টেরি।

'তোকে না বললাম এখানে থাকতে? নিচে কি করছিস?'

'এখানে থেকে মরব নাকি!'

'মরব নাকি মানে?'

'আবার সেই ভূতুড়ে গরু এসে হাজির! ডাকাডাকি করল, আমাদের ঢিল মারল···ভয়ানক জানোয়ার! ওরা কি ওপরে থাকতে দেয়?'

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে টোড, যেন বোঝার চেষ্টা করছে পাগল-টাগল হয়ে গেল নাকি। 'গরু তোকে ঢিল ছুঁড়ল?'

'ছুঁড়লই তো, মিথ্যে বলছি নাকি? ডারবিকে জিজ্ঞেস করে দেখো। কি আর বলব তোমাকে, বাবা, একটা-দুটো না, হাজারে হাজারে গরু! একেক শিঙ কি! আট-দশ হাত করে লম্বা। দেখো না, ভয়ে ডারবিটা আর বেরোচ্ছেই না।'

'ভীতুর ডিমটাকে তো খামোকা খাওয়াস···'

'এই, ডারবিকে কিছু বলবে না বলে দিলাম!' রেগে উঠল মিসেস টোড। 'ওর কি দোষ? গরুর সঙ্গে কুকুর কখনও পারে নাকি?'

'না পারলে ওটাকে রাখার কি দরকার?' ছেলের দিকে তাকাল আবার টোড, 'গদিগুলো কোথায়? নিচে রেখে এসেছিস?'

'রাখলাম আর কখন। সবে এনেছি, গর্তে নামব, এই সময় গরুগুলো এসে হাজির।'

'কোথায় ফেলেছিস?' আশপাশে তাকাল টোড।

'এখানেই তো ছিল। ওরাই হয়তো নিয়ে গেছে!'

গরুতে ঢিল ছোঁড়ে, গদি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না, টোডও করল না। 'কেউ আছে এই দ্বীপে, আমি এখনও বলছি। সে-ই এই কাণ্ড করছে।'

'তা তো আছেই, ওই গরুগুলো···'

'চুপ, গাধা কোথাকার!'

নিচ থেকে ডারবির করুণ চিৎকার শোনা গেল।

মিসেস টোড বলল, 'বেচারা! ওপরে আসতেও ভয় পাচ্ছে! এই ডারবি, ডারবি, আয়, আয়। কেউ কিচ্ছু করবে না।'

কিন্তু মিসেস টোডের কথায় ভরসা করতে পারল না কুকুরটা। এল না ওপরে।

'যাই, নিয়ে আসিগে। খাবারও আনতে হবে। এখানে বসেই খাব,' নিচে নেমে গেল মিসেস টোড। একটু পর গর্তের মুখ দিয়ে প্রায় ছিটকে বেরোল সে। উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'এই শোনো, কিছুই নেই···কিচ্ছু না···সব নিয়ে গেছে···'

'বললাম না, গরুগুলোর কাজ!' টেরি বলল, 'তোমরা তো বিশ্বাস করতে চাও না···'

তার কথায় কান দিল না তার বাবা। নেমে গেল গর্তের ভেতর। পেছনে গেল অন্য দু-জন।

মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরেই উঠে দৌড় দিল কিশোর।

চত্বরে ফেলে রাখা ট্রাংকটা বয়ে নিয়ে এল দু-জনে। গুহায় এনে রাখল। এরপর কি ঘটে দেখার জন্যে আবার বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর।

গর্ত থেকে বেরিয়ে এল টোড। ট্রাংকটা যেখানে ছিল সেদিকে চোখ পড়তেই হাঁ হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, 'ডোরিয়া, দেখে যাও, ট্রাংকটাও নেই!'

দেখে মিসেস টোডও হাঁ। টেরির ভঙ্গি দেখে তো মনে হলো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে।

তার মা বলল, 'দ্বীপে যে-মানুষ আছে, আর কোন সন্দেহ নেই। ভূতেরা দিনের বেলা বেরোয় না। জন, তোমার পিস্তলটা আছে?'

'আছে,' পকেটে চাপড় দিল টোড।

'এসো, পুরো দ্বীপ খুঁজে দেখব আজ। বের করেই ছাড়ব।'

তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে বন্ধুদের খবরটা জানাল কিশোর। গুহার মধ্যে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। রাফিকে চুপ থাকতে বলল জিনা।

খুঁজতে খুঁজতে গুহার ওপরে চলে এল টোডেরা।

টেরির গলা শোনা গেল, 'বাপরে বাপ, কি কাঁটার কাঁটা!'

টোড বলল, 'ডোরিয়া, দেখো, এই ঝোপটায় কেউ বসেছিল! ঘাস দুমড়ে গেছে, দেখেছ? ডালও ভেঙেছে।'

'তাহলে সেই কেউটা এখন কোথায়?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

আস্তে আস্তে সরে গেল দুই টোডের কণ্ঠ।

যাক, এবারেও দেখতে পায়নি ফোকরটা। সবে শরীর ঢিল করে বসেছে গোয়েন্দারা, এই সময় ঘটল ঘটনাটা। ওপর থেকে ধুড়ুম করে এসে মেঝেতে পড়ল টেরি! ঝোপে ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে ফোকরে পা দিয়ে ফেলেছিল সে। আর ঠেকাতে পারেনি। ঢালু সুড়ঙ্গ দিয়ে পড়েছে এসে গুহার ভেতরে। নরম বালিতে পড়েছে বলে রাফির মতই সে-ও ব্যথা পায়নি। তবে অবাক হয়েছে খুব।

বিমূঢ় অবস্থাটা কাটতে সময় লাগল তার। কিশোরদের এখানে দেখতে পাবে কল্পনাই করতে পারেনি। চিৎকার করে মাকে ডাকার জন্যে মুখ খুলতেই মুসার থাবা এসে পড়ল তার মুখে। চেপে ধরল। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'টুঁ শব্দ করলেই রাফিকে ছেড়ে দেব। তোমাকে খাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে ও।'

কথাটা বিশ্বাস করল টেরি। চিৎকার করল না। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে রাফির দিকে।

টেরির মুখ থেকে হাত সরিয়ে আনল মুসা।

সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল টেরি। মিন মিন করে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি করছ তোমরা?'

'তোমার মুণ্ডু কাটতে এসেছি!' ধমকে উঠল জিনা। 'এটা আমাদের দ্বীপ, ইচ্ছে হলেই আসব, কিন্তু তোমরা এসেছ কোন সাহসে? কাকে বলে এসেছ?'

তার সঙ্গে সুর মিলিয়েই কড়া গলায় ধমক দিল রাফিও, 'খউ', অর্থাৎ, *জবাব দাও!*

'এই, তুই থাম! বেঙগুলো শুনে ফেলবে!'

ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে টেরি।

'দ্বীপে এসেছ কেন তোমরা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তা তো জানি না,' ভোঁতা গলায় জবাব দিল টেরি। 'বাবা আসতে বলল, এলাম।'

'দেখো, মিথ্যে বলে পার পাবে না। স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত না তোমার বাবা?'

বিস্ময় ফুটল টেরির চোখে। 'স্মাগলিঙ!'

'হ্যাঁ, স্মাগলিঙ। চোরাচালান।'

'কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখো, আমাকে ছেড়ে দাও...'

'এঁহ, মামার বাড়ির আবদার!' মুখ ভেঙচে বলল মুসা, *'ছেড়ে দাও!'* দিই, তারপর গিয়ে বলো বাপ-মাকে, পিস্তল নিয়ে তেড়ে আসুক...ওসব ঘ্যানর ঘ্যানর করে লাভ নেই, বেঙাচি, ছাড়া তোমাকে হবে না। এসেই যখন পড়েছ, এখানেই থাকতে হবে।'

'আমার বাবা আমাকে খুঁজে বের করবেই...'

যেন তার কথায় সাড়া দিয়েই ডেকে উঠল টোড, 'টেরি, টেরি, কোথায় গেলি? এই টেরি!'

জবাব দিতে যাচ্ছিল, রাফির ওপর চোখ পড়ে গেল টেরির। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে কুকুরটা। হাঁ করা মুখটা হাঁ-ই থেকে গেল তার, শব্দ আর বেরোল না। ঢোক গিলল সে।

খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করে সেখান থেকে সরে গেল টোড।

অনেকক্ষণ পরও যখন আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, কিশোর বলল, 'ট্রাংকে কি আছে এবার দেখতে হয়।'

রবিন বলল, 'তালা কি করবে?'

একটা পাথর তুলে নিল মুসা, 'এই তালা কিছু না।'

কয়েক বাড়িতেই তালা দুটো ভেঙে ফেলল সে।

ডালা তুলল।

ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে হুড়াহুড়ি করে এগিয়ে এল সবাই, টেরি বাদে। এসবে তার কোন আগ্রহ নেই। মুখটাকে করুণ করে রেখেছে সে। মনে হচ্ছে, ধমক দিলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে এখন।

ট্রাংকের একেবারে ওপরে রয়েছে একটা ছোটদের কম্বল, এমব্রয়ডারি করে তাতে সাদা খরগোশ আঁকা। টেনে বের করল ওটা কিশোর, নিচে কি

আছে দেখার জন্যে। দেখে অবাক হয়ে গেল। এক এক করে জিনিসগুলো বের করে রাখল বালিতে।

দুটো নীল রঙের জার্সি, দুটো নীল স্কার্ট, একটা গরম কোট, এবং আরও কিছু জামা-কাপড়। কাপড়ের নিচে রয়েছে চারটে পুতুল আর একটা খেলনা ভালুক।

'এগুলোর মধ্যে করেই হেরোইন পাচার করে,' মুসা বলল। 'দেখো কেটে, কাটলেই পেয়ে যাবে।'

কিন্তু কিশোরের সন্দেহ হলো। টিপেটুপে দেখল। ভেতরে কিছু আছে বলে মনে হলো না। তবু আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কেটে দেখল একটা পুতুল। অতি সাধারণ খেলনা। ভেতরে কিছুই নেই—হীরা, মাদকদ্রব্য, কিংবা চোরাচালানি করে আনার মত কোন জিনিস, কিচ্ছু না।

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা।

আনমনে নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। বিড়বিড় করে বলল, 'এই জিনিস এত কষ্ট করে ভাঙা জাহাজে এনে লুকানোর অর্থ কি?'

তেরো

অনেক ভাবে জিজ্ঞেস করেও টেরির কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করা গেল না। আসলেই কিছু জানে না সে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রাতে যে একটা জাহাজ এসে সঙ্কেত দেয়, এ ব্যাপারেও কিছু জানো না?'

মাথা নাড়ল টেরি। 'সঙ্কেতের কথা কিছু জানি না। তবে মাকে বলতে শুনেছি, আজ রাতে যোগাযোগ করার কথা মারিয়ার।'

'*মারিয়া!* কি ওটা? জাহাজ, বোট, না কোন মানুষ?'

'জানি না। জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম, মাথায় গাট্টা মারল বাবা।'

'তারমানে গুরুত্ব আছে। গোপন ব্যাপার, তোমাকে জানাতে চায়নি। বেশ, আজ রাতে নজর রাখব আমরা।'

সারাটা দিন গুহা থেকে বেরোল না ওরা, বেরোতে পারল না, টোডদের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে।

বহুযুগ পরে যেন অবশেষে সন্ধ্যা হলো। রাত নামল। তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল সবাই। ভাল খাবার পেয়ে এত খাওয়া খেলো টেরি, পেট ভারী করে ফেলল। তারপর আর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। বালিতেই শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করল, অনেকটা বাপের মত করে।

দু-জন দু-জন করে পালা করে পাহারা দেবে, চোখ রাখবে সাগরের ওপর, ঠিক করল কিশোর। প্রথম উঠে গেল সে আর জিনা। রাত সাড়ে বারোটায় নেমে এসে মুসা আর রবিনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে জানাল, কিছু

দেখেনি। ওদেরকে যেতে বলল।

টেরি গভীর ঘুমে অচেতন। তার কাছেই শুয়ে আছে রাফি। পাহারা দিচ্ছে।

ফোকরের বাইরে বেরোল দুই গোয়েন্দা।

চাঁদ উঠেছে। ঘোলাটে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে সাগরের ওপর। আকাশে প্রচুর হালকা মেঘ, ছুটছে দিগ্বিদিক, আপাতত বৃষ্টি হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

আধঘন্টা মত গেছে, হঠাৎ কানে এল কথার শব্দ।

রবিনের কানে কানে বলল মুসা, 'টোডরা বেরিয়েছে! ভাঙা জাহাজে যাচ্ছে বোধহয়।'

দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল। খানিক পরেই নৌকাটাও নজরে এল দু-জনের।

মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল রবিন। নীরবে হাত তুলে দেখাল সাগরের দিকে।

বেশ অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে আলো। আগের রাতের মতই জ্বলছে-নিভছে। চাঁদের আলোয় বড় একটা বোটের অবয়বও দেখা যাচ্ছে, সঙ্কেত দেয়া হচ্ছে ওটা থেকেই।

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। অন্ধকার হয়ে গেল সাগর। আর কিছু চোখে পড়ছে না।

একটু পরেই মেঘ সরে গেল।

'ওই যে, আরেকটা নৌকা,' মুসা বলল। 'বোটের কাছ থেকে আসছে।'

'নিশ্চয় দেখা করবে একটা আরেকটার সঙ্গে। মাল পাচার করে এভাবেই।'

ঠিক এই সময় নিতান্ত বেরসিকের মত আবার মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না গোয়েন্দারা। দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে বকের মত। কিন্তু আলো না থাকলে কিছু করেই লাভ নেই।

কোন জায়গায় মিলিত হলো নৌকাদুটো, দেখতে পেল না ওরা। আবার যখন চাঁদ বেরোল, তখন দেখল, বোটের কাছ থেকে আসা নৌকাটা চলে যাচ্ছে।

বসেই রইল ওরা।

প্রায় বিশ মিনিট পর টোডদের নৌকাটাকে তীরে ভিড়তে দেখল।

কোন পথে ওপরে উঠল ওরা, দেখতে পেল না গোয়েন্দারা। দেখল, যখন একেবারে দুর্গের কাছে চলে এসেছে।

টোডের হাতে বড় বান্ডিলের মত একটা জিনিস।

'অনেক মাল এনেছে আজ,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

এই সময় দু-জনকেই চমকে দিয়ে শোনা গেল একটা চিৎকার, অনেকটা

আর্তচিৎকারের মত। ভয়ে, বিরক্তিতে, যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছে যেন কোন ছোট্ট মেয়ে।

গুহায় ফিরে জিনা আর কিশোরকে সব জানাল দু-জনে।

'বুঝতে পেরেছি,' বলে উঠল কিশোর, 'আর কোন সন্দেহ নেই!'

'কি বুঝেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বাচ্চাদের কম্বল, পুতুল, এসব।'

'আবার গ্রীক!'

'খুব সহজ করেই বলেছি। স্মাগলিং নয়, কিডন্যাপিঙ।'

'তুমি বলতে চাইছ,' রবিনের কণ্ঠে উত্তেজনা, 'কোন বাচ্চা মেয়েকে কিডন্যাপ করে এনেছে টোডরা?'

'কিডন্যাপটা সম্ভবত জাহাজের লোকগুলো করেছে। মারিয়া ওটার নামও হতে পারে, মেয়েটার নামও হতে পারে। এনে তুলে দিয়েছে টোডদের হাতে। লুকিয়ে রাখার জন্যে। মেয়েটা যাতে শান্ত থাকে, সে জন্যে আগেই তার পুতুলগুলো এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কাপড়-চোপড়ও দরকার, সে জন্যে ওগুলো এনেছে।'

'খাইছে! তার মানে টোডের হাতের বান্ডিলটা মানুষ!'

'হ্যাঁ। আমার অনুমান ঠিক হলে, ছোট্ট মেয়েটা। তাকে বের করে আনতে হবে আমাদের।'

অনেক ঘুমিয়ে ঘুম পাতলা হয়ে গেছে টেরির। কথাবার্তায় জেগে গেল। কিশোরের শেষ কথাটা কানে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে বের করে আনবে?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই।'

'ধাড়ি বেঙগুলো নিশ্চয় পাহারায় থাকবে,' মুসা বলল। 'আনব কি করে?'

'একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই।'

রাত এখনও অনেক বাকি। আর কিছু করার নেই। রাফির ওপর টেরিকে পাহারা দেয়ার ভার দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা ও জিনা। কয়েক মিনিট জেগে জেগে মা-বাবার কথা ভাবল টেরি। ভীষণ কান্না পেতে লাগল তার। শেষে কাঁদতেই শুরু করল, নীরবে। রাফির ভয়ে জোরে কাঁদার সাহস পেল না।

চোদ্দ

পরদিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের। দড়ি বেয়ে উঠে এল ফোকরের বাইরে। সময়মতই বেরিয়েছে। দেখল, সিঁড়ির গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসছে দুই টোড। ঝোপের আড়ালে আড়ালে ওদের কাছাকাছি চলে গেল

সে, কি বলে শোনার জন্যে।

টেরির জন্যে অস্থির হয়ে আছে দু-জনে।

মিসেস বলল, 'ও পাতালঘরে নেই, কতবার বলব! খোঁজা কি আর বাকি রেখেছি?'

'অনেক ঘর অনেক গলিঘুপচি আছে ওর মধ্যে,' উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তায় অনেক বেশি খসখসে হয়ে গেছে টোডের কণ্ঠ। 'বাকি থাকলেও জানছি কি করে?'

'যে ভাবে চিৎকার করে ডেকেছি, তার কানে শব্দ যেতই।'

'না-ও যেতে পারে। মাটির নিচের এসব ঘরগুলো ভয়ানক...'

'তোমার মাথায় গোবর ভরা আছে, মিস্টার টোড!' রেগে গেল মিসেস। 'আমি বলছি ও এ দ্বীপে নেই। ওকে গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কারা নিল?'

'যারা জিনিসগুলো নিয়ে গেছে। গরু-ছাগলের ডাক ডেকে ভয় দেখিয়েছে। নৌকায় তুলে ওরাই নিয়ে গেছে আমার টেরিকে...'

'নৌকাটা তাহলে কোথায় ছিল?'

'সেটা আমি কি জানি? ছিল নিশ্চয় কোথাও। লুকিয়ে রেখেছিল। পুরো দ্বীপের কোথায় কি আছে না আছে সব কি আমরা জানি নাকি?'

'কি করতে বলছ তাহলে?'

'গাঁয়ে গিয়ে খুঁজতে হবে। ভয় লাগছে আমার, জন। টেরির যদি কিছু হয়ে যায় আমি বাঁচব না...'

তেতো হয়ে গেল কিশোরের মন। নিজের ছেলেকে যখন খুঁজে পাচ্ছে না, তখন কান্নাকাটি শুরু করেছে। যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে ওরা, তার মায়ের কি অবস্থা, মা হয়েও একবার ভাবেনি।

'এখুনি চলো,' তাগাদা দিল মিসেস।

'ডারবিকে কি করব?'

'এখানেই থাকবে। মেয়েটাকে পাহারা দিক।'

'অন্ধকারে একা থাকবে মেয়েটা, ভয় পাবে না?'

'ডারবি তো থাকছেই, ভয় কিসের? চলো, চলো, দেরি করলে কি হয়ে যায় কে জানে!'

কি মহিলারে বাবা!—ভাবছে কিশোর। ছোট্ট একটা মেয়েকে অন্ধকার পাতালঘরে রেখে যেতে এতটুকু মন কাঁপছে না! তবে একদিক থেকে ভালই হবে। ওরা চলে গেলে নির্বিবাদে গিয়ে মেয়েটাকে বের করে আনা যাবে, ঝামেলা হবে না।

কুকুরটাকে রেখে চলে গেল টোডেরা।

দু-পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যেতে দেখল ডারবি। তারপর দৌড়ে ফিরে গেল চত্বরে, অলস ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। দিনের আলোয় রোদের মধ্যে থেকেও ভারি অস্বস্তি বোধ করছে কুকুরটা। কান খাড়া,

সারাক্ষণ তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। আজব এই দ্বীপটাকে মোটেও পছন্দ করতে পারছে না সে।

তাড়াতাড়ি এসে গুহায় ঢুকল কিশোর। বলল, 'বাইরে এসো সবাই। জরুরী কথা আছে। টেরি, তুমি বসে থাকো। এগুলো আমাদের কথা, তোমার শোনার দরকার নেই।'

টেরির পাহারায় রইল রাফি। অন্যেরা কিশোরের সঙ্গে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল।

'শোনো,' বলল কিশোর, 'টোডেরা নৌকায় করে গাঁয়ে চলে গেছে টেরিকে খুঁজতে। বাচ্চা মেয়েটাকে রেখে গেছে পাতালঘরে, ডার্টির পাহারায়। মিসেস টোড সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। তার ধারণা, কেউ তার সোনামানিককে ধরে নিয়ে চলে গেছে, তার দুধের শিশুটা ভয়েই আধমরা হয়ে এখন তার জন্যে কান্নাকাটি করছে।'

'আহারে!' জিভ দিয়ে চুকচুক করল মুসা।

'শয়তান মেয়েমানুষ!' ফুঁসে উঠল জিনা। 'ছোট্ট মেয়েটাকে যে ধরে এনেছে, কষ্ট পাচ্ছে অন্ধকার পাতালঘরে বসে, সেটা একবার ভাবেনি! ওটা মহিলা না, ডাইনী!'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা কাত করল কিশোর। 'আমার প্ল্যান শোনো। এখুনি গিয়ে মেয়েটাকে বের করে আনব। তারপর গুহায় ফিরে নাস্তা সেরে নৌকায় করে তাকে নিয়ে যাব থানায়। পুলিশই তার বাবা-মাকে খুঁজে বের করবে।'

'টেরিকে কি করব?' জানতে চাইল রবিন।

'টেরিকে!' একেবারে তিন গোয়েন্দার মনের কথাটা বলে ফেলল জিনা, 'ওকে রেখে যাব পাতালঘরে। মেয়েটার জায়গায়। ফিরে এসে তার জায়গায় ছেলেকে দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে ধাড়ি বেঙগুলোর।'

'টেরির একটা ঠ্যাং-ঠুং ভেঙে দেব নাকি?' পরামর্শ চাইল মুসা, 'যাতে সারাজীবন খুঁড়িয়ে চলতে হয়...'

'না না,' হাত নাড়ল কিশোর, 'ওসব ভাঙাভাঙির মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। এমনিতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাবে, দেখোই না খালি। এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

গুহায় ঢুকে টেরিকে বলল কিশোর, 'এই, এসো আমাদের সঙ্গে। রাফি, তুইও যাবি।'

সন্দেহ ফুটল টেরির চোখে, 'কোথায়?'

'চমৎকার একটা জায়গায়, যেখানে এখানকার চেয়ে আরাম অনেক বেশি। মহাআনন্দে থাকতে পারবে। এসো।'

'সেখানে গরুগুলোও তোমাকে কামড়াতে পারবে না,' হেসে বলল মুসা। 'নাও, ওঠো।'

'আমি যাব না।'

'রাফি, ওঠো তো,' আদেশ দিল কিশোর।

গরগর করতে করতে এগিয়ে এল রাফি। নাক ঠেকাতে গেল টেরির পায়ে।

একলাফে উঠে দাঁড়াল সে।

দড়ি বেয়ে আগে আগে উঠে গেল মুসা ও জিনা। টেরিকে উঠতে বলল কিশোর। কিন্তু ভয়ে উঠতে চাইল না সে। আবার এগিয়ে এল রাফি। খাউ করে পায়ে কামড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল। লাফিয়ে উঠে দড়ি ধরে ফেলল টেরি। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চলে গেল রাফির নাগালের বাইরে। তারপর চুপচাপ ঝুলে থেকে চেঁচাতে থাকল। বাধ্য হয়ে ওপর থেকে টেনে তাকে তুলে নিতে হলো মুসা ও জিনাকে।

রবিন আর কিশোরও উঠল।

'জলদি করো,' তাগাদা দিল কিশোর। 'ওরা ফিরে আসার আগেই কাজ সারতে হবে।'

ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে প্রায় দৌড়ে এগোল ওরা। রাফি উঠে আসতে লাগল ঢাল বেয়ে। সবাই এসে দাঁড়াল দুর্গের চত্বরে।

ওদেরকে সিঁড়ির দিকে এগোতে দেখে ভয় পেয়ে গেল টেরি, 'আমি নিচে নামব না!'

'কেন, এত কিসের ভয়?' তার মুখের সামনে হাত নেড়ে বলল মুসা, 'গরুর? কিন্তু গরু তো বেঙাচি খায় না।'

উদ্বিগ্ন হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে টেরি, 'আমার বাবা-মা কোথায়?'

'আছে, আছে, ভয় নেই। বাজারে গেছে তোমার জন্যে দুধের বোতল আনতে। চলে আসবে।'

হেসে উঠল অন্য তিনজন। টেরির চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এমন বিপদে আর পড়েনি।

গর্তের মুখের ঢাকনাটা চাপা দিয়ে গেছে টোডেরা। তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে বড় বড় পাথর।

'তোমার বাবা-মা কত্তবড় শয়তান, দেখো,' জিনা বলল। 'ছোট্ট একটা মেয়েকে অন্ধকার ঘরে তো রেখেই গেছে, তার ওপর গর্তের মুখও বন্ধ করে গেছে, যাতে কোনমতেই বেরোতে না পারে। তোমার বিপদের জন্যেও ওরাই দায়ী, আর কাউকে দোষ দিতে পারবে না।'

'এটাকে দিয়েই পাথরগুলো সরানো যাক,' টেরিকে দেখিয়ে প্রস্তাব দিল মুসা। 'বাবা-মায়ের কাজ ছেলেরাই তো করে দেয়...'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'ও করে দেবে, আর লোক পেলে না। ও তো জানে খালি খাওয়া আর শয়তানি, অকাজের ধাড়ি। সময় নেই, এসো, হাত লাগাও সবাই।'

পাথর সরানোর কাজে সাহায্য করতে টেরিকেও বাধ্য করল রাফি।

সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে কিশোর, এই সময় একটা ঝোপের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল টেরি, 'ওই যে, ডারবি!'

রাফির ভয়ে গিয়ে ওখানে ঢুকেছে নোংরা কুকুরটা। টেরিকে দেখে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। একবার মুখ বের করছে, আবার ঢুকে পড়ছে।

'যেমন মনিব, তার তেমন কুকুর, হুঁহ্!' তীব্র ঘৃণা জিনার কণ্ঠে। 'এই রাফি, ছেড়ে দে। ওটাকে কামড়ে মজা পাবি না। নিজের শরীরই দুর্গন্ধ করবি।'

কিন্তু রাফি জানে, জিনা ভুল বলেছে, কামড়ে খুব মজা পাবে সে। বাধা দেয়ার কেউ নেই এখন, সহজেই কেটে নিতে পারে কুকুরটার একটা কান। মাঝে মাঝে জিনার এসব নির্দেশের কারণ বুঝতে পারে না সে। শত্রু কুকুরকে কামড়াতে মানা করে, খরগোশ তাড়া করতে দেয় না···এসব সময় মনে হয়, তার কুকুর-জন্মই বৃথা। মুখটাকে করুণ করে ফেলল সে।

কিন্তু তার অভিমান দেখার সময় নেই এখন জিনার। তাড়াহুড়ো করে অন্যদের সঙ্গে পাতালঘরে নেমে যেতে লাগল। দেয়ালে যে চকের চিহ্ন দিয়ে রেখেছে কিশোর, তা দেখে সহজেই এগোতে পারছে ওরা।

যে ঘরে রাত কাটায় টোডরা সেটার সামনে এসে দাঁড়াল দলটা। দরজা লাগানো। বাইরে থেকে খিল তুলে দেয়া। ভেতরে কোন শব্দ নেই। দরজার গায়ে নখের আঁচড় দিতে দিতে মৃদু গোঁ গোঁ করতে লাগল রাফি। বুঝে গেছে, ভেতরে মানুষ আছে।

চিৎকার করে কিশোর বলল, 'কেউ আছ ভেতরে? আমরা তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

খসখস শব্দ হলো। উঠে দাঁড়াল যেন কেউ। দৌড়ে এল দরজার দিকে। জবাব দিল একটা ছোট্ট কণ্ঠ, 'কে তোমরা! আমাকে বের করে নিয়ে যাও! আমার খুব ভয় লাগছে!'

কথা শেষ হওয়ার আগেই খিল খুলতে শুরু করেছে কিশোর। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। ভেতরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সেই আলোয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ছোট্ট মেয়েটাকে। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। বড় বড় বাদামী চোখে আতঙ্ক। কাঁদছিল, গালে পানির দাগ, তাতে ময়লা লেগে কালচে হয়ে আছে।

সোজা গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল মুসা। হেসে বলল, 'আর ভয় নেই, আমরা এসে গেছি। কেউ আর কিচ্ছু করতে পারবে না তোমার।'

'আমি মা'র কাছে যাব!' ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। 'আমাকে এখানে রেখেছে কেন? এখানে আমার ভাল লাগে না!'

'তা তো লাগবেই না। এমন জায়গায় কি কারও ভাল লাগে?' কোমল গলায় বলল কিশোর। 'তোমার মা'র কাছেই নিয়ে যাব আমরা। আগে চলো আমাদের গুহায়। নাস্তা খাবে। তারপর নৌকায় করে চলে যাব আমরা।'

'তোমাদের সঙ্গে যাব আমি,' চোখ ডলতে ডলতে বলল মেয়েটা। 'তোমরা খুব ভাল। তোমাদেরকে আমার ভাল লাগছে। অন্য মানুষগুলোর

মত খারাপ না তোমরা। ওদেরকে আমার ভাল লাগে না।'

'ওদেরকে কারোরই ভাল লাগে না,' রবিন বলল।

রাফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল জিনা, 'দেখো, ও হলো রাফি, আমাদের কুকুর। ও তোমার বন্ধু হতে চায়।'

শরীর মুচড়ে মুসার কোল থেকে নেমে গেল মেয়েটা। রাফির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'খুব ভাল কুকুর, লক্ষ্মী কুকুর ও। কুকুর আমার খুব ভাল লাগে। আমারও আছে একটা।'

গাল চেটে মেয়েটার মুখের পানি মুছিয়ে দিল রাফি।

'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ডরোথি হুবার্টসন। মা ডাকে, ডল।'

'ডলই তুমি, এক্কেবারে পুতুল।' আদর করে ওর গাল টিপে দিল জিনা।

'তুমিও খুব ভাল ছেলে।'

হাসল জিনা। 'আমি ছেলে নই, মেয়ে, তোমার মতই।'

'তাহলে ওরকম ছেলেদের মত কাপড় পরে আছ কেন?'

'পরে থাকতে আমার ভাল লাগে।'

'দাঁড়াও, আমিও পরব ওরকম। বাড়ি গিয়ে মাকে বলব এই কাপড় দিতে। তোমরা কে?'

এক এক করে নিজেদের পরিচয় দিল গোয়েন্দারা।

'ও কে?' টেরিকে দেখাল ডল।

'ও? বেঙাচি,' মুসা বলল। 'ও আমাদের কেউ নয়। ওর বাবা-মাই তোমাকে এনে আটকে রেখেছে এখানে। তোমার জায়গায় এখন ওকে রেখে যাব আমরা। ওর বাবা-মার জন্যে একটা সারপ্রাইজ।'

পাতালঘরে একা থাকার কথা শুনেই চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে শুরু করল টেরি। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসার সঙ্গে কি আর পারে। একটানে তাকে ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'তোমাদের মত শয়তানদের এই শাস্তিও খুব কম হয়ে গেল। তবু যা হোক, তোমার বাবা-মার ছোট্ট একটা শিক্ষা অন্তত হবে। অন্যের বাচ্চাকে ধরে এনে আটকে রাখলে তাদের কেমন লাগে, বুঝতে পারবে। থাকো এখানে। একা থাকতে ডলের কেমন লেগেছিল, বুঝিয়ে বোলো বাবা-মাকে। চলি। গুড-বাই।'

অন্যেরা আগেই বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে এসে দরজা লাগিয়ে দিল মুসা।

পাল্লার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল টেরি। কিল মেরে মেরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল, 'দোহাই তোমাদের, আমাকে বের করো! ভূতে খেয়ে ফেলবে আমাকে!'

'ভূতের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমাকে খেতে আসে! আর যদি তোমার মত কোন ছ্যাঁচড়া ভূত চলেই আসে, পচা পচা ছড়া শুনিয়ে দেবে। তোমার ওই জঘন্য ছড়া ভূতেরাও সইতে পারবে না।'

'গরুগুলো আসবে...'

'না, আসবে না। মানা করে দেব।'

'খিদেয় মারা যাব।'

'দু-একদিন না খেয়ে থাকলে মানুষ মরে না। চলি। যত খুশি চিল্লাও ওখানে বসে।'

ফিরে চলল ওরা।

চিৎকার করে কাঁদতে লাগল টেরি।

'লজ্জাও নেই!' জিনা বলল, 'ঘেন্না লাগে এসব ছেলেকে দেখলে! এত্তবড় ছেলে, বাচ্চাদের মত কাঁদে, দেখো!'

'জলদি চলো,' এতক্ষণে খিদে টের পাচ্ছে মুসা, 'আমার পেট জ্বলে গেল খিদেয়।'

'আমারও খিদে পেয়েছে,' মুসার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল ডল। 'ঘরটাতে যখন ছিলাম, তখন পায়নি। এখন খেতে ইচ্ছে করছে। তোমরা খুব ভাল, আমাকে বের করে এনেছ।'

'তোমাকে বের করে বেঙাচিটাকে যে রেখে আসতে পেরেছি, এতে আমরাও খুশি।'

'যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর,' রবিন বলল। 'পাতালঘরে এসে ছেলেকে দেখলে আক্কেল হবে টোডদের।'

'যদি আক্কেল থাকে,' জিনা বলল।

অনেক গলি-ঘুপচি আর ঘর পেরিয়ে অবশেষে সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে এল ওরা।

উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে যেন হাঁ করে আলো-বাতাস গিলতে লাগল ডল। 'ওহ্, কি সুন্দর, কি সুন্দর! কোথায় আনা হয়েছে আমাকে?'

'একটা দ্বীপে,' জবাব দিল জিনা, 'আমাদের দ্বীপ। এই যে ভাঙা দুর্গটা, এটাও আমাদের। কাল রাতে একটা নৌকায় করে তোমাকে এখানে আনা হয়েছিল। তোমার চিৎকার শুনতে পেয়েছি আমরা। তাতেই বুঝেছি, তোমাকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে।'

একের পর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে যেন ডলের জন্যে। ফোকর দিয়ে ঢুকে দড়ি বেয়ে গুহায় নেমে তাজ্জব হয়ে গেল।

কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন, 'সাহস আছে মেয়েটার! দেখলে, কেমন দড়ি বেয়ে নেমে পড়ল। ইকটু বাধাও দিল না। ভয় পেল না!'

মুসা বলল, 'জিনার বোন হলে ভাল মানাত। এক্কেবারে এক চরিত্র মনে হচ্ছে।'

'জিনা' নামটা কানে গেল জিনার। ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা কি বলছ?'

'না, কিছু না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, 'তোমাকে কিছু বলছি না!'

পনেরো

ট্রাংকটার দিকে চোখ পড়ল ডলের। দেখল, পুতুলগুলো পড়ে আছে মাটিতে। চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার পুতুল! কোথায় পেলে তোমরা? ইস্, কত কেঁদেছি ওগুলোর জন্যে।' ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'আমার টিনা, আমার রুবি, আমার শেলি...তোমরাও কেঁদেছ, না?...পিটার দুষ্টুটাও আছে দেখি,' খেলনা ভালুকটাকে আদর করল সে। 'এ কি! জেনির পেট কে কাটল! হায় হায়!'

কাটা পুতুলটাকে তুলে নিল ডল।

প্রমাদ গুণল কিশোর। এমন জানলে কি আর ফেলে রাখে ওখানে। তাড়াতাড়ি ডলের পাশে এসে বুঝিয়ে বলল, 'আমিই কেটেছি। ওকে না কাটলে তোমাকে বের করে আনা যেত না...'

'কেন, যেত না কেন?'

'ওকে কেটে সূত্র বের করার চেষ্টা করেছি আমরা।'

'সূত্র তো বের করে গোয়েন্দারা। মা বলেছে আমাকে।'

'আমরা গোয়েন্দা।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডলের। জেনির শোক ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা গোয়েন্দা! কি মজা! তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হলো। ইস্কুলের সবাইকে গিয়ে বলতে পারব।...আমার খিদে পেয়েছে। খাবার দাও।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর। 'দাঁড়াও, এখনই দিচ্ছি।'

খাবারের টিন কাটতে বসল রবিন। একটিন স্যামন, দুই টিন পিচ, একটিন দুধ কেটে রেখে, বড় একটা রুটি টেনে নিয়ে স্লাইস করল। মাখন মাখাল। বড় এক জগ কোকা গুলল।

খেতে বসল সবাই। গপ গপ করে গিলতে লাগল ডল। আস্তে আস্তে গালের ফ্যাকাসে ভাব কেটে গিয়ে গোলাপী হয়ে উঠল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ডল, এখানে কি করে এলে তুমি, বলতে পারবে?'

'আমার নার্সের সঙ্গে বাগানে খেলছিলাম আমি। আমার দুধ আনতে ঘরে গেল নার্স। হঠাৎ একটা লোক দেয়াল টপকে ঢুকে, আমার গায়ে একটা কম্বল ফেলে দিল। সেটা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে সাগরের ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সাগর আমি চিনি। ছুটির দিনে আব্বা সৈকতে নিয়ে যায় আমাকে। আমার গা থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলল লোকটা। তারপর একটা বোটে তুলল। একটা ঘরে বন্ধ করে রাখল দু-দিন। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। কত কাঁদলাম, কেউ শুনল না।'

'লোকটাকে তুমি চেনো?'

'না। আগে কখনও দেখিনি। এখানে আনার পর মহিলাটাকে চিনলাম। আমাদের বাড়িতে রান্না করত। মিসেস টোড। খুব খারাপ। আমার কোন কথাই শুনল না। আমাকে বের করে বাড়িতে নিয়ে যেতে বললাম। ধমক মারল। মারবে বলেও ভয় দেখাল।'

'হুঁ, তাহলে এই ব্যাপার! আসল কিডন্যাপার তাহলে অন্য লোক, যার একটা বোট আছে। তোমাকে কিডন্যাপ করতে তাকে সাহায্য করেছে টোডেরা। তোমাকে ওদের কাছে তুলে দিয়েছে লোকটা, এখানে এনে লুকিয়ে রাখার জন্যে।'

'তারমানে,' রবিন বলল, 'সেদিন যে দ্বীপে ধোঁয়া উঠতে দেখেছিলাম, ওই লোকই নেমেছিল এখানে। জায়গাটা দেখেছে। এখানে ডলকে লুকিয়ে রাখা যাবে কিনা বুঝতে চেয়েছে। শলা-পরামর্শ করেছে টোডের সঙ্গে।'

'ধরতে পারলে ওকে আমি দ্বীপে নামা বার করব!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল জিনা।

নাস্তা শেষ হলো।

কিশোর বলল, 'ডলকে থানায় নিয়ে যেতে হবে। পত্রিকাগুলো নিশ্চয় ওকে নিয়ে খবর ছেপে গরম করে ফেলেছে। পুলিশ দেখলেই চিনতে পারবে।'

'কিন্তু ডলকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শুনলেই তো পালাবে টোডেরা। একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে,' রবিন বলল। 'ওদের ধরা দরকার।'

'দেখি, বুদ্ধি একটা বের করেই ফেলব।'

'চলো তাহলে,' মুসা বলল। 'দেরি করে লাভ কি?'

'এখানে আমার খুব ভাল লাগছে,' ডল বলল। 'গুহাটা খুব সুন্দর। আমার থাকতে ইচ্ছে করছে। আমাকে রেখে তোমরা আবার এখানে আসবে?'

হাসল জিনা। 'আসব। কেন?'

'আমিও আসব তোমাদের সঙ্গে।' উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। 'কোনদিন গুহায় থাকিনি তো, থাকতে ইচ্ছে করছে। কি সুন্দর গুহা, দ্বীপ, রাফির মত ভাল কুকুর···জিনাআপু, আমি তোমার মত প্যান্ট-শার্ট পরে আসব।'

'লও ঠ্যালা!' চট করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

মুচকি হাসল তিন গোয়েন্দা।

'কিন্তু তোমার আব্বা-আম্মা তো তোমাকে আসতে দেবে না,' জিনা বলল। 'তবু, বলে দেখতে পারো। তুমি এলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বরং মজাই হবে। তুমি খুব ভাল মেয়ে।'

'রতনে রতন চেনে,' ফস করে বলে ফেলেই জিভ কামড়াল মুসা।

ভুরু কোঁচকাল জিনা, 'কি বললে?'

'না, কিছু না,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

জিনা রেগে গেলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলা যায় না। তাড়াতাড়ি রবিন বলল, 'বসে আছি কেন আমরা এখনও, যেতে হবে না...'

খাঁড়ির গুহা থেকে নৌকাটা বের করা হলো। সেটা দেখে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল ডল। বার বার বলতে লাগল, যে ভাবেই হোক, এই দ্বীপে সে ফিরে আসবেই।

নৌকায় উঠল সবাই। দাঁড় তুলে নিল মুসা ও জিনা।

অবাক হয়ে ডল বলল, 'জিনাআপু, তুমি নৌকাও চালাতে পারো! দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে দাঁড় বাওয়া শিখব।'

ঘাটের কাছেই দেখা হয়ে গেল জেলের ছেলে ফগের সঙ্গে। জিনার নৌকাটা দেখে দৌড়ে এসে ওটা তীরে টেনে তুলতে সাহায্য করল।

'আমি এখনই রওনা হতাম,' বলল সে। 'দ্বীপে যেতাম, তোমাদের খবর দেয়ার জন্যে। মাস্টার জর্জ, তোমার আব্বা চলে এসেছেন। কাল রাতে। তোমার আম্মা আসেননি। তবে তাঁর শরীর এখন অনেক ভাল, তোমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ছয়-সাতদিনের মধ্যেই বাড়ি চলে আসবেন।'

'আব্বা এসেছে কেন?' জানতে চাইল জিনা।

'আসবেন না? তোমাদের কাছে টেলিফোন করেন, কেউ ধরে না। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আমার কাছে তোমাদের খবর জানতে এসেছিলেন। আমি বলিনি। কি রাগা যে রেগেছেন তোমাদের ওপর। বাড়ি ফিরে দেখেন, জিনিসপত্র সব তছনছ। তোমরা নেই, টোডেরা নেই। এখন গেছেন থানায়, রিপোর্ট করতে।'

'ভাল হয়েছে, ওখানেই দেখা হবে আমাদের সঙ্গে। আমার কথায় কান না দিয়ে মিসেস টোডকে বিশ্বাস করার ফল তো পেল। আক্কেল হয়েছে।'

ডলকে জিনাদের সঙ্গে দেখে খুব অবাক হয়েছে ফগ। বার বার তার দিকে তাকাতে লাগল।

জিনা বলল, 'সব তোমাকে বলব, ফগ। এখন সময় নেই। আমরাও থানায় যাচ্ছি।'

সারি দিয়ে থানার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল গোয়েন্দাদের বিচিত্র দলটা। গেটে ডিউটিরত সেন্ট্রি ওদের চেনে। ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'কি ব্যাপার, জিনা? তোমার আব্বা এল একটু আগে, তুমিও...'

জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'আব্বা কোথায়?'

'শেরিফের রুমে।'

আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না জিনা। সোজা এসে ঢুকল শেরিফের ঘরে।

দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকালেন মিস্টার পারকার। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'এসেছ, না! ছিলে কোথায়? বাড়িঘর সব খালি ফেলে...ডাকাতি

করে তো সব নিয়ে গেছে…'

'করেছে তো তোমার সেই অতি বিশ্বাসী বেঙের দল…'

'কার দল!'

'বেঙ, বেঙ!' বাবার ওপর প্রচণ্ড অভিমানে খেপে আছে জিনা। 'টোড মানে যে বেঙ, ভুলে গেছ!…জাহান্নামে যাক ঘরবাড়ি! আম্মা কেমন আছে, বলো!'

'ভাল। আগের চেয়ে অনেক ভাল,' জিনাকে রেগে উঠতে দেখে শান্ত হয়ে গেলেন মিস্টার পারকার। জিনা যেমন তাঁকে ভয় পায়, তিনিও তাকে ভয় পান। ও রেগে গেলে ওর মা ছাড়া আর কেউ ঠাণ্ডা করতে পারবে না, জানেন। ঝামেলার মধ্যে গেলেন না। বসে পড়লেন আবার। 'তোমার মা-ই তো আমাকে পাগল করে দিল। আসতে বাধ্য করল। খালি এককথা, ছেলেমেয়েগুলো কেমন আছে, কি খাচ্ছে না খাচ্ছে…আমি এদিকে ফোন করে জবাব পাই না। তাকে কি জবাব দেব? মিথ্যেই বলতে হলো, ভাল আছ। কিন্তু কত আর মিথ্যে বলা যায়! শেষে দেখতে এলাম। এসে তো দেখি এই অবস্থা। ছিলে কোথায়?'

'দ্বীপে। কিশোরের মুখেই সব শোনো।'

বাপ-মেয়ের এই ঝগড়া খুব উপভোগ করেন শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান। জিনার বাবার বন্ধু তিনি, বাড়িতে যাতায়াত আছে। মুচকি মুচকি হাসছেন।

পাল্লা আবার ঠেলে খুলে ডাক দিল জিনা, 'কিশোর, এসো।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে ডলের হাত ধরে ঘরে ঢুকল গোয়েন্দাপ্রধান। পেছনে তার দলবল।

ডলকে দেখে হাঁ হয়ে গেলেন শেরিফ। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'একে কোথায় পেলে! এই খুকি, তুমি ডরোথি না?'

'ডরোথি হুবার্টসন,' জবাব দিল সে। 'আম্মা ডাকে ডল।'

'খোদা! পুরো এলাকা চষে ফেলেছে পুলিশ, হন্যে হয়ে খুঁজছে একে, আর ও নিজেই এসে হাজির!'

'কি বলছ, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছেন মিস্টার পারকার। 'কেন খুঁজছ?'

'খবরের কাগজ পড়ো না নাকি…'

'না, ক'দিন ধরে পড়তে পারছি না…জিনার মাকে নিয়েই ব্যস্ত…'

'এ জন্যেই জানো না। কোটিপতি হুবার্টসনের মেয়ে ও। সাংঘাতিক প্রভাবশালী লোক। গরম করে ফেলেছে সব। ধমক দিয়ে দিয়ে অস্থির করে ফেলেছে আমাদের। মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নোট পাঠিয়েছে, দশ লক্ষ ডলার দিলে ফিরিয়ে দেয়া হবে।…কিশোর, তোমরা একে পেলে কোথায়?'

'জিনার দ্বীপে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

ছেলেমেয়েদের বসতে বললেন শেরিফ। একজন সহকারীকে ডাকলেন নোট নেয়ার জন্যে।

গোড়া থেকে সমস্ত কাহিনী বলে গেল কিশোর। কিছুই বাদ না দিয়ে। লিখে নিল শেরিফের সহকারী।

শুনতে শুনতে এমন অবস্থা হলো মিস্টার পারকারের, কোটর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে চোখ।

শেরিফ জিজ্ঞেস করলেন, 'যে বোটটা দিয়ে আনা হয়েছে ডলকে, সেটার ক্যাপ্টেনের নাম কি?'

'বলতে পারব না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'টেরি কেবল বলেছে, তার মাকে নাকি মারিয়া নামটা বলতে শুনেছে।'

'মারিয়া! ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিলেন শেরিফ। 'পুলিশের খাতায় নাম আছে ওটার, বদনাম। ক্যাপ্টেনের নাম হিউগো ব্রোকার, মারিয়া তার বোটের নাম। ডাকাতির দায়ে জেল খেটেছে বহুবছর হিউগো। বেরিয়েই আবার শুরু করেছে। টোডদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে। ক'দিন ধরে এদিকের সাগরে তার বোটটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, রিপোর্ট পেয়েছি। কিডন্যাপের খবরটা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, তার কাজ হতে পারে। হলোও তাই।'

'ওকে ধরা দরকার,' কিশোর বলল। 'টোডদেরকেও।'

'বোটটা আটকানো কোন ব্যাপারই না। এখনই অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি আমি। টোডরাও পালাতে পারবে না। কিন্তু ওরা তো সব অস্বীকার করবে। প্রমাণ করব কি করে এই কিডন্যাপিঙে ওরা জড়িত?'

'আমরা সাক্ষি দেব। তবে স্বীকারোক্তির সহজ একটা পথ আমি বাতলে দিতে পারি...'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন শেরিফ, 'কি ভাবে?'

'চমকে দিয়ে। ওদের ছেলেকে পাতালঘরে আটকে রেখে এসেছি আমরা। সেই খবরটা কোনভাবে ওদের কানে তুলে দিতে হবে। ওরা তখন ছেলেকে বের করে আনতে পাতালঘরে নামবে। ডলকে যে নিয়ে এসেছি আমরা, সেটা ওদেরকে জানানো হবে না। ওখানে ছেলেকে দেখে, ভীষণ চমকে যাবে ওরা। ডল কোথায় জিজ্ঞেস করবে। কাছেই লুকিয়ে থাকবে পুলিশ। আড়াল থেকে সব শুনবে। পুলিশ অফিসারের সাক্ষি নিশ্চয় আদালত গ্রহণ করবে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। হাসি ফুটল মুখে। ধীরে ধীরে চওড়া হলো হাসিটা। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলেন তাঁর সহকারীকে।

পুলিশকে সহায়তা করার জন্যে বার বার ছেলেমেয়েদের ধন্যবাদ দিলেন তিনি। হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে, ডলের বাবাকে খবর জানানোর জন্যে।

জিনার দিকে তাকিয়ে মিস্টার পারকার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি বাড়ি ফিরে যাবে?'

'গিয়ে আর কি করব এখন? কাজের মানুষ নেই, কিছু নেই…'

'আইলিনকে খবর পাঠিয়েছি। ও আজই চলে আসবে।'

'আম্মা না আসা পর্যন্ত আমরা দ্বীপেই থাকতে চাই, আব্বা। আম্মার ঘর খালি দেখলে ভাল লাগে না আমার। আইলিন যখন আসছে আর তো কোন চিন্তা নাই। ঘরদোর সে-ই দেখেশুনে রাখবে।'

রাজি হয়ে গেলেন পারকার, 'বেশ। তবে তোমার আম্মা আসার পর আর একদিনও দেরি করতে পারবে না।'

'দেরি করব মানে! তাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে আছি আমি।'

'খবর পাবে কি করে?'

হাসল জিনা। 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আম্মা আসার সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে যাবে আমার কাছে।'

পারকারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন শেরিফ। 'গোয়েন্দাগিরি করে ওরা, ভুলে যাচ্ছ কেন, জনাথন। একআধজন স্পাই থাকবে না, এটা কি হয়?'

ষোলো

সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন মিস্টার পারকার। ডল ইচ্ছে করেই চলে এসেছে তাঁদের সঙ্গে। শেরিফকে অনুরোধ করে এসেছে, তার বাবা-মা এলে যেন গোবেল ভিলায় পাঠিয়ে দেন।

হাসিমুখে বাগানের গেট খুলে দিল আইলিন। জরুরী তলব পেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে। কি ব্যাপার, কিছুই জানতে চাইল না। সবাইকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আগে খেতে বসতে বলল, রান্না শেষ।

খুশিতে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করল ছেলেমেয়েদের। গোবেল বীচে আসার মজা এতদিনে আরম্ভ হয়েছে।

খেতে খেতে আইলিনকে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাল ওরা।

অবাক হলো না আইলিন। এরকম অ্যাডভেঞ্চার অনেক করেছে ওরা। এসব দেখতে দেখতে গা-সওয়া হয়ে গেছে তার।

হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ পড়ল রবিনের। মুখের কাছে থেমে গেল চামচ। পাতাবাহারের বেড়ার ওপাশে উঁকিঝুঁকি মারছে একজন লোক।

'এই, দেখো দেখো!'

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই মুসা বলে উঠল, 'খাইছে! বড়-বেঙটা এখানে কি করছে!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'তোমরা বসো এখানে। আমি আসছি।' ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বেড়ার কাছে এসে ডাক দিল, 'মিস্টার টোড, শুনুন। টেরিকে খুঁজছেন?'

চমকে গেল টোড। তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

'দুর্গের নিচে পাতালঘরে আছে ও,' জানাল কিশোর। 'গেলেই পাবেন।'

'তাকাও এদিকে! ওর কথা তুমি জানলে কি করে? ছিলে কোথায় এ ক'দিন? বাড়ি যাওনি?'

'ওসব আপনার জানার দরকার নেই। টেরিকে পেতে চাইলে দ্বীপে চলে যান। পাতালঘরে আটকা পড়ে কান্নাকাটি করছে বেচারা।'

চোখে চোখে তাকাল টোড। কিশোরের মনে কি আছে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

দৌড়ে ঘরে ফিরে এল কিশোর, থানায় ফোন করার জন্যে। সে নিশ্চিত, মিসেস টোডকে গাঁয়ের ভেতর কোথাও রেখে এসেছে টোড, টেরিকে খুঁজতে খুঁজতে নিজে চলে এসেছে এখানে। কিশোরদের এখানে দেখতে পাবে কল্পনাও করেনি। এখন গিয়ে মিসেসকে বলবে সব, যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যাবে দ্বীপে, টেরিকে বের করে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে।

খাওয়া শেষ করেই মিস্টার পারকার বললেন, হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন তিনি। খবর জানার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন জিনার আম্মা।

'তাকে বলব,' পারকার বললেন, 'দ্বীপে চলে গেছ তোমরা। খুব ভাল আছ। তবে তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা এখন বলা যাবে না, দুশ্চিন্তা করতে পারে। বাড়ি এলেই বলব সব।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

তখুনি দ্বীপে চলে যাবে কিনা, এ নিয়ে আলোচনা শুরু করল গোয়েন্দারা। যেতে কোন বাধা নেই, অসুবিধে হলো ডলকে নিয়ে। তাকে কি করবে বুঝতে পারছে না।

সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ওরা, এই সময় বিরাট একটা গাড়ি এসে থামল গেটের বাইরে। লাফ দিয়ে নামলেন লম্বা একজন ভদ্রলোক, সঙ্গে খুব সুন্দরী একজন মহিলা।

জিনা বলল, 'ডল, দেখো তোমার আব্বা-আম্মা বোধহয় এলেন।'

আদরের চোটে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হলো ডলের। জোর করেই শেষে বাবা-মা দু-জনের কাছ খেকে সরে এল।

তাঁদেরকে জানানো হলো সব। মিনিটে অন্তত বিশবার করে গোয়েন্দাদেরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন মিস্টার হুবার্টসন, তাতেও যেন মন ভরছে না, আরও বেশি করে দিতে চাইছেন।

'যে কোন একটা পুরস্কার চাও তোমরা,' বললেন তিনি। 'যা ইচ্ছে। কি খুশি যে হয়েছি আমি তোমাদের ওপর, বলে বোঝাতে পারব না।'

'আপনি যে খুশি হয়েছেন, এতেই আমরা খুশি,' কিশোর বলল, 'এটাই

আমাদের পুরস্কার। ডলকে শয়তানদের হাত থেকে বের করে আনতে পেরেছি, আর কি চাই।'

'কিন্তু আমার কাছ থেকে তোমাদের কিছু নিতেই হবে!'

কি যেন ভাবছে জিনা। তার গা ঘেঁষে বসে আছে ডল। বাবা-মায়ের অলক্ষ্যে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল জিনার পেটে।

'সত্যিই দিতে চান?' হঠাৎ প্রশ্ন করল জিনা।

'চাই! কি চাও, বলো?'

'দেবেন তো?'

'দেব।'

'বেশ, ডলকে কয়েক দিন আমাদের সঙ্গে দ্বীপে থাকতে দিন।'

থমকে গেলেন হুবার্টসন। 'বলো কি! কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল…এতদিন পর ফিরে পেলাম মেয়েকে, ছেড়ে দেব…না দেখে থাকব কি করে?'

'আব্বা, তুমি কথা দিয়েছ ওদেরকে, যা চায় দেবে।' ছুটে এসে বাবার হাত চেপে ধরল ডল, 'আব্বা, আমাকে থাকতে দাও! দ্বীপটা যে কি সুন্দর! আর গুহাটা, উফ্! দাও না, আব্বা! ওখানে যা একটা দুর্গ আছে না, মাটির নিচে ঘর…'

'রাফিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমরা,' সুপারিশ করল রবিন, 'কোন ভয় নেই। বড় বড় চোর-ডাকাতকেও ঘায়েল করে ফেলতে পারে সে। ডলের কিচ্ছু করতে পারবে না কেউ। কি রে রাফি, পাহারা দিয়ে রাখতে পারবি না?'

মাথা দোলাল রাফি। বলল, 'হাউ!'

অবশেষে রাজি হলেন হুবার্টসন, 'এক শর্তে দিতে পারি। কাল আমি আর তোমার আম্মা দ্বীপে যাব দেখতে, জায়গাটা সত্যি থাকার মত কিনা। দিনটা তোমাদের সঙ্গে কাটাব। আমাদেরকে উৎপাত মনে করা চলবে না।'

'করব না আব্বা, করব না!' খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল ডল। বাপের গা বেয়ে কোলে উঠে চপাৎ চপাৎ করে চুমু খেলো দুই গালে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা তো নিশ্চয় হোটেলে উঠবেন? ডল তাহলে আমাদের কাছেই থাক, নাকি?'

এতক্ষণে কথা বললেন ডলের আম্মা, 'সঙ্গে নিতে পারলেই খুশি হতাম। কিন্তু তোমাদের অখুশি করি কি করে। ঠিক আছে, থাক…' হাসলেন তিনি।

গোয়েন্দাদের আরও কয়েকবার ধন্যবাদ জানিয়ে, গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডলের আব্বা-আম্মা।

মিনিটখানেক পর দরজায় টোকা পড়ল।

খুলে দিল জিনা। দেখে, একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, 'একটু আগে নৌকা নিয়ে দ্বীপে রওনা হয়েছে টোডরা। আমিও যাব। দ্বীপে ঢোকার রাস্তা চিনি না, পথটাও নাকি ভাল না শুনেছি। মিস জর্জিনা, তুমি তো সবচেয়ে ভাল চেনো। এলে ভাল হত।'

'আমি মাস্টার জর্জ, নট মিস জর্জিনা,' গম্ভীর হয়ে বলল জিনা।

মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন পুলিশ অফিসার। সামলে নিয়ে বললেন, 'সরি, মাস্টার জর্জ। তো, আসবে?'

'খুশি হয়েই আসব। তবে একা নয়। আমার বন্ধুদেরও নিতে হবে।'

'কোন অসুবিধে নেই। এসো।'

জিনার বোটে করে চলল সে আর তার বন্ধুরা। অফিসারও চললেন সেটাতে করেই। পেছনে বেশ কিছুদূর থেকে ওদেরকে অনুসরণ করে এল পুলিশের বোট।

দ্বীপের একটা ধারে নৌকা নিয়ে এল জিনা, যেখান দিয়ে ডাঙায় উঠতে কষ্ট হয়, তবে ওঠা যায়। সহজ পথ গোপন সৈকতটা অফিসারকে চেনাল না। ওটা ওদের নিজস্ব বন্দর।

টোডরা নামল ভাঙা জাহাজটার কাছ দিয়ে ঘুরে গিয়ে, যেখানে ওরা নেমেছে এ ক'দিন। পুলিশকে দেখতে পেল না।

অফিসারকে নিয়ে নিঃশব্দে দুর্গের কাছে চলে এল গোয়েন্দারা।

সিঁড়িমুখে আগে নামল জিনা। টর্চ হাতে আগে আগে চলল। পেছনে পুরো দলটা। এখানকার গলিঘুপচি সবচেয়ে বেশি চেনে সে।

যে ঘরটায় আটকে রেখে গেছে টেরিকে, সেখানে এসে দেখল, দরজা বন্ধই আছে। খিল লাগানো।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'টোডরা এখনও আসেনি। লুকিয়ে পড়তে হবে।'

লুকানোর জায়গার অভাব নেই। প্রচুর থাম আছে, দেয়াল আছে।

রাফিকে চুপ থাকতে বলল জিনা।

কয়েক মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। কথা বলতে বলতে আসছে টোডরা।

'টেরিকে যদি ওখানে সত্যি আটকে রাখে,' মিসেস টোড বলছে, 'যে রেখেছে, তার কপালে খারাপি আছে! দেখে নেব আমি! কিন্তু আটকাল কে, বলো তো? মেয়েটাই বা তাহলে কোথায়? আমার কি মনে হয় জানো, বস্ আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। আমাদের যে দশ হাজার ডলার দেবে বলেছিল, দেবে না। বোটে যে তল্লাশি চালাবে পুলিশ, বুঝে গিয়েছিল। সে জন্যেই সরিয়ে ফেলেছিল মেয়েটাকে। পুলিশ দেখেটেখে সন্দেহমুক্ত হয়ে চলে গেছে। ও এসে চুরি করে নিয়ে গেছে মেয়েটাকে। মাঝখান থেকে আমার ছেলেটাকে আটকে রেখে গেছে। আমি বসকে ছাড়ব না!'

'কি করবে?' খসখসে গলায় বলল টোড, 'ওর সঙ্গে পারা যাবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, কিশোর ছেলেটা জানল কি করে টেরি কোথায় আছে? মাথায়ই কিছু ঢুকছে না আমার!'

ঘরে ঢুকল ওরা। বন্ধ দরজার দিকে এগোল। পায়ে পায়ে রয়েছে ডারবি। লুকিয়ে থাকা গোয়েন্দাদের গন্ধ পেয়ে মৃদু গোঁ গোঁ করে উঠল।

লাথি মেরে ওকে সরিয়ে দিল টোড। 'শয়তান কুত্তা, কাজের কাজ কিচ্ছু

নেই, খালি ভয়ে কোঁৎ-কোঁৎ করে!'

'বাবার গলা শুনেই ভেতর থেকে ককিয়ে উঠল টেরি, 'বাবা! এসেছ! জলদি খোলো! মরে গেলাম!'

পাল্লার ওপর গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মিসেস টোড। টান দিয়ে খুলে ফেলল খিল।

মাকে এসে জড়িয়ে ধরল টেরি। হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

'কে রেখে গেছে তোকে এখানে! জলদি বল! তোর বাবা ওদের গুলি করে মারবে! মারবে না, জন? ছোট্ট একটা দুধের শিশুকে এভাবে আটকে রেখে যায়, কোন শয়তান! মায়াদয়া নেই প্রাণে!'

থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন পুলিশ অফিসার। টর্চের আলো ফেললেন টোডের মুখে। এমন চমকান চমকাল দুই টোড, যেন ভূত দেখেছে।

'ঠিকই বলেছ, ডোরিয়া টোড,' ভারি গলায় বললেন তিনি, 'একটা দুধের শিশুকে এভাবে আটকে রেখে যাওয়াটা শয়তানের পক্ষেই সম্ভব, যাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র মায়াদয়া নেই। তোমরা সেই শয়তান, তাই না? ডলের মত একটা শিশুকে এনে আটকে রেখেছিলে, টাকার লোভে। তারপর তাকে একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলে। একবারও ভাবনি, বাচ্চাটা এরকম জায়গায় একা থাকবে কি করে।'

মাছের মত নিঃশব্দে মুখ হাঁ করে আবার বন্ধ করল মিসেস টোড। কথা আটকে গেছে।

ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মত চিঁ-চিঁ করে উঠল টোড, *'তাকাও এদিকে!'*

চার বছরের শিশুর মত কাঁদতে শুরু করল টেরি। এত্তবড় ছেলেকে এভাবে কাঁদতে দেখে ঘৃণায় আরেকবার মুখ বাঁকাল গোয়েন্দারা।

হঠাৎ ওদের ওপর চোখ পড়তেই হিসিয়ে উঠল মিসেস টোড, 'তোমরা! মেয়েটাও আছে দেখি! ও, তাহলে বসকে খামোকা দোষ দিয়েছি! সব শয়তানি তোমাদের! টেরিকে কে আটকেছিল, বলো, জলদি বলো!'

'থানায় চলো আগে,' ধমকের সুরে বললেন অফিসার, 'সব প্রশ্নের জবাব পাবে।' টোডের পিস্তলটা কেড়ে নিলেন তিনি।

আর কিছু করার নেই। বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে যেতে হলো টোডদের।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে টেরি। বুঝতে পারছে, তার মা আর বাবাকে জেলে দেয়া হবে। তাকে পাঠানো হবে হয়তো কোন কঠিন স্কুলে, যেখানকার নিয়ম-কানুন ভীষণ কড়া। কত বছর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না, জানে না। ওদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটা এক হিসেবে ভালই হবে ওর জন্যে, স্কুলে গেলে অন্তত মানুষ হওয়ার সুযোগ পাবে, কাছে থাকলে যেটা হত না। ক্রিমিন্যালই হত বাবা-মার মত।

বাইরে বেরিয়ে অফিসারকে বলল কিশোর, 'আমাদের আর সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই নিশ্চয়। টোডদের বোটে করেই চলে যেতে পারবেন।'

'কুত্তাটাকেও নিয়ে যান,' জিনা বলল। 'ওই নোংরা জানোয়ার আমার দ্বীপে রাখব না।'

টোডদের নৌকাতেই তোলা হলো ওদেরকে। বলতে হলো না, টেরিকে উঠতে দেখেই লাফিয়ে তাতে চড়ে বসল ডারবি। রাফির জ্বলন্ত দৃষ্টির কাছ থেকে দূরে যেতে পারলে বাঁচে সে।

পুলিশের বোটের সঙ্গে নৌকাটা বাঁধা হলো, টেনে নিয়ে যাবে।

ঠেলা দিয়ে নৌকাটা পানিতে নামিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।

হাত নেড়ে বিদায় জানাল মুসা, 'বিদায় জনাব বেঙ, জেলে গিয়ে আবার কোনও বাচ্চাকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করুন। বিদায় জনাবা বেঙনি, বেঙাচিকে কোলে বসিয়ে রাখবেন, যাতে আরও বেশি করে কাঁদতে পারে সে। বিদায় বেঙাচি, স্কুলে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করে ভাল ছেলে হওয়ার চেষ্টা কোরো। বিদায় ডার্টি, তীরে নেমেই ভাল করে আগে গোসল করে নিবি। তোর গন্ধ রাস্তার কুত্তাও সহ্য করবে না, দূর দূর করে খেদাবে।'

মুসার কথা আর বলার ভঙ্গি দেখে পুলিশরাও হাসতে শুরু করল।

হাত নেড়ে বিদায় জানালেন পুলিশ অফিসার।

গোমড়া মুখে নৌকায় বসে আছে দুই টোড, চোখ নামানো, তাকাতে পারছে না কারও দিকে।

পাহাড়ের একটা মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল বোট দুটো।

কুকুর খেকো ডাইনী

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

জুনের এক রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেল। শক্তিশালী একটা লাল কনভারটিবল গাড়ি চালাচ্ছে রবিন, এখানে আসার জন্যে ভাড়া নিয়েছে গাড়িটা। পাশে বসে তন্ময় হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে কিশোর। দু-ধারে চষা খেত। দূরে দেখা যাচ্ছে পকোনো পর্বতমালার সবুজ ঢাল। পেনসিলভানিয়া ডাচ এলাকার মধ্যে দিয়ে চলেছে ওরা।

পেছনের সীটে বসে ঝিমাচ্ছে মুসা।

হঠাৎ রসিকতার সুরে বলে উঠল রবিন, 'মুসা, ওই দেখো একটা সাইনবোর্ড। ডাইনী তাড়ানোর জন্যে বসানো হয়েছে। ডাইনী আছে এখানে।'

চমকে চোখ মেলল মুসা, 'কই, কোথায়?' দেখতে পেল নিজেই। চাষীর এক গোলাঘরের ওপর বিরাট একটা গোল জিনিস। 'এ রকম গোল কেন?'

'একে বলে হেক্স্ সাইন। ডাইনী আর বজ্রপাতকে তাড়ানোর জন্যে বসানো হয়।'

'ডাইনী! আজকের দিনে?'

'কেন, ভূত যদি থাকতে পারে, ডাইনী থাকবে না কেন? কিছু কিছু ডাইনীর ক্ষমতা কিন্তু ভূতের চেয়ে বেশি,' মুসাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলল রবিন। 'তোমার গরুকে যদি জাদু করে দেয়, দুধ শুকিয়ে যাবে ওটার, আর দুধ দেবে না। আরও অনেক কুমন্ত্র জানে ডাইনীরা। ওসব শয়তানি যাতে না করতে পারে সে-জন্যেই বসানো হয়েছে ওটা।'

ঘুম দূর হয়ে গেল মুসার চোখ থেকে। পরের দুটো গোলাবাড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। নিজেকেই যেন বোঝাল, 'দূর, কি যে বলো, আজকাল আর ওসব বিশ্বাস করে না কেউ! এটা বিংশ শতাব্দী। আমাকে আর ভয় দেখানোর চেষ্টা কোরো না, বুঝলে, আমি এখন আর ডাইনী-ফাইনী বিশ্বাস করি না।'

'তাই নাকি?' হেসে বলল কিশোর, 'তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন?'

'কই পাচ্ছি?'

'যাই বলো, আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা। সত্যি বলেছ, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও হেক্স্ সাইন লাগায় লোকে!'

'খাইছে! দোহাই তোমার, কিশোর, এর মধ্যে আর রহস্য খুঁজো না

তো! এই একটিবার অন্তত রক্ষা করো। এই ছুটিতে কোন গোয়েন্দাগিরি করব না আমরা, খাব-দাব আর ঘুরে বেড়াব।'

'শুধু ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তোমাকে এতদূরে এত খরচ করে পাঠানো হয়েছে ভাবছ কেন?'

'তুমি না বললে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা!'

'বেড়াতেই তো এসেছি, তবে বিনিময়ে একটা কাজ করে দিতে হবে। খামোকা কি আর কেউ কাউকে টাকা দেয়। আর আমরাই বা নেব কেন?'

'তা তো নেব না। কিন্তু ঘটনাটা কি খুলে বলো তো?'

'মিস্টার সাইমনের এক বন্ধু ক্যাপ্টেন ডেভিড রিচটনকে সাহায্য করার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাদের। ওই পর্বতের ভেতরে ব্ল্যাক হোলো নামে একটা জায়গায় তাঁর কেবিন।'

'ক্যাপ্টেন রিচটন? কিসের ক্যাপ্টেন? সেনাবাহিনীর?'

'না, পুলিশের। পাঁচ-ছয় বছর আগেও পুলিশ চীফ ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।'

'হুঁ, বুঝেছি, আমি একটা গাধা!' মুষড়ে পড়ল মুসা, এলিয়ে পড়ল আবার পেছনের সীটে, শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। 'আর কোন কাজ নেই কিছু নেই, শুধু বেড়াতে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন তোমার, সেটা আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার। তোমরাও কিন্তু বলোনি আমাকে।'

'তুমিও তো জিজ্ঞেস করোনি। বেড়ানোর নাম শুনেই লাফিয়ে উঠেছ।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। ভিকটর সাইমন যেদিন তিন গোয়েন্দাকে তাঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন, সেদিন গ্যারেজে জরুরী কাজ ছিল মুসার। নিজেদের গাড়িগুলো ধুয়েমুছে সাফ করছিল। সে-জন্যে যেতে পারেনি। কিশোর আর রবিন গিয়েছিল। বিকেলে খবর জানিয়েছে রবিন, আগামী দিনই নিউ জারসিতে রওনা হচ্ছে ওরা। খরচ-খরচা সব মিস্টার সাইমন বহন করবেন। বোকার মত সে ভেবেছিল, শুধু বেড়াতেই বুঝি যাওয়া হচ্ছে। তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আর কি কি জানো বলে ফেলো তো?'

'আর? অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটছে ব্ল্যাক হোলোতে। এ কথা মিস্টার সাইমনকে লিখে জানিয়েছেন ক্যাপ্টেন রিচটন। সাহায্যের অনুরোধ করেছেন তাঁকে। কিন্তু তিনি এখন ভীষণ ব্যস্ত, আরেকটা অত্যন্ত জরুরী তদন্ত করছেন। ব্ল্যাক হোলোতে যাওয়া এখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সে-জন্যেই আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন…'

'তাঁর দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে!'

'তোমার কি খুব রাগ হচ্ছে?' খোঁচা দিয়ে বলল রবিন। 'বলো তো ফিরে যাই। কি বলো, কিশোর?'

কিশোর হাসল। তাড়াতাড়ি মুসা বলল, 'না না, যাওয়ার আর কি দরকার, এসেই যখন পড়েছি। তা ছাড়া এতগুলো খাবার-দাবার কিনে আনলাম। সব নষ্ট হবে।'

ঝলমলে বিকেল। প্যানসিলভানিয়া ডাচের চমৎকার উপত্যকা ধরে চলছে গাড়ি। সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে। পেছনে পড়েছে চাষের খেত। এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে পথ, পাহাড়ের ঢালের গভীর বনের দিকে। এখানে ওখানে সবুজের মধ্যে থেকে মাথা তুলেছে ধূসর পাথরের চাঙড়।

'পর্বতে ঢুকলাম,' ঘোষণার মত করে বলল রবিন।

একটা শৈলশিরা পেরিয়ে এসে হঠাৎ করে নেমে গেছে পথটা, পরের পাহাড়শ্রেণীতে পৌঁছে আবার সোজা উঠেছে। সামনে তাকিয়ে আছে কিশোর। বাড়িঘর চোখে পড়ল, একটা শহর।

আচমকা কানে এসে লাগল লাউড-স্পীকারে বাজানো মিউজিক আর কথার শব্দ। কান খাড়া করে ফেলল তিনজনেই, কোথা থেকে আসছে দেখার চেষ্টা করল।

'দেখে ফেলেছি!' বলে উঠল মুসা। কান ও চোখের ক্ষমতা অন্য দু-জনের চেয়ে তার বেশি।

রবিন আর কিশোরও দেখল, একসারি তাঁবু। উজ্জ্বল রঙের ব্যানারে লেখা রয়েছেঃ

হ্যারি'জ কার্নিভ্যাল

'এই, থামো তো,' মুসা বলল। 'এদিকের কার্নিভ্যাল দেখার শখ আমার অনেক দিনের। পপকর্নের গন্ধও পাচ্ছি। টেস্টটা দেখি কেমন।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। হেসে মাথা ঝাঁকাল গোয়েন্দাপ্রধান।

গাড়ি পার্ক করে নেমে এল তিন গোয়েন্দা। কান ঝালাপালা করে ঝমঝম বাজছে মিউজিক, সেই সঙ্গে ঘোষকের চিৎকার, কোলাহল। প্রচুর দর্শকের ভিড়। বনবন ঘুরছে নানারকম নাগরদোলা, বিচিত্র ওগুলোর নাম—হুইপ, অকটোপাস, ম্যাড হর্স। ওগুলোতে বসা মানুষগুলো সমানে চেঁচাচ্ছে, বাচ্চা-বুড়োতে কোন ভেদাভেদ নেই। একপাশে অনেকগুলো স্টল, চিৎকার করে ক্রেতা ডাকছে মালিক আর সেলসম্যানেরা।

অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা একটা খাবারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। কিনল এক কার্টন পপকর্ন, এক ব্যাগ পানাট, একগাদা ক্যান্ডি।

একটা সাইনবোর্ড দেখিয়ে রবিন বলল, 'ওই তাঁবুটাতে ঢুকলে কেমন হয়?'

মুসা আর কিশোরও পড়ল সাইনবোর্ডটাঃ

কর্নেল ডুম হুমবা
নির্ভীক অ্যানিমেল ট্রেনার

'মাশাআল্লাহ!' পপকর্ন চিবাতে চিবাতে বলল মুসা, 'নাম বটে। জন্তুর শিক্ষক যখন, হুমবা না রেখে হামবা রাখলেই হত, গরু, মানাত ভাল।'

তাঁবুর ভেতর থেকে হিংস্র জানোয়ারের ডাক শোনা গেল। তারমানে বাঘ-সিংহ জাতীয় কিছু আছে। হুমবা কতটা নির্ভীক দেখার জন্যে টিকিট

কেটে ভেতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে।

গোলাকার তাঁবুর কেন্দ্রে একটা গোল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আঁটসাঁট সাদা পোশাক পরা একজন মানুষ, পায়ে গোড়ালি ঢাকা চকচকে কালো বুট। ঘন, ঝাঁকড়া কালো চুল, পুরু গোঁফ, মোটা ভুরু, তীক্ষ্ণ চোখ, হাতে কালো লম্বা চাবুক যেন কর্তৃত্ব জাহির করছে। এর দরকারও আছে, কারণ কাছেই একটু পর পর সাজানো ছোট টুলে তাকে ঘিরে বসে আছে চারটে ভয়ানক জন্তু, দুটো হলদেটে, আর দুটো কালো। চারটেই জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। লম্বা লেজের মাথা থিরথির করে কাঁপছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে মানুষকে পছন্দ করে না ওরা।

'পুমা,' নিচু স্বরে বলল রবিন। 'কি বিরাট দেখেছ!'

সপাং করে উঠল চাবুক। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরছে ট্রেনারের শক্তিশালী দেহটা, প্রতিটি জানোয়ারকে টুল থেকে নেমে আবার লাফিয়ে উঠে বসতে বাধ্য করছে।

'নাহ্, লোকটা সত্যি নির্ভীক,' প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। 'যে ভাবে পেছন করে দাঁড়াচ্ছে জানোয়ারগুলোকে, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে দেখতেই পাবে না।'

কিন্তু ভুল অনুমান করেছে সে। একটা কালো পুমা লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হলো। একেবারে সময়মত কি করে টের পেয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল ট্রেনার, হিসিয়ে উঠল চাবুক, থমকে গেল জানোয়ারটা, লাফ দেয়া আর হলো না।

'খাইছে! এ তো সাংঘাতিক মানুষ!' বলে উঠল মুসা।

'হ্যাঁ,' পাশের সীটে বসা অপরিচিত একজন দর্শক বলল, 'সাহস আছে। এখনও বুনোই রয়ে গেছে জানোয়ারগুলো, ওগুলো নিয়েই খেলা দেখাচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে আরেকটা ছিল, হলুদ রঙের, এমন শয়তানের শয়তান, হুমবাও বাগ মানাতে পারেনি। একদিন আরেকটু হলেই দিয়েছিল ঘাড় মটকে, শেষমেষ ওটাকে বিদেয় করতে হয়েছে।'

অবাক হয়ে হুমবার খেলা দেখল তিন গোয়েন্দা। তারপর তার প্রশংসা করতে করতে বেরোল তাঁবু থেকে। আবার চড়ল গাড়িতে।

দুই ঘণ্টা পর, শেষ বিকেলে খাড়া কাঁচা রাস্তা বেয়ে উঠে চলল ওপর দিকে লাল গাড়িটা। দু-পাশের বনের গোড়ায় তখন কালো ছায়া পড়েছে।

'মনে হচ্ছে ঠিক পথেই যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'তবু, শিওর হওয়া দরকার। ওই যে একটা বাড়ি।'

বাড়িটার সামনে এনে গাড়ি থামাল রবিন। অনেক পুরানো, কাঠের তৈরি ঘর। সামনের বেড়ার রঙ উঠে গেছে বহু আগে। নীরব, নির্জন।

'কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' আশপাশটা দেখতে দেখতে বলল রবিন।

গেটের দিকে এগোল তিনজনে। হাত তুলে বাড়ির পাশে গাছপালার ভেতর দিয়ে যাওয়া একটা রাস্তা দেখাল কিশোর। 'ওই যে, মানুষ আছে।'

রোগাটে, ছোটখাট একজন মহিলা বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। হাত ধরে টেনে আনছে বছর সাতেকের একটা ছেলেকে। চিৎকার করে কাঁদছে ছেলেটা। গোয়েন্দাদের দেখে এগিয়ে এল মহিলা, 'আমি মিসেস ভারগন। তোমাদেরকে তো কখনও দেখিনি? কি চাও?'

'এটা কি রিম রোড?' জানতে চাইল কিশোর। 'ক্যাপ্টেন রিচটনের বাড়িটা খুঁজছি।'

রঙ ফ্যাকাসে হয়ে আসা একটা সুতার পোশাক পরেছে মহিলা। আরেকটু এগিয়ে এসে ভালমত দেখল ছেলেদের। 'রিচটন? সোজা সামনে, পথের মাথার শেষ বাড়িটা। একেবারে ব্ল্যাক হোলোর কিনারে।' বলে আরেকবার দেখল ছেলেদের।

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'কাঁদছে কেন ও? মন খারাপ? এই বাবু, একটা চকলেট খাবে? নাও।'

'কোন লাভ হবে না,' মিসেস ভারগন বলল, 'ওর কান্না থামবে না। কাল রাতে ওর কুত্তা হারিয়ে গেছে। ওটা না পাওয়া পর্যন্ত আর কোন কিছু দিয়েই বন্ধ করা যাবে না।'

'তাই নাকি? দেখলে জানাব। কি কুকুর?'

'এই ছোট জাতের, বাদামী রঙ। একটা কান সাদা। গলায় কলার পরানো। তাতে ট্যাগে নাম লেখা আছে, ডব।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরল ছেলেরা। শুনতে পেল, ছেলেটাকে ধমক দিয়ে মিসেস ভারগন বলছে, 'পটি, তুই কান্না থামাবি! মরে যাবি নাকি একটা কুত্তার জন্যে!' তারপর আবার ডাকল গোয়েন্দাদের, 'এই, শোনো।'

কিছুটা অবাক হয়েই ঘুরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। গেটের কাছে এসে দাঁড়াল মহিলা। এদিক ওদিক তাকিয়ে, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'তোমরা এখানে নতুন, বুঝতে পারছি। সাবধান করে দেয়া দরকার। ব্ল্যাক হোলোর কাছে যেয়ো না।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর, 'কেন?'

'জায়গাটা ভাল না। ডাইনীর আসর আছে। দুশো বছর আগে এখানকার এক সুন্দরী মেয়ে ডাইনী হয়ে যায়। কুত্তা দেখতে পারত না সে, মন্ত্র পড়ে ওগুলোকে গায়েব করে দিত। তারপর কি যে করল কে জানে, জোয়ান জোয়ান মানুষগুলো হঠাৎ অসুখ হয়ে মরে যেতে শুরু করল।'

ঘাবড়ে গেছে মুসা। চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কেউ কিছু করতে পারল না তার?'

'চেষ্টা কি আর কম করেছে। লোকে ধরে আটকে রেখে দিল ডাইনীটাকে। ভাবল, এইবার শয়তানি বন্ধ হবে। কিন্তু তা কি আর হয়। একদিন উধাও হয়ে গেল সে, ঢুকে পড়ল গিয়ে ব্ল্যাক হোলোর কাছে বনে।

রাতে বেরিয়ে এসে ঘুরে বেড়াত গাঁয়ের পথে পথে, মন্ত্র পড়ে গরুকে শুকিয়ে মারত, কুত্তা ধরে নিয়ে যেত, আর ফিরে আসত না ওগুলো। লোকের ধারণা, কুত্তা খেত ডাইনীটা। আরও যত রকমের শয়তানি আছে করত। তারপর এক রাতে ভয়ানক চিৎকার শোনা গেল। গাঁয়ের সবচেয়ে সাহসী দু-চারজন লোক গিয়ে দেখল, একজায়গায় একটা গর্ত হয়ে আছে। মাটি পুড়ে কালো হয়ে গেছে।'

'কি-কি হয়েছিল!' ভয়ে তোতলাতে শুরু করল মুসা।

'লোকের ধারণা, স্বয়ং শয়তান বেরিয়ে এসে ডাইনীটাকে ধরে নিয়ে গেছে মাটির তলে!' ভয়ে ভয়ে আবার এদিক ওদিক তাকাল মিসেস ভারগন। 'এর প্রায় একশো বছর পর আবার রহস্যজনক ভাবে কুত্তা হারাতে আরম্ভ করল। গর্তটার কাছে রাতে শোনা যেতে লাগল ডাইনীর চিৎকার। যেমন হঠাৎ করে আরম্ভ হয়েছিল, কিছুদিন পর আবার হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল। আরও একশো বছর পর এখন আবার যখন কুত্তা হারাতে শুরু করেছে, রাতে চিৎকার শোনা যায়···শোনো, তোমাদেরকে ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে আমার, সে-জন্যেই সাবধান করছি, নইলে আমার কি।'

নিগ্রো ছেলেটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখল মিসেস ভারগন। শ্বেতাঙ্গ ছেলেটার বিশেষ কোন ভাবান্তর হলো না। আর তৃতীয় ছেলেটার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

বাড়ির ভেতরে টেলিফোনের শব্দ শোনা গেল।

'কে আবার করল? যাই, দেখি।' ভেবেছিল, ডাইনীর কথা শুনে ভয়ে একেবারে কাবু হয়ে যাবে ছেলেগুলো, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবে। হলো না দেখে খানিকটা হতাশই হলো মহিলা। ভোঁতা স্বরে বলল, 'আমার সাবধান করা দরকার করলাম, শোনা না শোনা তোমাদের ইচ্ছে।'

দুই

'আমার রোম খাড়া করে দিয়েছে!' মুসা বলল।

লো গীয়ারে গাড়ি চালাচ্ছে রবিন, ওপরের দিকে উঠছে। 'তুমিই না তখন বললে এই যুগে আর ডাইনী-ফাইনী বিশ্বাস করে না কেউ, তুমিও কোরো না।'

'কিন্তু এ জায়গাটা ভাল না। বলা যায় না, এখানে থাকতেও পারে। ঘন বন, একটা-দুটো বাড়ি···এই কিশোর, মহিলা বানিয়ে বলেনি তো এ সব কথা? কি মনে হয় তোমার? পটির কুত্তাটা যে হারিয়েছে সেটাও তো ঠিক, নইলে অত কাঁদবে কেন?'

হেসে বলল রবিন, 'এ সব গল্প এ ভাবেই ছড়ায়। রহস্যময় ঘটনা ঘটতেই পারে। আসল কারণটা না খুঁজে রঙ চড়িয়ে যার যা ইচ্ছে বানিয়ে বলে দেয়।

যত দোষ ফেলে নিয়ে গিয়ে ডাইনী কিংবা ভূতের ওপর।'

কিশোর বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না। চিৎকারটাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না, রবিন। নিজে না শুনলে আমাদের আগ বাড়িয়ে এ ভাবে বলত না মিসেস ভারগন।'

পাহাড়ের ওপরে উঠে প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ল, তা হলো নতুন রঙ করা একটা লেটার-বক্স। নাম লেখা রয়েছে: ডি. রিচটন। তার ওপাশে ঘাসে ঢাকা ছোট্ট একটুকরো খোলা জায়গা। জায়গাটাকে দু-পাশ থেকে ঘিরে এসেছে ঘন পাতাওয়ালা হার্ডউড আর দেবদারু গাছের জঙ্গল। ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে কাঠের তৈরি ছোট একটা কেবিন। বাড়ির ওপাশ থেকে উঁকি দিয়ে আছে পুরানো একটা গাড়ির নাক।

'বাহ্, গাড়ির যত্ন করেন ক্যাপ্টেন,' চিনতে পারল রবিন। 'পনেরো বছর আগের মডেল, অথচ একেবারে ঝকঝকে রেখেছেন।'

বাড়ির পেছনে কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ করেই যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে ঘাসে ঢাকা জায়গাটা। ওটা আসলে একটা বিরাট গর্তের কিনারা। কিনারে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে, ঘাস শেষ, তার জায়গা দখল করেছে ওখানে ধূসর, মসৃণ পাথর, প্রায় খাড়া হয়ে নেমেছে বাটির মত দেখতে একটা উপত্যকায়, ঢুকে পড়েছে লতায় ছাওয়া ঘন জঙ্গলের মধ্যে।

'এটাই ব্ল্যাক হোলো,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আশ্চর্য! ওখানকার গাছগুলো পর্যন্ত কালো লাগছে। অথচ এ রকম লাগার মত এতটা অন্ধকার কিন্তু হয়নি এখনও।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন কোথায়?' বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'আমাদের গাড়ির শব্দ নিশ্চয় শুনেছেন। আসছেন না কেন?' চিৎকার করে ডাকল, 'ক্যাপ্টেন রিচটন, আমরা এসেছি! তিন গোয়েন্দা!'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবাক হলো ওরা। আসার খবর চিঠি লিখে জানিয়েছে ক্যাপ্টেনকে, তবে কি চিঠি পাননি? সেটা তো হতে পারে না। আর চিঠি পান বা না পান, ডাক শুনে এসে দেখার তো কথা?

এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল রবিন। 'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন রিচটন!'

জবাব এল না এবারও।

দরজায় তালা নেই। ঢুকে পড়ল ওরা। সুন্দর, সাজানো-গোছানো একটা ঘর, এককোণে ছোট একটা বাংক। শুধু গাড়িরই যত্ন করেন না ক্যাপ্টেন, সব জিনিসেরই করেন, বোঝা গেল। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?

ওপাশের ছোট রান্নাঘরটায় ঢুকল মুসা। মুহূর্ত পরেই তার চিৎকার শোনা গেল, 'অ্যাই, দেখে যাও! বন্যা হয়ে গেছে!'

দৌড়ে গেল কিশোর আর রবিন। অনেক পানি জমে আছে মেঝেতে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। ওই পানিটুকু বাদ দিলে রান্নাঘরটাও শোবার ঘরের মতই গোছানো, যেখানে যেটা থাকা দরকার, ঠিক সেখানেই আছে। চকচক করছে প্যান, চামচ, বাসন-পেয়ালা। পরিষ্কার পর্দাগুলোর কোথাও

এতটুকু দাগ নেই।

'মেঝেতে পানি এল কোত্থেকে?' রবিনের কণ্ঠে বিস্ময়। 'এ রকম হওয়ার কথা নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসেন ক্যাপ্টেন। পানি পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলার কথা।'

নুয়ে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল কিশোর। বরফের মত শীতল। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল এককোণে রাখা একটা পুরানো আমলের আইস-বক্সের কাছে। নিচ থেকে টেনে বের করল একটা বেসিন, পানিতে টইটম্বুর, ওটা থেকেই পানি উপচে পড়ে মেঝে ভাসিয়েছে।

দুই সহকারীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল সে, 'বরফ গলে এই পানি জমেছে।'

ভুরু কুঁচকে বলল রবিন, 'জমতে তো অনেক সময় লেগেছে নিশ্চয়। পরিষ্কার করলেন না কেন ক্যাপ্টেন?'

বেসিনের পানিটা সিংকে ঢেলে খালি করল কিশোর। বিড়বিড় করল, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত!'

মুসা বলল, 'মানুষ তো আর সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকে না। হয়তো তিনি যাওয়ার পর পড়েছে।'

'বিছানাটাও এলোমেলো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'বাইরে গেলে এ ভাবে ফেলে যাওয়ার কথা নয়। যে রকম গোছগাছ করা স্বভাব তাঁর, গুছিয়েই রেখে যেতেন। পানি নাহয় পরে পড়তে পারে, কিন্তু বিছানাটা তো আর আপনাআপনি অগোছাল হতে পারে না।'

'হয়তো তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছেন,' অনুমান করল মুসা। 'গোছানোর সময় পাননি?'

'তাহলে কি এমন কাজে চলে গেলেন, যে বিছানা গোছানোরও সময় পাননি?' নিজেকেই প্রশ্নটা করল যেন কিশোর।

ব্যাপারটা খাপছাড়া লাগল গোয়েন্দাদের কাছে। বেরিয়ে এসে বাটির মত জায়গাটার কিনারে দাঁড়াল, যেখান থেকে উপত্যকায় নেমে গেছে ঢাল। মুখের কাছে হাত জড় করে চিৎকার করে ডাকল, 'ক্যাপ্টেন রিচটন! ক্যাপ্টেন রিচটন!'

জবাবের আশায় কান পেতে রইল ওরা। কিন্তু কোন সাড়া এল না বিরাট কালো গর্তটা থেকে, এমনকি কোন প্রতিধ্বনিও নয়।

'গুরুতর কিছু একটা হয়েছে মনে হয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'বলা যায় না, কোথাও জখম হয়েও পড়ে থাকতে পারেন। খুঁজতে যাব।' একপাশের জঙ্গল দেখিয়ে বলল, 'মুসা, তুমি আর রবিন ওদিকে যাও, আমি এদিকে যাচ্ছি।'

বনে ঢুকে পড়ল দুই সহকারী গোয়েন্দা। অনেক বড় বড় গাছের মাথা এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে, রোদ আটকে ফেলে, গোড়ায় আগাছা জন্মাতে দেয় না। ফলে হাঁটা সহজ। গোধূলির কালচে-ধূসর ছায়া নেমেছে বনতলে, আর

আধঘণ্টার মধ্যেই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর মুসা বলল, 'রাত তো হয়েই গেল। আর খুঁজে লাভ নেই। চলো, ফিরে যাই।'

আবার খোলা জায়গাটায় ফিরে এল দু-জনে। কিশোরের নাম ধরে ডাকল মুসা। জবাব পেল না।

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল সে, 'এ-কি ভূতুড়ে কাণ্ড! প্রথমে ক্যাপ্টেন, এখন কিশোরও গায়েব…'

খসখস শব্দ শুনে থেমে গেল সে।

'শ্‌শ্‌!' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'কিসের শব্দ?'

খোলা জায়গাটায়ও এখন অন্ধকার। বনের ভেতরে আবার শোনা গেল শব্দটা, নড়ছে যেন কিছু। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু-জনে।

'মুসা? রবিন?' ডাক শোনা গেল বনের কিনার থেকে।

ও, কিশোর! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

কাছে এসে জানাল কিশোর, 'কোন চিহ্নই পেলাম না ক্যাপ্টেনের। উপত্যকায় নামার একটা পথ পেয়েছি। ওটা ধরে এগিয়েছিও কিছুদূর। এ-জন্যেই দেরি হয়েছে। কিন্তু কিচ্ছু পেলাম না।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল রবিন। 'এক রহস্যের কিনারা করতে এসে আরেক রহস্য…চলো, আমাদের মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

খানিক পরেই ছোট্ট কেবিনের রান্নাঘর থেকে মাংস আর ডিমভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। খেতে বসে গেল তিন গোয়েন্দা। গোগ্রাসে গিলছে মুসা। রিচটনের উধাও হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে তিনজনে।

'ঘরের দরজায় তালা নেই, গাড়িটাও রয়েছে,' নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর, 'দুটো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হয় কেউ তাঁকে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে, নয়তো তিনি নিজেই হেঁটে গেছেন। এত তাড়াহুড়া করে গেছেন, দরজায় তালা লাগানোরও সময় পাননি। হেঁটে গেলে এমন কোন জায়গায় গেছেন, যেখানে গাড়ি চলে না।'

'ওরকম জায়গা একটাই দেখেছি। গর্তের মত উপত্যকাটা, ব্ল্যাক হোলো।'

প্লেটের খাবার চেটেপুটে শেষ করে ফেলল মুসা। 'রহস্য নিয়ে যত খুশি মাথা ঘামাও তোমরা, সূত্র খুঁজতে থাকো, আমি এই সুযোগে বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে ফেলি। তারপর আরও কাজ আছে। তবে সেগুলো করতে পারি এক শর্তে।'

'কী?' কিছুটা অবাক হয়েই জানতে চাইল কিশোর।

'কিছু লাকড়ি এনে দিতে হবে।'

মুসার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন, ভেবেছিল কি না জানি বলবে। উঠে গেল রিচটনের জড় করে রাখা লাকড়ির স্তূপ থেকে লাকড়ি আনার জন্যে। ফিরে এল দু-জনে দুই বোঝা নিয়ে।

হ্যান্ডপাম্পটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুসা। বসে না থেকে ঘরের ভেতরে খুঁজতে শুরু করল অন্য দু-জনে—কি খুঁজছে জানে না, তবে ক্যাপ্টেনের উধাও হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু।

'কিশোর,' লিভিং-রুম থেকে ডাকল রবিন। 'গানর‍্যাকে একটা বন্দুক কম। রাইফেলও হতে পারে সেটা, কিংবা শটগান। জায়গাটা খালি।'

রান্নাঘরের টেরিলে আরও মূল্যবান একটা সূত্র খুঁজে পেল কিশোর। ডাকল, 'রবিন, দেখে যাও।'

রান্নাঘরে দৌড়ে এল রবিন।

টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া বুকসাইজ ক্যালেন্ডারটা দেখাল কিশোর। গত দুই মাসের তারিখগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। একটা বিশেষ তারিখের নিচের লেখা দেখিয়ে বলল, 'এই যে দেখো, কোন জাতের কুকুর, মালিকের নাম, পরিষ্কার করে লিখেছেন। জুনের দশ, বর্ডার টেরিয়ার, মালিকের নাম জন হিগিনস।'

ক্যালেন্ডারটা হাতে নিল রবিন। আরও কয়েকটা কুকুরের নাম দেখল বিভিন্ন তারিখের নিচে। একটা তারিখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। 'এটা দেখেছ! লিখেছেন: চিৎকার শুনলাম!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

বাসন ধুতে ধুতে ফিরে তাকাল মুসা, 'বাহ্‌, চিৎকারটা তাহলে ক্যাপ্টেনও শুনেছেন! আর তো হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না!'

'ঠিকই বলেছ। একজন পুলিশ অফিসার, ভালমত না শুনলে লিখতেন না,' কিশোর বলল। আনমনে বিড়বিড় করল, 'চিৎকার শুনেছেন, কুকুরের কথা লিখেছেন···লোকে বলে ডাইনীটা চিৎকার করে, কুকুরও ধরে নিয়ে যায়···'

'পটির কথা লিখেছেন নাকি দেখো তো?'

দ্রুত দেখে নিল রবিন। 'না। এটা মাত্র কাল রাতের ঘটনা। না লেখার আরেকটা মানে হতে পারে, তিনি এখানে তখন ছিলেন না, হয়তো আজ সারাদিনেও ফেরেননি।'

'হতে পারে,' একমত হলো কিশোর। 'আমি এখন আরও শিওর হচ্ছি, বিপদেই পড়েছেন তিনি। কাল সকালে উঠেই তাঁকে খুঁজতে বেরোব।'

'আমার কাজ শেষ,' টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। হাই তুলতে তুলতে বলল, 'রাতে নিশ্চয় আর কিছু করবে না। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। বাংকে কে শোবে? দাঁড়াও, টস করে নিই।'

'টসফস লাগবে না,' হেসে বলল রবিন। 'ইচ্ছে হলে তুমি ঘুমাওগে। আমি আর কিশোর মেঝেতেই শুতে পারব, স্লীপিং ব্যাগে।'

মৃদু একটানা হিস্‌স্‌স্‌ আওয়াজ করে জ্বলছে হ্যাজাক লাইট। আলো জ্বেলে রাখা প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। চাবি ঘুরিয়ে তেল বন্ধ করে দিল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কমলা রঙ হয়ে রইল ম্যানটেলটা, তারপর নিভে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল কেবিন। একেবারে নীরব হয়ে গেল। অনেক পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছে ওরা, তারপর বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

মাঝরাতে ভয়াবহ একটা শব্দে চমকে জেগে গেল তিনজনেই। চোখ মেলে, কান পেতে চুপ করে পড়ে রইল অন্ধকারে, আরেকবার শব্দটা শোনার আশায়।

শোনা গেল আবার। রাতের নীরবতা খান খান করে দিল তীক্ষ্ণ, তীব্র চিৎকার; যেন ভীষণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কোন মহিলা। কেবিনের পেছনে গর্তের নিচ থেকে এল বলে মনে হলো।

চিৎকারটা মিলিয়ে গেলে ফিসফিস করে মুসা বলল, 'ক্যাপ্টেন কাল এই চিৎকার শুনেই দেখতে যাননি তো?'

'জানি না,' লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'মনে হয় কেউ বিপদে পড়েছে। এই, জলদি কাপড় পরে নাও, দেখতে যাব।'

দুই মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। সন্ধ্যায় যে বুনোপথটা দেখে এসেছে কিশোর, সেটা ধরে দৌড়ে নেমে চলল উপত্যকায়। ঘন ঝোপঝাড় আর বড় বড় পাথরে পড়ে বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করছে টর্চের আলো। একে তো অচেনা পথ, তার ওপর বেরিয়ে থাকা গাছের শেকড় বাধা দিয়ে গতি কমিয়ে দিচ্ছে।

কাউকে চোখে পড়ল না ওদের। একটা জায়গায় এসে থেমে দাঁড়াতে হলো। সামনে একটা পাহাড়ী নালা। পাথরে পাথরে বাড়ি খেয়ে যেন টগবগ করে ফুটতে ফুটতে, সাদা ফেনা তৈরি করে তীব্র গতিতে বয়ে যাচ্ছে স্রোত।

'তখন এই পর্যন্ত এসেই ফিরে গেছি,' পানির প্রচণ্ড শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর। 'পেরোবে নাকি?'

'নিশ্চয়,' বলেই বোকার মত পানিতে পা দিয়ে বসল রবিন। কিন্তু স্রোতের শক্তি আন্দাজ করতে পারেনি সে, একটানে তাকে চিৎ করে ফেলল। নিজেকে সামলানোরও সময় পেল না। নিতান্তই একটা খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলল তাকে পানি।

তিন

'আলো সরাবে না!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'ধরে রাখো!'

রবিনের ওপর টর্চের আলো ধরে রেখে পাড় ধরে নিচের দিকে দৌড়ে নামতে লাগল দু-জনে।

জবাব না দিয়ে তার টর্চটাও কিশোরের হাতে গুঁজে দিয়ে ওই স্রোতের মধ্যে নেমে গেল মুসা। বরফের মত শীতল পানি, কিন্তু গভীরতা বেশি নয়। উঠে দাঁড়াল সে, পানি বেশি না এখানে, মাত্র কোমর পানি, কিন্তু সাংঘাতিক টান, পেছন থেকে ঠেলা মেরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে।

প্রায় বেহুঁশ হয়ে গেছে ততক্ষণে রবিন। নিচে নেমে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে যে নেমে যাবে মুসা, তার উপায় নেই। নালার নিচটা খুব পিচ্ছিল। পা রাখাই মুশকিল। নিজেকে বোঝাল, 'উল্টে পড়ে বিপদ আরও বাড়ানোর চেয়ে আস্তে নামাই ভাল।'

কিশোরের হাতের দুটো টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে রবিনের কাছে পৌঁছে গেল সে। একটা পাথরে ঠেকে আটকে আছে রবিন। বেহুঁশ। নাকটা কেবল রয়েছে পানির ওপরে।

পা দুটো একটা খাঁজে শক্ত করে আটকে দিল মুসা, যাতে পিছলে না পড়ে। উবু হয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রবিনকে। আগুন লাগলে দমকল কর্মীরা যে ভাবে কাঁধে তুলে নেয় আক্রান্ত মানুষকে, সে-ও তেমন করে কাঁধে ফেলল অচেতন দেহটাকে।

'এদিক দিয়ে উঠে এসো!' আলো ফেলে পথ দেখিয়ে চিৎকার করে ডাকল কিশোর।

পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে আসতে লাগল মুসা। কাঁধে বোঝা নিয়ে এখন পা পিছলালে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তবে আর কোন অঘটন ঘটল না। তীরে উঠে রবিনকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বসে হাঁপাতে লাগল সে।

চোখের পলকে রবিনের ওপর এসে ঝুঁকে বসল কিশোর। অবস্থা কতটা গুরুতর দেখতে শুরু করল। নাড়ি দেখল, ঠিকই আছে। নিজের গা থেকে শার্ট খুলে নিয়ে ওটাকেই তোয়ালে বানিয়ে মুখ থেকে পানি মুছতে লাগল।

টর্চের আলোয় মাথায় একটা জখম চোখে পড়ল, রক্ত বেরোচ্ছে, পাথরে বাড়ি খেয়ে হয়েছে ওটা। টেনে টেনে রবিনের ভেজা জামাকাপড় খুলে ফেলল সে। ভেজা গা মুছিয়ে দিল।

একটু পরেই চোখ মিটমিট করল রবিন। তাকাল টর্চের আলোর দিকে। দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'আলো সরাও!···আরি, আমার কাপড় কি করেছ তোমরা? ন্যাংটো বানিয়ে ফেলেছ···'

'এখানে আমরাই কেবল, অসুবিধে নেই,' হাসল কিশোর। নিজের অর্ধেক ভেজা শার্টটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এটা পরে ফেলো। এক্ষুণি কেবিনে ফিরে গিয়ে গা গরম না করলে মরবে দু-জনেই।'

'চিৎকারটা কে করল···'

'জাহান্নামে যাক চিৎকার! কাল সকালেও সেটা জানা যাবে। ওঠো, জলদি চলো।'

সে-রাতে আর চিৎকার শোনা গেল না। সকালে সোনালি রোদ এসে

পড়ল কেবিনের চারপাশে ঘাসের ওপর। তখনও নীরব রইল কেবিনটা। রাতের ধকলের পর নিথর হয়ে ঘুমাচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

আরও অনেকক্ষণ পর রান্নাঘরে কেটলি আর বাসন-পেয়ালার টুংটাং শোনা গেল। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল ডিমভাজা, প্যানকেক, আর কফির সুবাস।

একটা বাসন আর চামচ হাতে বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর। বাসনটাকে ঘন্টার মত করে ধরে চামচ দিয়ে বাড়ি মারতে মারতে ডাকল, 'অ্যাই আলসেরা, ওঠো। দশটা বাজে।'

নড়েচড়ে উঠল ঘুমন্ত দুটো শরীর।

'আঁউ! আমার মাথাটা গেছে!' উঠে বসতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'বড্ডো ব্যথা!...ক্যাপ্টেন এখনও ফেরেননি, তাই না?'

'না, শুধু আমি আছি, আর প্যানকেক,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'সারাদিন খালিপেটে থাকতে না চাইলে জলদি উঠে এসো। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার, একাই সাবাড় করে দেব দেরি করলে।'

তার হুমকিতে রবিনের কিছু হলো না, কিন্তু বিছানায় তড়াক করে উঠে বসল মুসা। দৌড় দিল বাথরুমের দিকে।

খিদে তিনজনেরই পেয়েছে। রাতের ধকলই এর জন্যে দায়ী। রাক্ষসের মত গিলতে শুরু করল। খেয়েদেয়ে, তৈরি হয়ে আধঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন রিচটনকে খুঁজতে। মাথার যন্ত্রণা অনেক কমেছে রবিনের।

আগে আগে চলেছে কিশোর, গলায় ঝোলানো একটা শক্তিশালী দূরবীন। প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে পথটা নেমেছে এঁকেবেঁকে। বড় বড় গাছপালার মধ্যে ঢুকতেই রোদ সরে গেল গা থেকে, পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে একটু আধটু যা নামছে, ব্যস। বিশাল সবুজ চাঁদোয়া তৈরি করেছে যেন গাছের মাথাগুলো। তবে দিনের বেলা তো এখন, যথেষ্ট আলো আছে বনের তলায়। ক্যাপ্টেন রিচটনের যাওয়ার চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে এগোল ওরা।

'জায়গাটার নাম ব্ল্যাক হোলো কেন হয়েছে, বুঝতে পারছি,' রবিন বলল। 'এত কালো একটা গর্তের নাম আর কি হবে?'

চারপাশে পাহাড়ের দেয়াল, সহজে বাতাসও যেন ঢুকতে পারে না এখানে। অস্বাভাবিক নীরবতা। একটা পাতা কাঁপে না, কোন জানোয়ারের নড়াচড়া চোখে পড়ে না। রবিনের কথাটা এই স্তব্ধতার মাঝে বড় বেশি হয়ে কানে বাজল। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তিনজনেই।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা। 'দাঁড়াও!' কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করতে লাগল। চোখ ঘুরছে আশপাশের গাছপালার মধ্যে।

'কাকের ডাক,' রবিন বলল। 'মাইলখানেক।'

'নাহ্, অন্য একটা শব্দ শুনলাম বলে মনে হলো।'

সেই নালাটার কাছে এসে কাঁধ থেকে দড়ির বাণ্ডিল খুলে নিল মুসা। আজ আর বোকামি করল না কেউ, অসাবধান হলো না। মোটা গাছের সঙ্গে

দড়ি বেঁধে চলাচলের জন্যে একটা লাইফ-লাইন তৈরি করল।

নিরাপদে পার হয়ে এল অন্য পাড়ে। এগিয়ে চলল। পেছনে ফেলে এল পানির গর্জন। আবার ওদেরকে গিলে নিল যেন থমথমে নীরবতা।

আবার দাঁড়িয়ে গেল মুসা, 'দাঁড়াও!'

'কি শুনছ?' অধৈর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কি রকম একটা খসখসানি!'

'তুমিই করছ শব্দটা। জিনসের প্যান্টের পায়ে পায়ে ঘষা লাগছে···এসো। এ ভাবে বার বার থামতে হলে গর্তের তলায় আর নামতে পারব না।'

এগিয়ে চলল ওরা। সন্তুষ্ট হতে পারল না মুসা। খুঁতখুঁতানি থেকেই গেল মনে।

'দাঁড়াও!' এবার থমকে গেল কিশোর।

'তুমিও শুনেছ?' জানতে চাইল মুসা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশের বনের দিকে তাকাতে তাকাতে নিচু স্বরে বলল কিশোর, 'দেখিনি, তবে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ···কিছু একটা আমাদের পিছে পিছে আসছে।'

'তাহলে এখন কোথায় শব্দটা?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমরা থামলেই কি থেমে যায়? আমি তো কিছু শুনছি না!'

আবার এগোল ওরা। আগে চলে এসেছে রবিন, কারণ কিশোর আর মুসা প্রতিটি ঝোপঝাড়, গাছের আড়ালে নজর রেখে চলেছে।

অবশেষে শেষ হলো ঢাল। সমতল হলো পথটা। চলার গতি বেড়ে গেল। জোরে জোরে পা চালিয়ে চলল রবিন। কিছু বোঝার আগেই একটা কাঁটা ডালে আটকে গেল প্যান্ট। খুদে খুদে কাঁটা কাপড় ফুটো করে খোঁচা দিতে লাগল চামড়ায়। নিচু হয়ে সেটা ছাড়াতে যেতেই অন্য ডালের কাঁটায় আটকে গেল সোয়েটারের পিঠ, হাতা, হাতের খোলা চামড়ায়ও খোঁচা লাগল। একটা ছাড়াতে গেলে আরও দশটা বিঁধে যায়।

পেছন থেকে হেসে বলল কিশোর, 'বনগোলাপের কাঁটা, তাড়াহুড়ো করলে আরও আটকে যাবে। খুব আস্তে আস্তে ছাড়াও, একটা একটা করে।'

কিশোরের পরামর্শে কাজ করে কাঁটার ফাঁদ থেকে মুক্ত হলো রবিন। তবে বেশ কিছু খোঁচা সহ্য করার পর। সতর্ক হয়ে এগোল, আর আটকাতে চায় না। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না এগোতেই থমকে দাঁড়াতে হলো। 'কিশোর! মুসা!'

'কি হলো? আবার আটকেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসিমুখে ফিরে তাকাল রবিন। 'আমাকেও শুধু বোকা বানায়নি ওই কাঁটা, আরও একজনকে বানিয়েছে।' হাত বাড়িয়ে কাঁটা থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাপড় খুলে আনল সে। উজ্জ্বল রঙ, চেককাটা ছাপ। 'দেখো। শার্ট ছেঁড়া। ক্যাপ্টেনেরও হতে পারে। পুরানো নয়, তাহলে রঙ চটে যেত।'

'দেখি,' হাত বাড়াল মুসা।

কিশোরও দেখল। একটা চিহ্ন পাওয়াতে আশা হলো ওদের, এদিক দিয়েই গেছেন হয়তো ক্যাপ্টেন। কাঁটাঝাড়ের পাশ কাটিয়ে এসে বুনোপথ ধরে প্রায় ছুটতে লাগল এখন তিনজনে।

আবার চিৎকার করে উঠল রবিন। সামনে পাথরের গা কেটে, উপত্যকার এপাশ থেকে ওপাশে বয়ে চলেছে একটা সরু নদী। নদীটার পাড়ে একটা ছোট খাঁড়ির পাড়ে বসে পড়ল সে। তুলে আনছে কিছু।

মুসা আর কিশোর কাছাকাছি হলো তার।

কি পেয়েছে দেখাল রবিন। একটা দেশলাইয়ের বাক্স। ভেজা, কিন্তু রঙটা তাজা। তারমানে বেশি সময় পড়ে থাকেনি পানিতে। আজ যেন রবিনেরই দিন। একের পর এক সূত্র চোখে পড়ছে তার।

'দারুণ!' কিশোর বলল, 'ক্যাপ্টেন যদি না-ও গিয়ে থাকেন, এ পথ দিয়ে যে একজন মানুষ গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নদীর পাড় ধরে হাঁটব। দেখি, আর কি পাই?'

নরম মাটিতে পুরু হয়ে পড়ে আছে বাদামী পাইন নীড্‌ল্, পা পড়লে দেবে যায়, মনে হয় কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটছে। পায়ের ছাপ পড়ছে না। তারমানে এখানে মাটি ভেজা থাকলেও কারও ছাপ পাওয়ার আশা নেই। রাস্তা জুড়ে এক জায়গায় পড়ে আছে একটা গাছ। তার কাছে চকচকে একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের। ছুটে গেল সে। পাতার নিচ থেকে একটা নয়, দুটো চকচকে জিনিস বের করে আনল। শটগানের গুলির খোসা। শুঁকেটুকে বলল, 'বারুদের গন্ধ আছে এখনও। যে-ই গুলি করে থাকুক, বেশি আগে করেনি।'

কাপের আকৃতির দুটো গর্ত হয়ে আছে। একটাতে হাঁটু রেখে দেখল, খাপে খাপে বসে যায়। বলল, 'হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করেছিল। ক্যাপ্টেন রিচটনের একটা বন্দুক গানর‍্যাকে নেই। তিনিও গুলি করে থাকতে পারেন। কিন্তু কাকে সই করে?'

'আমি কি জানি?' হাত উল্টাল মুসা।

রবিন বলল, 'গরম হয়ে উঠছে কিন্তু ব্যাপারটা!'

ওখানে আর কিছু পাওয়া গেল না। নদীর ধারের পথ ধরে এগোতে লাগল ওরা। কিছুদূর গিয়ে আবার বুনোগোলাপের ঝাড় পড়ল, পথের ওপর উঠে এসেছে, সেখানে আরেক টুকরো কাপড় পাওয়া গেল, প্রথম টুকরোটার মত। একই পোশাক থেকে ছিঁড়েছে।

মাটিতে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। এক জায়গায় দেবে গেছে অনেকগুলো বিছুটি, কোন কোনটার গোড়া ভাঙা, ভারী কিছুর চাপে অমন হয়েছে।

'খাইছে!' বলতে বলতে নিচু হয়ে একটা টর্চ তুলে নিল মুসা। কাঁচটা ভাঙা। টুকরোগুলোও পাওয়া গেল ওখানেই। 'ক্যাপ্টেন রিচটনের, কোন

সন্দেহ নেই!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সে। 'এই দেখো, তাঁর নামের আদ্যক্ষর লেখা রয়েছে, ডি আর!'

বিছুটিগুলো ভাল করে দেখার জন্যে বসে পড়ল কিশোর। 'সিরিয়াস ব্যাপার, বুঝলে, পাতায় দেখো কিসের দাগ লেগে আছে!'

'রক্ত!' উদ্বিগ্ন শোনাল রবিনের কণ্ঠ।

এই সময় একটা খসখস শোনা গেল। ঝট করে ফিরে তাকাল মুসা। দেখল, একটা পাথরের চাঙড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা মুখ। রোদেপোড়া বাদামী চামড়া, লম্বা লম্বা চুল, কালো উজ্জ্বল চোখের তারা কেমন বন্য করে তুলেছে চেহারাটাকে। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট, বড় বড় দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সে!

চার

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেরা, যেন জ্বলন্ত ওই চোখজোড়া সম্মোহন করছে ওদের। তারপর হঠাৎ করেই পাথরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা।

'ডাইনী!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার মুখ। 'ওটাই খেয়েছে ক্যাপ্টেন রিচটনকে! আমাদের পিছু নিয়েছিল! বললাম না, শব্দ শুনেছি!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি! জলদি এসো!'

আগে আগে দৌড় দিল সে। তার পেছনে রবিন, সবশেষে মুসা। ছায়াঢাকা, প্রায় অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে ছুটল তিনজনে। আঁকাবাঁকা অচেনা পথ। কখনও সামনে পড়ছে গাছের নিচু ডাল, কখনও ঝোপঝাড়, কখনও কাঁটাঝাড়। ওগুলো এড়িয়ে চলতে গিয়ে নানা রকম কসরৎ করতে হচ্ছে।

সামনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে আসছে। হুড়মুড় করে ঝোপে ঢুকে পড়ল কেউ। থামল না গোয়েন্দারা। বন এক জায়গায় সামান্য হালকা, ওখানে এসে কিশোরের নজরে পড়ল, গাছের আড়ালে ঢুকে গেল গাঢ় বাদামী ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার আর সবুজ সোয়েটার পরা লম্বা একটা দেহ। বড় বড় গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল।

'ডাইনী না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'তবে ছুটতে পারে বটে!'

মুসা ডাইনীর ভয়েই এগোচ্ছে না, নইলে হয়তো কাছাকাছি চলে যেতে পারত মানুষটার, কিন্তু কিশোর আর রবিন ওর সঙ্গে পারছে না। আচমকা বাঁয়ে মোড় নিয়ে রাস্তা থেকে সরে ঘন বনে ঢুকে পড়ল সে। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, বনে চলতে অভ্যস্ত।

'চোখের আড়াল কোরো না!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'পাহাড়ের কাছে গিয়ে কোণঠাসা করব ওকে!'

কিন্তু গর্তের মত উপত্যকার গাছে ছাওয়া ঢালের কাছে পৌঁছেও থামল না মানুষটা। গাছের শেকড়, ডাল, আর গোড়া ধরে ধরে দ্রুত উঠে চলল ঢাল বেয়ে।

কিন্তু অভ্যাস না থাকায় ওই পথে অত তাড়াতাড়ি উঠতে পারল না গোয়েন্দারা। দূরত্ব বাড়ছে ক্রমেই।

দেয়ালের নিচের অর্ধেকটায় গাছপালা আছে, তার ওপরে ফাঁকা, শুধু পাথর আর পাথর। ওখানে পৌঁছে খোলা জায়গায় বেরোতে হলো লোকটাকে। গায়ে রোদ পড়ল। থামল না সে। কোণাকোণি চলে, পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে হারিয়ে গেল গর্তের ওপরে উঠে।

খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে আর পারল না গোয়েন্দারা। পাথরের ওপর বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

'শুনেছি, ঝাড়ুর ডাণ্ডাকে হাউই বাজি বানিয়ে তাতে বসে উড়ে চলে ডাইনীরা,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল রবিন, 'কিন্তু এ-কি! এ তো পা-কেই হাউই বানিয়ে ফেলেছে!'

গলা থেকে দূরবীন খুলে নিল কিশোর। চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল গর্তের কিনারে উঠে লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেখানটা। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। শেষে ব্ল্যাক হোলোর নিচের দিকে দূরবীনের চোখ নামাল।

'কিছু দেখছ?' জানতে চাইল মুসা।

'প্রচুর গাছপালা, আর কিছু না।'

একপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে আরেক প্রান্তে নজর সরাচ্ছে কিশোর। ছোট্ট একটু খোলা জায়গার ওপর চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল হাত।

'দেখেছ মনে হচ্ছে কিছু?' প্রশ্নটা করল এবার রবিন।

তার হাতে দূরবীন তুলে দিল কিশোর। যেদিকে খোলা জায়গাটা আছে নীরবে সেদিকে হাত তুলে দেখাল।

প্রথমে শুধু গাছ চোখে পড়ল রবিনের। 'কই, কিছু তো দেখছি না।'

'গর্তের দেয়ালের গোড়ায় দেখো।'

রবিনও দেখতে পেল। শুরুতে যেগুলোকে কেবল পাথর মনে হয়েছিল, সেগুলোকেই এখন অন্য রকম লাগল, মনে হচ্ছে কাঠ আর পাথরকে যত্ন করে সাজিয়েছে কেউ। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'আরি, এ তো ঘর! দরজাও দেখতে পাচ্ছি! এমন করে ক্যামোফ্লেজ করে রেখেছে, যাতে নজরে না পড়ে।'

রবিনের হাত থেকে দূরবীনটা প্রায় কেড়ে নিল মুসা। দেখে বলল, 'ওরকম বাড়িতে কে বাস করে, বলো তো? ওই ডাইনীমুখো লোকটা?'

'হতে পারে। যে-ই করুক, ক্যাপ্টেন রিচটনের খবর হয়তো জানাতে পারবে আমাদের। কিশোর, যাবে নাকি?'

'চলো।'

'আবার নামা!' আঁতকে উঠল মুসা, 'এই পথে নামতে গেলে এবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে!'

'তুমি কি ভেবেছিলে চিরকালই থাকব আমরা এখানে?' হেসে বলল কিশোর।

ততক্ষণে নামতে শুরু করে দিয়েছে রবিন, পাহাড়ে চড়ায় অন্য দু-জনের চেয়ে দক্ষ সে।

নিচে নেমে পায়েচলা পথটা আবার খুঁজে বের করল ওরা।

আধঘন্টা পর বন থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গাটুকুতে। হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল কিশোর। এত কাছে থেকেও রহস্যময় ছোট্ট বাড়িটাকে চেনা কঠিন। আগে থেকে না জানা থাকলে হয়তো চোখেই পড়ত না, অথচ রয়েছে মাত্র দশ-বারো গজ তফাতে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ওরা। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি ঘর। জানালা নেই, সামনের দিকে কেবল একটা দরজা। কাউকে চোখে পড়ল না। পা টিপে টিপে বাড়িটার দিকে এগোতে শুরু করল কিশোর, পেছনে দুই সহকারী। সামনের খোলা চত্বরটুকু পেরিয়ে এসে কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াল সে। একমুহূর্ত দ্বিধা করে টোকা দিল দরজায়।

বার বার টোকা দিয়েও সাড়া মিলল না।

মুসা বলল, 'ভেতরে কিছু নড়েছে মনে হলো।'

সরে গিয়ে এককোণ থেকে উঁকি দিল সে। কাউকে দেখতে পেল না। বাড়িটার গঠন দেখে অবাক হলো। আরেক পাশে সরে গিয়ে অন্য কোণ থেকে তাকাল। কাঠ আর পাথর দিয়ে তিনদিকে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। বাকি একদিকের বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পাথরের দেয়ালটাকে। একধারে একটা খোঁয়াড়, ভেড়া রাখা হত বোধহয়, এখন শূন্য। একটা জানোয়ারও নেই।

'দেখলে কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। কেউ নেই।'

'তাহলে নড়ল কি?'

'কি জানি!'

বাড়িটার গঠন কিশোর আর রবিনও দেখল। রবিন বলল, 'আরেকটা দেয়াল বানাতে কি এমন কষ্ট হত? আলসে নাকি লোকটা? নাকি কোন কারণ আছে এ ভাবে বানানোর?'

'একটা কারণ হতে পারে, ক্যামোফ্লেজ,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'এভাবে তৈরি করাতে দেয়ালের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে, সহজে চোখে পড়ে না।'

'হুঁ। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, তারচেয়ে চলো বাড়িটা কার জানার চেষ্টা করি। ব্ল্যাক হোলোর মালিক কে, সেটা জানাও বোধহয়

জরুরী।'

'বেরিয়েছি কিন্তু রিচটনকে খুঁজতে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'এই বাড়ির মালিক, কিংবা যে লোকটা আমাদের ওপর চোখ রাখছিল, তার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের নিখোঁজ হওয়ার কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। একটা ব্যাপারে এখন শিওর হয়ে গেছি আমরা, এখানে, এই গর্তের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে তাঁর। শেরিফকে জানাতে হবে খবরটা।'

একঘণ্টা জোরকদমে চলার পর গর্তের উল্টোধারের দেয়ালের ওপরে এসে উঠল ওরা আবার, রিচটনের কেবিনের কাছে। একবাক্স বিস্কুট আর তিনটে আপেল বের করে নিল মুসা। ইতিমধ্যে ছোট্ট একটা নোট লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখল কিশোর, ক্যাপ্টেন ফিরে এলে দেখতে পাবেন; জানবেন, ওরা এসেছে।

আবার এসে গাড়িতে উঠল ওরা। ফরেস্টবার্গে শেরিফের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

পাঁচ

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। ভারগনদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল সামনের চত্বরে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে পটি।

'ওর কুত্তাটা খোঁজার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা।'

রবিন বলল, 'যাবে আর কোথায়, হয়তো ফেরত চলে এসেছে।'

'আমার মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'এলে ওভাবে মন খারাপ করে বসে থাকত না। কুকুরটাও থাকত তার সঙ্গে।'

'বাকি কুত্তাগুলোর ব্যাপারে কি মনে হয় তোমার? হারিয়েছে যে বলল মিসেস ভারগন? কোনও পশু চোরের কাজ?'

'চোরটা কে, জানি আমি,' জবাব দিল মুসা। 'সেই ডাইনী।'

রবিন ভেবেছিল, উড়িয়ে দেবে কিশোর, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'আমার ধারণা, ডাইনী আর কুকুর-নিখোঁজ রহস্যের মধ্যে যোগাযোগ আছে। ক্যাপ্টেনও এটা সন্দেহ করেছেন। নইলে ক্যালেন্ডারে লিখে রাখতেন না।'

কিশোরের কথায় মুসাও অবাক, 'ডাইনী আছে তুমি বিশ্বাস করো?'

'না।'

'আমিও না,' রবিন বলল। 'তবে এখানকার লোকে যে করে তাতে সন্দেহ নেই। করার কারণ, পেনসিলভানিয়া ডাচেরা আসলে ডাচ নয়, জার্মান। দু-তিনশো বছর আগে ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যে দেশ ছেড়ে এসে বসতি করেছিল এখানে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ডাইনী, রক্তচোষা ভূত, জাদুমন্ত্র এসবের গল্প। ওদের অনেকেই এখনও এসব উদ্ভট গল্প সত্যি বলে

মানে, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ওসব আছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'মিসেস ভারগনও তো করে।'

'ডাইনীর গল্প অবশ্য আরও অনেক দেশে আছে। নিউ ইংল্যান্ডের পিউয়ারিটনরাও বিশ্বাস করে ডাইনী আছে।'

চুপ করে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অ্যাঁ!···হ্যাঁ। রবিন, তোমার কি মনে হয়নি, কুত্তা চুরি করে কেউ ডাইনীর এই কিংবদন্তীটাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে?'

'করতে পারে। তবে কেন করবে এই কাজ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

সরু একটা পথ চলে গেছে ফরেস্টবার্গের দিকে। আশেপাশে বসতি খুব কম। প্রায় দুই ঘণ্টা একটানা চলার পর পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে একটা চৌরাস্তা পড়ল। অন্য যে পথটা আড়াআড়ি কেটে চলে গেছে মূল রাস্তাটাকে, তার একটা প্রান্ত উঁচু হয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে, অন্য প্রান্তটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা পার্বত্য নদীর দিকে। নেমে যাওয়া দিকটার দু-দিকে অনেকগুলো কাঠের তৈরি বাড়িঘর চোখে পড়ল। পুরানো একটা জাঁতাকলও আছে।

ম্যাপ দেখে কিশোর বলল, 'ওটাই ফরেস্টবার্গ। ঘোরো।'

গাড়ি ঘোরাল মুসা।

'আগের দিনে ওটা দিয়ে গম ভাঙাত লোকে,' জাঁতাটা দেখিয়ে রবিন বলল। 'তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না, নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে ওটা ঘোরানো হত।'

একটা বাড়ির ডিসপ্লে উইন্ডোতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে: অ্যাংগা'স জেনারেল স্টোর। আকৃষ্ট করল মুসাকে। ছাউনি দেয়া বারান্দায় পড়ে আছে দড়ির বান্ডিল, হাতুড়ি-বাটাল, খন্তা-কুড়াল জাতীয় যন্ত্রপাতি, আর গম-আটার বস্তা।

'আমি ঢুকব ওখানে,' ঘোষণা করল সে। 'গোয়েন্দাগিরিতে অনেক পরিশ্রম, অনেক ক্যালোরি খরচ হয়, ঠিকমত না খেলে শরীর টিকবে না।'

হেসে ফেলল রবিন। মুসা দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে গেলে সে বসল ড্রাইভিং সীটে। ড্রাইভ কিশোরও করতে পারে, কিন্তু গাড়ি চালাতে ভাল লাগে না তার। ছুটন্ত গাড়িতে আরাম করে বসে দু-ধারের দৃশ্য দেখাই তার বেশি পছন্দ।

কেনাকাটা করার জন্যে মুসাকে রেখে কাউন্টি কোর্টহাউসে রওনা হলো অন্য দু-জন। সাদা একটা কাঠের বাড়ি, সামনে ছড়ানো বারান্দার ওপরে কাঠের খুঁটি দিয়ে ধরে রাখা চালা।

কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে ঢোকার আগে দরজায় থাবা দিতে গেল কিশোর। কিন্তু পাল্লাটা খোলা, চাপ লাগতেই ফাঁক হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকল সে আর রবিন। বিশাল, পুরানো আমলের একটা রোল-টপ ডেস্ক রয়েছে ঘরে, ওটার খোপগুলোতে ঠেসে ভরা রাখা হয়েছে দলিলপত্র। টেবিলের

ওপরেও গাদা গাদা কাগজ, বড় বড় পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া।

কেউ নেই ঘরটায়। ওপাশের দরজাটার কাছে এসে সবে টোকা দিতে যাবে কিশোর, এই সময় খুলে গেল ওটা। বেরিয়ে এল চশমা পরা এক মধ্যবয়েসী মহিলা। 'কি চাই? ক্লার্ক মিস্টার রেনসন বাইরে গেছেন। আমাকে দিয়ে কোন সাহায্য হবে?'

'ব্ল্যাক হোলোতে ক্যাম্পিং করতে যেতে চাই আমরা,' জবাব দিল কিশোর। 'জায়গাটার মালিক কে জানতে পারলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিতাম।'

বহুবছর ধরে মহিলা এই এলাকার বাসিন্দা, এক অফিসে কাজ করতে করতে অনেক কিছু মুখস্থ হয়ে গেছে। ফাইল কিংবা রেজিস্টার দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। জবাব দিয়ে দিল, 'পুরো উপত্যকাটারই মালিক আরিগনরা। যদ্দূর জানি, এখনও যারা বেঁচে আছে, সবাই যার যার মত অন্য জায়গায় চলে গেছে। ওদের কেউ ওখানে এখন বাস করে কিনা বলতে পারব না।'

আরিগন নামটা নোটবুকে টুকে নিল রবিন।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দু-জনে।

শেরিফের অফিসের দরজায় গিয়ে টোকা দিল কিশোর।

ভেতর থেকে ভারি গলায় ডাক শোনা গেল, 'আসুন।'

খাটো, ভারি শরীর, ধূসর রঙের পুরু গোঁফওয়ালা একজন মানুষ টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ওয়েস্টকোটের বোতাম খোলা, বলিষ্ঠ বাহুর ওপরে গুটিয়ে রাখা শার্টের হাতা। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে তাঁকে। স্যুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে ডেস্কের ওপর দিয়ে তাকালেন ছেলেদের দিকে।

দ্রুত নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। শেরিফের নাম জানতে পারল, টোনার।

'কি দরকার?' জানতে চাইলেন শেরিফ।

সংক্ষেপে ক্যাপ্টেন রিচটনের নিখোঁজ সংবাদ জানাল কিশোর। তাঁর যে খারাপ কিছু হয়েছে, এই সন্দেহের কথাও বলল।

ভুরু কুঁচকে নীরবে সব শুনলেন শেরিফ। কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে কি করতে বলো?'

'ব্ল্যাক হোলোতে গিয়ে খুঁজে দেখার জন্যে যদি কাউকে পাঠাতেন...'

মাথা নাড়লেন শেরিফ, 'সম্ভব না। আজ তো নয়ই, কালও পারব কিনা জানি না। আমার সমস্ত লোক এখন হাইজ্যাকারদের পেছনে ব্যস্ত। ইন্টারস্টেট ট্রাক থেকে মাল হাইজ্যাক হয়ে গেছে। ক'দিন ধরেই উৎপাত করছে খুব, মাঝে মাঝেই মালবাহী গাড়ির ওপর চড়াও হয়ে লুটপাট চালাচ্ছে। ব্যাটাদের ধরতেই হবে।'

'কিন্তু স্যার, মিস্টার রিচটনের ব্যাপারটাও কম জরুরী না,' আবার বলল কিশোর। 'দেরি হলে আরও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তাঁর। প্রাণের ওপরও

আঘাত আসতে পারে।'

'শোনো,' ভারিক্কি ভঙ্গিটা কোমল করার চেষ্টা করলেন শেরিফ, 'এত ভাবার কিছু নেই। এসব এলাকায় মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যায় লোকে। বেড়াতে বেরোয়, ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় বহুদূরে, আবার একদিন ফিরে আসে। ক্যাপ্টেনও হয়তো তাই করছেন। শুধু সন্দেহের বশে আমার লোকদের জরুরী কাজ থেকে সরিয়ে আনতে পারি না, কোন প্রমাণ নেই···'

'আছে স্যার, প্রমাণ আছে,' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'তাঁর ভাঙা টর্চটা আমরা পেয়েছি। গুলির খোসা, পাতায় রক্ত, শার্টের ছেঁড়া কাপড়···এসবকে কি প্রমাণ বলবেন না?'

চুপ করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এত কিছু পেয়েছ! তাহলে তো সিরিয়াস ব্যাপারই মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও···' অসহায় ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, 'আজ লোক দেয়া সম্ভব নয়। কাল একটা সার্চ পার্টি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, তবে কথা দিতে পারছি না।'

'এখানে আর এমন কেউ কি আছে, যে আমাদের খুঁজতে সাহায্য করতে পারে?' জানতে চাইল কিশোর।

সামনের রিপোর্ট পড়তে শুরু করে দিয়েছেন ততক্ষণে শেরিফ, কিশোরের কথায় চোখ তুলে তাকালেন, 'মিস্টার আরিগনের কথা ভাবছি। ওই হোলোতে বাস করে। ওখানকার প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি পাথর তার চেনা। জন্মের পর থেকে বাস করেছে ওই অঞ্চলে। তোমরা গিয়ে বললে খুশি হয়েই তোমাদের সাহায্য করবে। ওই রকমই মানুষ, সবাইকে সাহায্য করার জন্যে যেন তৈরি হয়েই থাকে। ভাল লোক।'

আরেকবার দৃষ্টি বিনিময় করল দুই গোয়েন্দা। আবার টোনারের দিকে তাকাল কিশোর। 'ওই উপত্যকাতেই থাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, সে-রকমই তো শুনেছি, একটা কেবিনে। আমি কখনও যাইনি। তোমরা গিয়ে খোঁজো, বের করে ফেলতে পারবে।'

কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। গাড়ি নিয়ে চলে এল জেনারেল স্টোরের সামনে। বাইরে অপেক্ষা করছে মুসা। পায়ের কাছে নানারকম প্যাকেট, টিন আর বোতলের স্তূপ। পারলে পুরো দোকানের সব খাবারই যেন কিনে ফেলত। গাড়িতে উঠেই বলল, 'আগে কোথাও গাড়ি রেখে খেয়ে নেব।···তো, কি জেনে এলে তোমরা?'

ভোঁতা গলায় জানাল রবিন, 'শেরিফ সাংঘাতিক ব্যস্ত। মনে হচ্ছে আমাদেরই সব করতে হবে। কিশোর, মিস্টার সাইমনের সাহায্য চাইব?'

'মন্দ হয় না। সাহায্য না দিতে পারেন, পরামর্শ হয়তো দিতে পারবেন।'

'টেলিফোনে কথা বলতে চাও তো? সে আশা বাদ রাখো,' মুসা বলল। 'দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজারই করেছি শুধু ভেব না, গোয়েন্দাগিরিও করেছি। এই শহরের অনেক কথা জেনেছি। জানো, সবচেয়ে বেশি

আলোচনা হয় এখানে কাকে নিয়ে? মিসেস অ্যাংগা, জেনারেল স্টোরের মালিকের স্ত্রী। বেশি বকর বকর করে কে? মিসেস অ্যাংগা। টেলিফোন অপারেটর কে জানো? মিসেস অ্যাংগা। এখান থেকে টেলিফোনে যত গোপন কথাই বলো সেটা আর গোপন থাকবে না, চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়বে সারা শহরে।'

'হুঁ, বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'রবিন ঠিকই বলেছে, যা করার সব আমাদের করতে হবে। শেরিফ বলেছেন, কাল সকালে সার্চ পার্টি পাঠানোর চেষ্টা করবেন। যদি না পাঠান, মিস্টার আরিগনকে খুঁজে বের করব আমরা। তাঁর সাহায্য চাইব।'

'আচ্ছা,' রবিন বলল, 'গর্তের নিচের ওই আজব ঘরটাতে থাকেন না তো তিনি?'

'থাকতে পারেন। আর কোন বাড়ি তো চোখে পড়েনি ওখানে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। একটা কাফের সামনে এনে গাড়ি রাখল। বলল, 'টিনের খাবার পরেও খেতে পারব। রান্না করা কিছু খেয়ে নিই এখন।'

খাবার খুব ভাল কাফেটার। স্থানীয় পত্রিকাটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল কিশোর। আচমকা চিবানো বন্ধ হয়ে গেল তার। বলল, 'জন্তু-জানোয়ারের নিলাম হবে, সেখানে যাব আমরা।'

অবাক হলো রবিন, 'জানোয়ার নিলাম!'

'কোথায়?' মুসাও অবাক।

'পরের শহরে। এই যে, বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। আজকেই হবে, এবং আধঘণ্টার মধ্যেই।'

'কিন্তু ওখানে আমরা কি কিনতে যাব? গরুর মাংস, ভেড়ার মাংস দুটোই নিয়েছি, জ্যান্ত পশু আমাদের দরকার নেই।'

'আছে। কুকুর। ডাইনীর জন্যে ফাঁদ পাততে হলে কুকুরের টোপ দরকার। ক্যাপ্টেন রিচটনের কেবিনে নিয়ে যাব ওটাকে আমরা। কুত্তা চোর যদি থেকেই থাকে ওখানে, নিতে আসুক আমাদেরটা, তৈরি হয়ে বসে থাকব আমরা।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল রবিনের মুখে, 'ভাল বুদ্ধি করেছ!'

'চোরটা যদি সত্যি ডাইনী হয়?' মুসা খুশি হতে পারছে না। 'অহেতুক একটা জানোয়ারকে…'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'ভয় নেই, পাহারায় থাকব আমরা। কুকুরটার ক্ষতি করতে দেব না ডাইনীকে। বরং ডাইনী ধরার চেষ্টা করব।' হেসে রসিকতার সুরে বলল, 'একটা ডাইনীকে যদি ধরে নিয়ে যেতে পারি আমরা, ভাবতে পারো কি ঘটবে? ওটা শো করার ব্যবস্থা করব। টিকেট বেচেই বড়লোক হয়ে যাব আমরা।'

খাওয়া শেষ হলো। কয়েক মিনিট পর আবার গাড়িতে এসে উঠল ওরা।

ম্যাপ দেখে রাস্তা বলে দিতে লাগল কিশোর। শহর ছাড়িয়ে আসতে খুব

খারাপ হয়ে গেল পথ। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে।

'খাইছে!' শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে মুসা, 'কবে বানিয়েছিল এই রাস্তা! আমার তো বিশ্বাস, সেই ওয়াইল্ড ওয়েস্টের যুগে, ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া যখন আর কিছু চলত না।'

একেই খারাপ, তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তার অবস্থা আরও করুণ হয়ে আছে। মাটি গলে সরে গিয়ে নিচের পাথর বেরিয়ে পড়েছে। টায়ারে নিষ্ঠুর আঘাত হেনে চলেছে ওগুলো।

চুলের কাঁটার মত অনেকগুলো তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়ার পর আরেকটা বাঁকের কাছে এসে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল:

গতি কমান!
সামনে পুল
ভারি গাড়ি নিষিদ্ধ

মোড় পেরোলে কাঠের ব্রিজটা চোখে পড়ল। দু-পাশে লোহার রেলিঙ আছে বটে, তবে এতই হালকা, কোন গাড়ির পতন রোধ করতে পারবে না ওগুলো। নিচে তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদীর স্রোত।

বোকামি করে বসল মুসা। ভাবল, পেরিয়ে যেতে পারবে, কিশোর বাধা দেয়ার আগেই গাড়ি তুলে দিল ব্রিজে। অর্ধেক যেতে না যেতেই মড়মড় করে উঠল নিচের তক্তা, গাড়িটার ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ছে।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'থেমো না, থেমো না, চালিয়ে যাও!'

ছয়

চমকে গিয়ে ব্রেক চেপে ফেলছিল মুসা, কিশোরের চিৎকারে সেটা ছেড়ে দিয়ে আরও জোরে চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। লাফ দিয়ে এগোতে গেল ভারি গাড়িটা। পারল না, পেছনের অংশ বসে যাচ্ছে।

'পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে!' বলে পেছনের সীটে বসা রবিন চেঁচাতে শুরু করল।

অ্যাক্সিলারেটর ছাড়ল না মুসা। ভীষণ গোঁ গোঁ শুরু করল ইঞ্জিন। পড়ে যাবেই, আর বাঁচানো গেল না!—যখন ভাবছে সে, এই সময় সামনের কাঠে কামড় বসাল টায়ার। টেনে তুলল গাড়ির পেছনের অংশটাকে। নিরাপদে টেনে আনল ব্রিজের অন্যপ্রান্তে, রাস্তার ওপর।

কখন যে অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দিল মুসা, বলতে পারবে না। ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। কেয়ার করল না সে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'বেঁচেছি, উফ্!' থরথর করে কাঁপছে সে।

কাঁপছে অন্য দু-জনও।

ব্রিজের কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে নেমে এল তিনজনে।

মাঝখানের দুটো তক্তা ঝুলে আছে নিচের কালো পানির দিকে, আরেকটা গায়েব।

'কোন গাড়ি উঠলেই এখন মরবে,' গম্ভীর স্বরে কিশোর বলল। 'সাবধান করার ব্যবস্থা করা দরকার।'

'কি করে করব?' রবিনের প্রশ্ন।

লোহার কাঠামোতে পা রেখে আর রেলিঙ ধরে প্রায় ঝুলে ঝুলে আবার অন্যপাশে চলে এল ওরা। পাহাড় থেকে শুকনো ডাল এনে পথের ওপর বিছিয়ে, তার সামনে বড় বড় পাথর রেখে দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করল। এপাশটাতেও একই ভাবে প্রতিবন্ধক তৈরি করে দিল।

আবার গাড়িতে ওঠার পর রবিন বলল, 'একটা ফোন পেলেই রিপোর্ট করতে হবে।'

বনে ঢাকা পাহাড়ের ঢালের নিচ দিয়ে প্রায় মাইলখানেক এগোনোর পর পথের ধারে একটা খামারবাড়ি চোখে পড়ল। নেমে গেল তিন গোয়েন্দা। লেটার বক্সে নাম লেখা: হুফার কট। দরজা খুলে দিলেন বাড়ির মালিক, সবে খেতে বসেছিলেন, ঘণ্টা শুনে উঠে এসেছেন। খবরটা শুনে ফোনের দিকে দৌড় দিলেন তিনি।

মিসেস কট বললেন, 'ওখানে বহুবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পথের মোড়টার জন্যেই এমন হয়। একবার একটা গাড়ি স্পীড না কমিয়েই উঠে পড়েছিল ব্রিজে, আর সামলাতে পারেনি, রেলিঙ ভেঙে পড়ে গিয়েছিল, একজনও বাঁচেনি। তোমাদের ভাগ্য খুব ভাল, বেঁচে এসেছ!...এসো না, বসে যাও আমাদের সঙ্গে, খাও।'

খুব ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করল কিশোর। বলল, ওরা খেয়ে এসেছে, তা ছাড়া পাশের শহরে নিলাম দেখতে যাচ্ছে। দেরি করলে গিয়ে আর পাবে না।

কটদেরকে গুডবাই জানিয়ে ফিরে এসে গাড়িতে উঠল ওরা।

পনেরো মিনিট পর সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল। তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কোন দিকে যেতে হবে। বড় বড় অক্ষরে লেখা:

পশু নিলাম

একশো গজ সামনে

বেশ কয়েকটা লাল রঙ করা বাড়ি আর খোঁয়াড়ের সামনে পার্কিঙের জায়গা। ওখানে গাড়ি রাখল মুসা। তিনজনেই নেমে এগোল উঁচু ছাতওয়ালা একটা বাড়িতে। সারি সারি বেঞ্চ রাখা। অনেক লোক বসে আছে ওগুলোতে। সামনের কাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েস্টকোট পরা একজন রোগা টিংটিঙে লোক, শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক ভারি কণ্ঠে একটা বাদামী-সাদা বাছুরের গুণগান করছে। বাছুরটাকে ধরে রেখেছে তার সহকারী।

'এটা বড় জানোয়ারের জায়গা,' কিশোর বলল। 'কুকুর অন্য কোন ঘরে।'

আবার বেরোনোর দরজার দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। হঠাৎ

কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন। একটা বেঞ্চে চাষীদের মাঝখানে বসে আছে লম্বা এক লোক। সতর্ক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পুরু গোঁফ। চওড়া কানাওয়ালা একটা হ্যাট মাথায়। গায়ে সুন্দর ছাঁটের স্পোর্টস জ্যাকেট।

'চিনতে পারো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা ও কিশোর। চেনাই লাগছে।

হঠাৎ লম্বা মানুষটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরে গেল ওদের দিকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তিনজনেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে এল।

'কর্নেল হুমবার মত লাগল না?' রবিন বলল। 'এখানে কি করছে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

লম্বা, সরু একটা ঘরের ভেতর থেকে বিচিত্র কোলাহল আসছে। মুসা বলল, 'কুকুর ওটাতে।'

ঢুকল ওরা। মুরগি, কুকুর, শুয়োর, ভেড়া, ছাগল, খরগোশের খাঁচায় বোঝাই এ ঘরটা। ঘরের শেষ মাথায় রয়েছে কুকুরের খাঁচা। বেশির ভাগ কুকুরই দেখা গেল শ্রমিক কিংবা শিকারী জাতের। পশু খেদানোর 'কোলি' কুকুরগুলোর পাশ কাটিয়ে এল মুসা, এগোল লম্বা কান, কোমল, আকর্ষণীয় চোখওয়ালা হাউন্ডগুলোর দিকে।

'হাউন্ডই আমার পছন্দ,' বলল সে। পছন্দ করতে শুরু করল, 'কোনটা নেব? কুন হাউন্ড? উঁহুঁ, বেশি বড়। ব্লাড হাউন্ড? বেশি গোমড়া। ব্যাসিট? মোটুকরাম, পা এত খাটো, মনে হয় জন্মদোষ।'

'সবারই তো এ দোষ না সে-দোষ,' মুচকি হেসে বলল রবিন। 'তাহলে নেবেটা কি?'

শোনার অবস্থা নেই মুসার। কোণের দিকে হাত তুলে বলল, 'চলো তো ওগুলো দেখি?'

এগারো-বারো বছরের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ছয়টা নাদুসনুদুস বাচ্চা ঘুরঘুর করছে তার পায়ের কাছে।

'বাহ্, বিগল্‌স্,' চওড়া কাঁধ, সেই তুলনায় খাটো পা আর চোখা লেজওয়ালা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল মুসা। হঠাৎ একটা বাচ্চা লাফাতে লাফাতে ছুটে এল তার কাছে। তার পায়ে গা ঘষতে লাগল। নিচু হয়ে হাত বাড়াতেই লম্বা জিভ বের করে তার হাত চেটে দিল।

বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে হাসিমুখে বলল সে, 'এটাই নেব।'

ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কত?'

'দশ ডলার।'

'নিলাম।' মানিব্যাগ বের করল কিশোর।

আবার তার বাহুতে হাত রাখল রবিন। তাকানোর ইঙ্গিত করল। ভেড়ার খাঁচার সামনে দেখা গেল সেই লোকটাকে, কর্নেল হুমবা। একটা ভেড়া দামদর করছে।

'তোমাদের সঙ্গে এসেছে?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করল।

'না,' জবাব দিল রবিন। 'তবে চিনি।'

'ওটা নিলে ঠকবে। এত বুড়োর বুড়ো, দাঁড়াতেই পারে না। এই পশু দিয়ে কি করবে?'

'আমিও তো সে-কথাই ভাবছি,' বিড়বিড় করল কিশোর। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'ভেড়া কিনতে এল কেন হুমবা? পুমাকে খাওয়াবে?'

গাড়িতে উঠল ওরা। থরথর করে কাঁপছে কুকুরের বাচ্চাটা। রবিনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'সেরে যাবে। এই প্রথম ভাইবোনদের কাছ থেকে সরে এল তো, ভয় পাচ্ছে।' কোলে নিয়ে ওটাকে আদর করল সে।

গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসল এবার রবিন। 'কিশোর, কেবিনে ফিরে যাব?'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি চালাল রবিন। কাঁচা এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা ধরে কয়েক মাইল এগোনোর পর খেয়াল করল ব্যাপারটা, 'আরি, গাধা নাকি! এই রাস্তা দিয়ে চলেছি কেন? ব্রিজ না ভাঙা?'

অন্যমনস্ক হয়ে ছিল কিশোর। চমকে গিয়ে বলল, 'তাই তো! আমিও খেয়াল করিনি!'

আর মুসা তো কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়েই ব্যস্ত, রাস্তার দিকে তাকায়ইনি সে।

কয়েক মিনিট ধরে ম্যাপ দেখল কিশোর। বলল, 'আবার ফিরে যেতে হবে। যেখানে নিলাম হচ্ছে সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা গেছে ব্ল্যাক হোলোর দিকে। চলো।'

'দূর, গাধার মত কাজ করলাম!'

নতুন রাস্তাটা আগেরটার মত অত খারাপ না। প্রায় সাতটা বাজে। এখনও সূর্য আছে, কিন্তু বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বেশ আরাম। রাস্তায় যানবাহনের ভিড়। বেশ কিছু গাড়ি কেবল একটা দিকেই চলেছে।

'যাচ্ছে কোথায় ওরা?' কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল রবিন। 'প্রতিটি গাড়িতেই তো মনে হচ্ছে ফুল ফ্যামিলি। সেজেগুজে বেরিয়েছে।'

মোড় নিতেই কিশোর বলল, 'ওই যে তোমার জবাব।'

বাতাসে ভেসে এল মিউজিক। আরও এগোতে চোখে পড়ল সারি সারি তাঁবু। হ্যারিজ কার্নিভাল নতুন জায়গায় খেলা দেখাতে এসেছে।

'ভাল,' খুশি হয়ে বলল মুসা, 'থামব এখানে। আবার পপকর্ন আর পানাট খেতে ইচ্ছে করছে।'

'থামো!'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'তোমারও ওসব খেতে ইচ্ছে করছে!'

'না। পুমার খেলা আবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

রবিন বুঝে গেল, খেলা দেখাটা আসল ব্যাপার নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিশোরের। কিছু জিজ্ঞেস করল না। গাড়ি রাখল পার্কিঙের জায়গায়। তিনজনে নেমে এগোল পুমার তাঁবুর দিকে। দলে এখন আরও একজন আছে, মুসার বাহুতে গুটিসুটি হয়ে থাকা কুকুরের বাচ্চাটা।

'যাচ্ছি তো,' বলল মুসা, 'কিন্তু খেলা দেখাবে কে? হুমবাকে তো দেখে এলাম নিলামের জায়গায়।'

'এতক্ষণে নিশ্চয় চলে এসেছে,' রবিন বলল। 'উল্টো দিকে গিয়ে সময় নষ্ট করলাম না আমরা।'

চলে তো এসেছেই, তিন গোয়েন্দা যখন তাঁবুতে ঢুকল, দেখল খেলাও আরম্ভ হয়ে গেছে। আগের বারের মতই টাইট পোশাক পরেছে হুমবা। সাদা খেলা দেখানোর পোশাকে কিছুটা অন্য রকম লাগছে তাকে, একটু আগে নিলামের জায়গায় যাকে দেখে এল ওরা, তার চেয়ে যেন সামান্য আলাদা। কঠিন শাসনে রেখেছে ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলোকে। তেমনি ঘৃণা দেখা যাচ্ছে ওগুলোর চোখে।

খেলা শেষ হলে, দর্শকরা যখন বেরোনোর গেটের দিকে হুড়াহুড়ি করে এগোল, কিশোর তখন দুই সঙ্গীকে নিয়ে চলল পুমাগুলোকে কাছে থেকে দেখতে। অল্পবয়েসী জানোয়ার, তেল চকচকে শরীর, খাওয়ার কষ্ট পায় না বোঝা গেল।

আরেকটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে খাঁচার কাছে দাঁড়াল কর্নেল হুমবা।

'দারুণ জানোয়ার পোষেণ,' হেসে খাতির করার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কী খেতে দেন?'

'কাঁচা মাংস, কসাইয়ের দোকান থেকে আনা।' শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল কর্নেল, তবে কিছুটা অন্যমনস্ক, তাড়াহুড়ো করে সরে গেল ওখান থেকে।

'কিন্তু তাকে আমরা ভেড়া কিনতে দেখেছি!' ব্ল্যাক হোলোর দিকে আবার গাড়ি চালাতে চালাতে বলল রবিন। 'পুমাকে খাওয়াতে যদি কিনে থাকে, বলল না কেন?'

কেবিনে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। সূর্য ডুবে গেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার, কিন্তু আকাশ এখনও পুরোপুরি কালো হয়নি, কেমন একধরনের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে।

ছেলেরা আশা করল, এইবার কেবিনে ঢুকে গৃহকর্তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু নীরব হয়ে রইল বাড়িটা। কেউ বেরিয়ে এল না ওদের স্বাগত জানাতে। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর তার নোটটা পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। ফেরেননি ক্যাপ্টেন রিচটন।

'হলো কি তাঁর?' উদ্বেগে ফেটে পড়ল রবিন, 'খুঁজে বের করতেই হবে, যত জলদি পারা যায়!'

হঠাৎ হাত তুলল কিশোর, 'শোনো, গাড়ি!'

ক্যাপ্টেন এসেছেন মনে করে দরজার কাছে দৌড়ে এল ছেলেরা। খোলা জায়গায় ঢুকেছে গাড়িটা, সব আলো নেভানো, কেবল পার্কিং লাইট জ্বলছে। মোটাসোটা, খাটো একজন মানুষ নামল। পরনে বিজনেস স্যুট। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে গটমট করে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

'রিচটন কোথায়?' খসখসে কণ্ঠস্বর, অধৈর্য ভাবভঙ্গি।

'তিনি নেই,' জবাব দিল কিশোর।

'নেই? কোথায় গেছে?'

'জানি না। এলে কিছু বলতে হবে?'

'আমি টাকা পাই ওর কাছে। দেয় না কেন?'

'এলে বলব। আপনার নামটা?'

'অ্যাঁ?...হুগারফ। আর্নি হুগারফ। বললেই হবে ওকে, চিনবে। আমি ফরেস্টবার্গের অ্যাটর্নি।'

'অ্যাটর্নি?' এক পা এগোল কিশোর, 'মনে হয় আপনি জানবেন, মিস্টার হুগারফ; ব্ল্যাক হোলোর মালিকের নাম কি? আরিগান?'

'হ্যাঁ। একটা সামার কটেজ ছিল এখানে ওদের, আগুন লেগে ছাই হয়ে গেছে। চলে গেল সব। তারপর আর কোন হুগারফকে দেখিনি।'

'ডাইনীর গল্প আপনি বিশ্বাস করেন?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল কিশোর।

প্রশ্নটায় যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অ্যাটর্নি। তিনজনের ওপর ঘুরতে লাগল চোখ। তারপর বলল, 'কিসের ডাইনী! ওই গর্তটাই যত নষ্টের মূল। অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তোলে। ওই ধারটা তো কয়েক মাইল দূরে, কিন্তু ওখানে গিয়ে চিৎকার করলেও এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যাবে।'

'তাই নাকি! আচ্ছা, ক্যাপ্টেন রিচটন এলে আপনার কথা বলব।'

গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই মুসা বলল, 'লোকটাকে একবিন্দু পছন্দ হয়নি আমার। কেমন খটখট করে কথা বলে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমি এখনই পরীক্ষা করে দেখব। কয়েক মাইল দূর থেকে শোনা যায়, এ কথা বিশ্বাস হয় না আমার। গাড়ি নিয়ে হোলোর অন্যপাশে চলে যাচ্ছি। বাতাস এখন এদিকে বইছে। গিয়ে চিৎকার করব, দেখো, তোমরা শোনো কিনা। ওখানে পৌঁছে হেডলাইট জ্বেলে-নিভিয়ে সঙ্কেত দেব।'

বারান্দা থেকে নেমে গেল সে।

সাত

ব্ল্যাক হোলোর কিনারে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। অন্ধকার হয়ে গেছে। খানিক পর দেখতে পেল দুটো উজ্জ্বল আলো এগিয়ে যাচ্ছে গর্তের অন্য

প্রান্তের দিকে। প্রায় দুই মাইল দূরে।

'ওটাই কিশোর,' দূরবীন চোখে লাগাতে লাগাতে বলল রবিন। কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আলোটা। তারপর আবার দেখা গেল, জ্বলছে-নিভছে, জ্বলছে-নিভছে।

'আমাদের দিকে গাড়ি ঘুরিয়েছে কিশোর,' আবার বলল রবিন।

চিৎকার শোনার জন্যে কান খাড়া করে রাখল দু-জনে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করল। গাড়িটার দিক থেকে এসে গালে পরশ বোলাচ্ছে বাতাস, কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেল না। স্থির হয়ে গেল আলো দুটো, ঘুরল, তারপর আবার চলতে আরম্ভ করল। ফিরে আসছে কিশোর। .

কেবিনে ফিরে জানাল সে, 'গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছি। হর্নও বাজিয়েছি।'

'আমরা কিছুই শুনিনি,' রবিন বলল।

হ্যাজাক লাইট জ্বেলে রান্নার জোগাড় করছে মুসা।

টেবিলে কনুই রেখে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কই, তেমন কোন প্রতিধ্বনিই তো হয় না হোলোতে। তারমানে হুগারফ মিথ্যে কথা বলেছে। কেন?'

'কিছু ঢাকার চেষ্টা করছে না তো?' রবিনের প্রশ্ন। 'লুকাচ্ছে কিছু?'

'ক্যাপ্টেন রিচটন যে নিখোঁজ হয়েছে,' কাজ করতে করতে বলল মুসা, 'এ কথা কিন্তু জানে না।'

'বলা যায় না, ভানও হতে পারে তার। হয়তো এসেছিল আমরা কতখানি জানি, জানার জন্যে।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ডাইনীর চেয়েও রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে এখানে। ক্যাপ্টেনের ভাগ্যে খারাপ কিছুই ঘটেছে। কাল আবার খুঁজতে বেরোব।'

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে ওঠার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। তাই কুকুরটাকে টোপ হিসেবে বাইরে রেখে জেগে থাকার চিন্তাটা বাদ দিল সে-রাতের জন্যে। ঘুমানো দরকার।

কিন্তু ঘুম আসতে চাইল না। তিনজনেই কান পেতে আছে ডাইনীর চিৎকার শোনার আশায়। চোখ লেগে এসেছিল, মাঝরাতে তন্দ্রা টুটে গেল তীক্ষ্ণ চিৎকারে।

ব্ল্যাক হোলোর নিচ থেকে উঠে এল যেন চিৎকারটা, আগের দিনের চেয়ে অন্যরকম। লম্বা, তীক্ষ্ণ, কাঁপা কাঁপা। গোঙাতে শুরু করল বাচ্চাটা, কাঁপছে ভয়ে।

'আজকেরটা আরেক রকম কেন?' মুসার প্রশ্ন।

হঠাৎ হাসতে শুরু করল রবিন।

'এত হাসির কি হলো!' রেগে উঠল মুসা। 'দেখছ না, কুত্তাটাও ভয় পেয়েছে?'

'পাবেই তো,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'যে ডাকছে সে যে তার শত্রু। কুকুরের বাচ্চার অনেক শত্রু থাকে। ডাইনী নয় ওটা, বুঝলে, পেঁচার ডাক। অনেক বড় পেঁচা।'

'পেঁচা! ওরকম করে ডাকে নাকি?'

'ডাকে। অনেক জাতের পেঁচা আছে। একেকটার ডাক একেক রকম।'

বাংকে উঠে বসল মুসা। 'তোমার ধারণা এটা পেঁচার ডাক? আর কিছু না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'না আর কিছু না। তবে কাল রাতে যেটা ডেকেছিল সেটা পেঁচা ছিল না।' মুসাকে ভয় দেখানোর জন্যে বলল, 'পেঁচাকে কিন্তু অশুভ পাখি বলা হয়, ডাইনী আর ভূতের সঙ্গে নাকি সম্পর্ক আছে ওদের।'

'আহ্, রাত-বিরেতে ওসব অলক্ষুণে কথা বোলো না তো!'

এসব রসিকতার মধ্যে গেল না কিশোর, বলল, 'পেঁচা কিন্তু কুত্তা চুরি করতে পারে না, রবিন।...রাত দুপুরে ওসব আলোচনা থাক। এসো, ঘুমাই। কাল ভোরে উঠতে হবে।'

খুব ভোরে উঠল ওরা। কুয়াশা পড়ছে ঘন হয়ে। বিষণ্ন, ধূসর আলো। রোদের দেখা নেই। নাস্তা খাওয়া শেষ করে স্যান্ডউইচ বানাতে বসল মুসা। সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যাতে খিদের জন্যে কাজের অসুবিধে না হয়।

কিশোর অপেক্ষা করতে লাগল শেরিফের লোকের জন্যে।

ঘন্টাখানেক পর জোরাল বাতাস এসে হঠাৎ করেই সরিয়ে নিয়ে গেল কুয়াশা। রোদ উঠল। ঝলমল করে হেসে উঠল যেন প্রকৃতি। মুহূর্তে দূর করে দিল সমস্ত বিষণ্নতা।

'ওরা আসবে না,' বলল কিশোর। 'চলো, আমরা বেরিয়ে যাই। বসে থাকার মানে হয় না। আগে মিস্টার আরিগনকে খুঁজে বের করব।'

কেবিনের দরজা খোলা দেখে একছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল কুকুরের বাচ্চাটা, কিন্তু হ্যাঁচকা টান লেগে আটকে গেল। দড়ির একমাথা তার গলায় বাঁধা, আরেক মাথা মুসার হাতে ধরা। পিঠে বাঁধা একটা ব্যাগ। 'এই ফগ, জোরাজুরি করিসনে। ব্যথা পাবি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রবিন। 'ফগ? বাচ্চাটার নাম রাখলে নাকি?'

'হ্যাঁ, সকালে কুয়াশা দেখেই নামটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।'

'ভাল। বেশ ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে একটা ভাব আছে।'

কেবিনের পাশের খাড়া সেই পথটা ধরে আবার নিচে নামতে শুরু করল গোয়েন্দারা। আগের দিনের মতই নিথর, নীরব হয়ে আছে চারপাশের বন। ওর মধ্যে যাওয়ার ইচ্ছে এমনকি কুকুরটারও নেই, প্রজাপতি কিংবা ফড়িঙ খুঁজতেও নয়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। নিচু স্বরে বলল, 'কালকের মতই অনুভূতি হচ্ছে! মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে আমাদের!'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল তিনজনে। কিন্তু কিছুই শোনার নেই। আবার হাঁটতে লাগল ওরা। নিজেদের অজান্তেই যেন চলে এল সেই ঘরটার কাছে। দরজায় থাবা দিল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। দেখা দিল একজন লম্বা, চওড়া কাঁধ, ভারি ভুরু, পুরু গোঁফওয়ালা লোক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রবিনের, 'কর্নেল হুমবা!'

'কর্নেল?' ভারি কণ্ঠস্বর মানুষটার। 'জীবনেও কখনও আর্মিতে ছিলাম না, ওই র‍্যাঙ্ক পাব কি করে?'

'তারমানে,' তোতলাতে শুরু করল মুসা, 'আ-আপনি ব-বলতে চাইছেন, আপনি কর্নেল ডুম হুমবা নন? অ্যানিমেল ট্রেনার?'

'ভারি গলায় হাহ্ হাহ্ করে হাসলেন তিনি। 'ওসব কিছুই না আমি। আমি অতি সাধারণ ডোবার আরিগন।'

হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। সাধারণ পোশাকে আবার কিছুটা অন্যরকম লাগছে তাঁকে, ভেড়া কেনার সময় যেমন লেগেছিল। বলল, 'মিস্টার হুম···সরি, আরিগন, আপনাকেই খুঁজছি আমরা। ক্যাপ্টেন রিচটন নামে একজনের ওখানে বেড়াতে এসেছি, কিন্তু তাঁকেই পাচ্ছি না। দুই রাত ধরে তিনি নিখোঁজ।'

হাসিখুশি মুখটা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল আরিগনের। 'এসো, ভেতরে এসো।···কুত্তাটাকে আনার দরকার নেই, বাইরে রেখে এসো।'

ছোট একটা ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। পুরানো কয়েকটা চেয়ার আর একটা টেবিল আছে। আরিগন বললেন, 'দরজাটা খোলা রাখো, নইলে অন্ধকার লাগবে। তোমরা বসো, আমি আসছি।' মাথা নুইয়ে নিচু একটা দরজা দিয়ে ওপাশের রান্নাঘরে চলে গেলেন। বালতি নড়ার শব্দ হলো, দরজা বন্ধ হলো যেন একটা, তারপর ফিরে এলেন তিনি।

'হ্যাঁ, বলো এবার। ক্যাপ্টেন রিচটন কে, তার কি হয়েছে, সব শুনতে চাই।'

আগে নিজেদের পরিচয় দিল ছেলেরা। তারপর রবিন জানাল, 'তিনি আমাদের একজন বন্ধুর বন্ধু। আমরা চিঠি দিয়েছিলাম, আসছি। কিন্তু এসে দেখি তিনি নেই। একেবারে উধাও। এই হোলোতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। তাঁর ভাঙা টর্চটা পেয়েছি বনের মধ্যে, আর দুটো শটগানের গুলির খোসা। তিনিই ফায়ার করেছেন সম্ভবত।'

'হ্যাঁ,' আরিগন বললেন, 'সেদিন রাতে গুলির শব্দ শুনেছি। প্রথমে ভাবলাম কেউ শিকার করতে এসেছে। এখানে কেবল কুন শিকারের অনুমতি আছে, আর কুন শিকার করতে কুকুর সঙ্গে আনে শিকারীরা। কিন্তু কুকুরের ডাক শুনলাম না। তখন ভাবলাম চুরি করে হরিণ মারতে ঢুকেছে কেউ। নাহ্,

তোমাদের বন্ধুর কথা জানি না, কি হয়েছে বলতে পারছি না। সরি।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আরেকটা কথা কি বলতে পারবেন? এখানে নাকি কুত্তাও হারিয়ে যাচ্ছে। বনের মধ্যে কোনটাকে একা একা ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন?'

'না, দেখিনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন আরিগন। 'কুত্তা হারাচ্ছে, সেটা কুত্তা চোরের কাজ হতে পারে। এদিকে কুকুর বিক্রির একটা চোরাই মার্কেট আছে। ওখান থেকে কারা কেনে জানো, ডাক্তারের দালালেরা। কিছু কিছু ডাক্তার কুকুরকে গিনিপিগ বানিয়ে গবেষণা করে, বড়ই নিষ্ঠুর···অবলা জানোয়ারের ওপর এই অত্যাচার, ধরতে পারলে মজা দেখাতাম···'

'কাল একটা লোককে দেখলাম, আমাদের ওপর নজর রাখছে। একেবারে বুনো মনে হলো। পিছু নিয়েছিলাম, ধরতে পারলাম না, পালাল।'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি,' একটা আঙুল তুললেন আরিগন। 'ওর নাম পিচার। বোবা। আর লোক কোথায় দেখলে, বয়েস তো বেশি না। পাশের উপত্যকায় থাকে ওর বিধবা মায়ের সঙ্গে। জন্ম থেকে বোবা নয় সে, কানে শোনে, একটা দুর্ঘটনায় কণ্ঠনালীতে ব্যথা পেয়ে বাকশক্তি হারিয়েছে। সারাটা গরমকাল বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বুনো ফলমূল আর আশপাশের খামার থেকে চেয়েচিন্তে যা জোগাড় করতে পারে, খায়।'

'বিপজ্জনক?' প্রশ্ন করল মুসা, 'মানে, ওর কাছ থেকে বিপদের ভয় আছে?'

'আমি ওকে এড়িয়েই চলি। কিছু হলেই পাথর ছুঁড়ে মারে, হাতের নিশানা বড় সাংঘাতিক, বন্দুকের গুলিকেও হার মানায়। কুত্তাগুলোকে সে-ও নিয়ে যেতে পারে। জন্তু-জানোয়ার, পাখি, এসবে ওর ভীষণ আগ্রহ।'

'আশ্চর্য জায়গা! মানুষ এখানে বুনো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাতে ডাইনী এসে চিৎকার শুরু করে···অবাক কাণ্ড না?'

চোখের তারায় হাসি ফুটল আরিগনের। 'ডাইনী-ফাইনী আমি বিশ্বাস করি না। তবে রাতে চিৎকারটা ঠিকই শুনি। লোম খাড়া করে দেয়।'

রান্নাঘরে পুটপুট শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠলেন আরিগন, 'আমার কফির পানি পড়ে যাচ্ছে! এসো না তোমরা, রান্নাঘরেই চলে এসো।'

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে নিচু দরজাটা পেরিয়ে অন্যপাশে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। জানালাবিহীন ছোট একটা ঘর, দুটো লণ্ঠন জ্বলছে। ঠাণ্ডার সময় ঘর গরম রাখার জন্যে ছোট একটা স্টোভ আছে। চুলায় কফির পানি ফুটছে। কেটলি থেকে কাপে কফি ঢালতে গেলেন আরিগন।

'আমি এখানে ক্যাম্প করেই আছি বলতে পারো,' বললেন তিনি। ছোট একটা টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই। 'এখানে বিশ্রাম নিতে আসি। ইচ্ছে হলে ভেড়াটেড়া পালি। খুব শান্তির জায়গা।'

'তা বটে,' স্বীকার করল মুসা। 'একেবারেই নিরিবিলি।'

'আরও একটা ব্যাপার, পাগলামিও বলতে পারো। সন্ন্যাসীরা কেমন করে বাস করে, একা থাকতে কেমন লাগে তাদের, জানার খুব আগ্রহ আমার। সে-জন্যেই এখানে এসে নিজের ওপরই পরীক্ষা চালাচ্ছি। এ ছাড়া জানার আর তো কোন উপায় নেই।

'এই কেবিনটা আমার খুব পছন্দ। আশপাশটা কি চমৎকার দেখেছ? পেছনের দেয়াল একেবারে অরিজিন্যাল, নকল-টকল নয়। নিরেট পাথর। এই কেবিনটাও অনেক পুরানো, একশো বছরেরও বেশি। সে-সময় কি ঘটছিল এই এলাকায়, জানো?'

স্মৃতি ঘেঁটে তথ্য বের করার চেষ্টা চালাল রবিন, 'সে-সময়? নিশ্চয় গৃহযুদ্ধ চলছিল। তাই না?'

'হ্যাঁ। পড়ালেখা করো তুমি, বোঝা যাচ্ছে। তখন এটা ছিল স্মাগলারদের একটা ঘাঁটি। মানুষ চোরাচালান করত ওরা। পালিয়ে আসা গোলামরা লুকিয়ে থাকত এখানে, তারপর তাদের পাচার করে দেয়া হত কানাডায়। এ-জন্যেই এত লুকোছাপা, পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে তৈরি, জানালা নেই, রাতে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে আলো যাওয়ারও পথ নেই। জায়গাটা ছোট হতে পারে, কিন্তু খুব নিরাপদ, আরামদায়কও বটে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে আর ভাবছে কিশোর: বিচিত্র এই ছোট্ট কেবিনটাতে মাত্র একটা দরজা, সামনেরটা; তাহলে কোন গোলাম যদি এসে লুকিয়ে থাকে এখানে, তারপর দেখে তাকে ধরতে আসা হচ্ছে, পালাবে কোন পথে? এমন একটা জায়গায় কি লুকাতে চাইবে ওরা যেখান থেকে পালানোর গোপন পথ থাকবে না? তা ছাড়া খানিক আগে যে আরেকটা দরজা লাগানোর আওয়াজ শুনল, সেটা কি সত্যি শুনেছে, না তার কল্পনা?

ঠিক এই সময় থাবা পড়ল সামনের দরজায়।

আট

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রোদ আসা আটকে দিল একটা মোটাসোটা শরীর। লম্বা মানুষটাকে দেখে বললেন, 'মর্নিং, মিস্টার আরিগন। অনুমতি না নিয়েই ঢুকে পড়লাম, সরি। আপনার সাহায্য দরকার আমাদের।'

রান্নাঘর থেকে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। গলা শুনেই চিনতে পেরেছিল আগন্তুককে, শেরিফ টোনার। ওদের দেখে বলে উঠলেন, 'ও, তোমরা আগেই চলে এসেছ।' তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও তিনজন লোক। 'এই যে, তোমাদের সার্চ পার্টি নিয়ে এলাম। তিনজনের বেশি পারলাম না, এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তবে তোমরা তিন, মিস্টার আরিগন, আর আমরা মিলে আটজন হয়ে যাচ্ছি, কম না, কি বলো? একটা কুত্তা থাকলে আরও ভাল হত।'

'আছে, মিস্টার টোনার,' মুসা জানাল। 'আমাদের ফগ।'
'কালই কিনলাম বিগলের বাচ্চাটা,' রবিন বলল।
'সার্চ পার্টি কেন, শেরিফ?' জানতে চাইলেন আরিগন, 'সিরিয়াস কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?'
দ্রুত একবার আরিগনের হাসি হাসি মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন শেরিফ, 'কেন, ছেলেরা কিছু বলেনি আপনাকে?'
'বলেছে। ওদের এক ক্যাপ্টেন বন্ধুর নাকি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা, বনের মধ্যে লম্বা সফরে বেরিয়েছে। সার্চ পার্টি নিয়ে খোদ শেরিফ এসে হাজির হয়ে যাবেন তাঁকে খুঁজতে, এতটা সিরিয়াস ভাবিনি,' হেসে কথাটা শেষ করলেন আরিগন।
ভ্রূকুটি করলেন শেরিফ—যেন বলতে চাইছেন, আরও কত জরুরী কাজ ফেলে এসেছি সেটা তো জানেনেই না!—কিন্তু বললেন না। কিশোর আর রবিন বুঝতে পেরে চট করে তাকাল পরস্পরের দিকে। ঘাবড়ে গেল, মত বদলে শেষে না খোঁজা বাদ দিয়েই চলে যান!
কিন্তু তা করলেন না তিনি, শান্তকণ্ঠে বললেন, 'মিস্টার আরিগন, এই এলাকা সবচেয়ে ভাল চেনেন আপনি; আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব।'
'নিশ্চয় করব। খুঁজতেই যখন এসেছেন, আমার এই ঘরটা থেকেই শুরু হোক। কারণ একসময় লুকানোর জায়গা হিসেবেই ব্যবহার করা হত এটাকে। আপনি আসার আগে ছেলেদের এই গল্পই শোনাচ্ছিলাম।'
শেরিফকে রান্নাঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন আরিগন, ছেলেরা বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। চুপ করে বসে না থেকে তিনজন ডেপুটির সঙ্গে পরিচয়ের পালাটা শেষ করে ফেলল ওরা।
বাচ্চাটা কি করছে দেখার জন্যে বাইরে বেরোল মুসা। ভেড়ার খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে ওটা। ওটাকে ডেকে ফিরিয়ে আনতে যাবে, হঠাৎ চোখ পড়ল ঘাসের ওপর। কি যেন একটা চকচক করছে। তুলে নিয়েই থমকে গেল, কুঁচকে গেল ভুরু। রেখে দিল পকেটে।
শেরিফ আর অন্যদের নিয়ে ঘর থেকে বেরোলেন আরিগন। মাথায় নরম হ্যাট। সামনের দিকটায় উজ্জ্বল রঙের একটা প্লাস্টিকের প্রজাপতি বসানো। ছেলেদের দেখিয়ে দেখিয়ে লম্বা নলওয়ালা, কারুকাজ করা সাদা বাঁটের একটা পিস্তল গুঁজলেন কোমরের বেল্টে, যেন খুব মজা পাচ্ছেন। হেসে বললেন, 'জীবনে কখনও ডেপুটি হওয়ার সুযোগ পাইনি।'
সার্চ পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর নির্দেশিত পথেই চলতে লাগল সবাই।
কিছুদূর এগিয়ে মুসাকে বললেন, 'কুত্তাটাকে নিয়ে তুমি আগে আগে থাকো। গন্ধেই অনেক কিছু বুঝতে পারবে ওটা।' সবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান বিতরণ করলেন, 'দুই ধরনের তরাই আছে ব্ল্যাক হোলোতে, নিচে বন, আর ঢালের গায়ে পাথর। প্রথমে বনে ঢুকব আমরা, সেখানে কিছু না পেলে পাথুরে

এলাকায় খুঁজতে যাব।'

সবাইকে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন শেরিফ। প্রতিটি লোক তার ডান পাশের লোককে নজরের মধ্যে রাখবে। তাহলে দলছুট হয়ে পড়ার ভয় থাকবে না কারও।

ফগকে নিয়ে মুসা রইল দলটার ঠিক মাঝখানে। সারির বাঁ প্রান্তের শেষ লোকটি হলেন শেরিফ, ডান প্রান্তে কিশোর। তার পাশের লোকটি রবিন। মুসার পাশে আরিগন। ঘন বনে ক্যাপ্টেন রিচটনের খোঁজ চালাল সার্চ পার্টি।

লতায় ছাওয়া ঝোপঝাড়, স্বল্প আলো, আর ঘন হয়ে জন্মানো বড় বড় গাছ বাধা দিয়ে কঠিন এবং ধীর করে তুলল খোঁজার কাজ।

'শেরিফ!' চিৎকার করে বললেন আরিগন, 'আপনার সামনে একটা খাত পড়বে। ওটাতে ভাল করে দেখবেন। হাড়গোড় ভেঙে ওতে পড়ে থাকতে পারেন ক্যাপ্টেন।'

এক মিনিট পরেই জবাব এল, 'নেই এখানে।'

খানিক পরে রসিকতার সুরে কিশোরদের বললেন আরিগন, 'তোমাদের সামনে একটা বড় গাছ পড়বে। তাতে মস্ত ফোকর। ভাল করে দেখো, ওর মধ্যে লুকিয়ে বসে আছেন কিনা তোমাদের বন্ধু।'

আরিগন ব্যাপারটাকে এত হালকা ভাবে নিয়েছেন দেখে রাগ হতে লাগল কিশোরের। রবিনেরও ভাল লাগছে না এ ধরনের আচরণ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাটি আর আশপাশের সব কিছু দেখতে দেখতে চলেছে দু-জনে। মুসা আর ফগও খুব সতর্ক।

বিষণ্ণ বনের মধ্যে চলল একঘেয়ে খোঁজার কাজ। হঠাৎ কোন কিছু চমকে দিল ফগকে, সামনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার শুরু করল।

'মানুষ!' চেঁচিয়ে বলল মুসা, 'একটা লোক পড়ে আছে!'

দুই পাশ থেকে দৌড়ে এল সবাই। হাত তুলে দেখাল মুসা। সবাই দেখল, আবছা অন্ধকার বনের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে কালো কোট, কালো টুপি আর ধূসর ট্রাউজার পরা একটা দেহ।

সবার আগে ছুট লাগাল ফগ। তার পেছনে দৌড় দিল সবাই। পড়ে থাকা দেহটার কাছে আগে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা।

'দূর! মানুষ কোথায়?' হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল রবিন, ক্যাপ্টেনের লাশ দেখতে হয়নি বলে খুশিও হয়েছে, 'এ তো গাছ!'

রসিকতা করে ফগকে বললেন আরিগন, 'কেমন কুত্তারে তুই? গাছকে মানুষ ভেবে বসিস?'

কিন্তু সে যে মানুষ ভেবে চিৎকার করেনি তার আচরণেই বোঝা গেল। ছোঁক ছোঁক করছে গাছটার কাছে। নাক নামিয়ে শুঁকছে। ইঁদুর বা বেজি জাতীয় কোন প্রাণীর গন্ধ পেয়েছে মনে হয়, খোঁড়লে ঢুকে পড়েছে ওটা।

'ওর আর দোষ কি? আমরাও তো ভেবেছি,' মুখ কালো করে বলল একজন ডেপুটি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল অন্য দু-জন।

'দূর থেকে কিন্তু এক্কেবারে মানুষ মনে হয়েছে,' কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল মুসা। এমন একটা ভুল করাতে লজ্জা লাগছে তার।

শেরিফ বললেন, 'থামি এখানে। একটু জিরিয়ে নিই।'

খুশিমনে ব্যাগ খুলে খাবার বের করতে লাগল মুসা। হাতে হাতে তুলে দিল টিউনা মাছ, ডিমের সালাদ, আর ভেড়ার মাংস ও পনিরে তৈরি স্যান্ডউইচ। যে গাছের গুঁড়িটা বোকা বানিয়েছে ওদের, তার ওপর বসেই চিবাতে লাগল তিন ডেপুটি। নিচে বসল তিন গোয়েন্দা ও শেরিফ। খানিক দূরে একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসেছেন আরিগন।

ঘড়ি দেখে মুখ বাঁকিয়ে শেরিফ বললেন, 'এখন যে দুপুর, বনের মধ্যে এই অন্ধকার দেখলে কে বিশ্বাস করবে!'

খাওয়ার পর আবার উঠে আগের মতই ছড়িয়ে গেল দলটা। আবার চলল খোঁজা। বিকেল নাগাদ বনে ছাওয়া উপত্যকার নিচেটা পুরো দেখা হয়ে গেল। পাওয়া গেল না কিছু। বন থেকে বেরোতে সামনে পড়ল হোলোর পাথুরে দেয়াল।

'ওই যে ওখানে একটা গুহা আছে,' হাত তুলে একটা পাথরের চাঙড় দেখিয়ে বললেন আরিগন। 'ওর মধ্যে পড়ে থাকলে অবাক হব না।' গোয়েন্দাদের বললেন, 'তোমরা যাও। উঠে গিয়ে দেখো। আমি পেছনেই আছি। পা-টাতে যে কি হলো আজ, চাপই দিতে পারছি না।'

তরতর করে উঠে যেতে লাগল রবিন। তার পেছনে মুসা, সবশেষে কিশোর। কিছুদূর উঠেই গুহার কালো মুখটা নজরে এল। পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা শৈলশিরা। খাড়া ঢাল থেকে ওটার ওপর সবে নিজেকে টেনে তুলেছে রবিন, এই সময় শাঁ করে কি যেন একটা চলে গেল তার কানের পাশ দিয়ে।

'খবরদার! তোমার ওপরে!' নিচ থেকে চিৎকার করে উঠলেন আরিগন।

একের পর এক পাথর ছুটে আসতে লাগল ছেলেদের দিকে। কিন্তু কোনটাই গায়ে লাগল না। অল্পের জন্যে মিস হতে লাগল। মুখ তুলে ওরা দেখল, লম্বা, পাতলা একটা মূর্তি উঁকি দিয়ে আছে দেয়ালের একেবারে কিনার থেকে। পাথরগুলো সে-ই ছুঁড়ছে।

'পিচার! ও-ই পিচার!' আবার চিৎকার করে উঠলেন আরিগন।

মুঠো পাকিয়ে ওপর থেকে হাত ঝাঁকাতে লাগল বোবা ছেলেটা। কিশোরের মনে হলো, কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। সরে যেতে বলছে যেন।

'ওপরে উঠতে মানা করছে আমাদের,' রবিন বলল। 'কে শোনে তার কথা! আমরা উঠবই, দেখি কি করতে পারে!'

পাথর ছুঁড়েও ঠেকাতে না পেরে যেন হাল ছেড়ে দিল ছেলেটা। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

গর্তের কাছাকাছি চলে এসেছে রবিন আর মুসা। কিনারে এসে ভেতরে

তাকিয়েই থমকে গেল। ধড়াস করে উঠল বুক।

মাত্র তিনফুট দূরে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে মারাত্মক বিষাক্ত একটা র‍্যাটল স্নেক। ছোবল হানতে প্রস্তুত। চোখের পলকে পাথরের আড়াল থেকে ওটার কাছে চলে এল আরও দুটো সাপ। উদ্দেশ্য ওগুলোরও ভাল না!

নয়

ঝট করে যে পিছিয়ে যাবে ওরা, তারও উপায় নেই, শৈলশিরাটা এতই সরু। আটকে দিয়েছে ওদেরকে ভয়াবহ সরীসৃপগুলো। খাড়া ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে সরে যাওয়া যাবে না, তার আগেই ছোবল খেতে হবে। তাড়াহুড়ো করতে গেলে আরও বিপদ আছে, হাত ফসকে যেতে পারে, তাহলে আছড়ে পড়তে হবে অনেক নিচের পাথরে। ভাল বিপদেই পড়া গেছে! ওদিকে লেজের খড়খড় আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে অন্য দুটো সাপ। যে কোন মুহূর্তে কামড়ে দেবে।

বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন পথই দেখছে না দুই গোয়েন্দা, এই সময় টাশ্‌শ্ করে উঠল পিস্তল। ছোবল মারতে তৈরি হয়েছিল যে সাপটা, নিমেষে গায়েব হয়ে গেল ওটার মাথা। শরীরটা পাথরে আছড়ে পড়ে মোচড় খেতে লাগল। গুলির শব্দে ভড়কে গিয়ে পালাতে শুরু করল অন্য দুটো।

'জলদি সরে এসো ওখান থেকে!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর।

শৈলশিরা ধরে যত দ্রুত সম্ভব গর্তের কাছ থেকে সরে গেল মুসা আর রবিন। ওদের কাছে উঠে এলেন আরিগন আর কিশোর। আরিগনের পিস্তলের নল থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ওরা চারজন নিরাপদে মাটিতে নামার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শেরিফ। ভুরুর ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'ওখানে যাওয়াটা উচিত হয়নি তোমাদের!' গলা কাঁপছে তাঁর।

'একেবারে সময়মত গুলিটা করেছিলেন, মিস্টার আরিগন,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল রবিন। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি থাকাতে আজ বাঁচলাম।'

হাসি মুছে গেছে আরিগনের মুখ থেকে। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এখানে আমি ছিলাম বলে রক্ষা, এটা অন্য কোথাও ঘটতে পারত। সাবধান না হয়ে অত তাড়াহুড়ো করে গর্তের কাছে যাওয়া উচিত হয়নি তোমাদের। অচেনা জায়গায় আরও দেখেশুনে যেতে হয়।'

আন্তরিক ভঙ্গিতে একটা হাত মুসার কাঁধে, আরেক হাত রবিনের কাঁধে রাখলেন তিনি। 'শোনো, আমি যা বলি মন দিয়ে শোনো। বনে চলার অভিজ্ঞতা নেই তোমাদের, বুঝতে পারছি। এখানে আরও অনেক সাবধান থাকতে হয়। কোথায় যে কোন বিপদ ঘাপটি মেরে থাকে কল্পনাও করতে পারবে না। এই সাপগুলোর কথাই ধরো না, ওরা যে ওখানে আছে ভাবতে

পেরেছিলে? অথচ ভাবা উচিত ছিল। গর্তের কাছে পাথুরে জায়গায় শুয়ে রোদ পোয়ায় সাপেরা, কাজেই গর্তের কাছে যাওয়ার আগে সাবধান থাকতে হয়। বুনো এলাকা এটা, এখানে বনের ভেতরে যেমন বিপদ, বাইরেও বিপদ।'

তাঁর কথায় সায় জানাল একজন ডেপুটি।

আরেকজন নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

শেরিফ বললেন, 'বনের মধ্যে এ ধরনের বিপদে আনাড়ি লোকেরাই সাধারণত পড়ে। শহরে বাস করা মানুষকে এনে এই পর্বতের মধ্যে ছেড়ে দিলে মুহূর্তে পথ হারিয়ে বসে থাকবে। বেরোতেই পারবে না আর।'

হাসি ফুটল আবার আরিগনের মুখে, হালকা হয়ে এল কণ্ঠস্বর, 'যাই হোক, বুদ্ধিমান লোকেরা একবারই বোকামি করে।' ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি তোমরা বুদ্ধিমান। আশা করব, ব্ল্যাক হোলোর ধারেকাছেও আসবে না আর। এখানে পদে পদে বিপদ যে ওত পেতে থাকে, নিজের চোখেই তো দেখলে।'

ক্যাপ্টেন রিচটনকে খোঁজার এখানেই ইতি হলো। আরিগন, শেরিফ আর তাঁর তিন ডেপুটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরল তিন গোয়েন্দা। সাপের কবল থেকে বাঁচার পর থেকেই শরীরটা দুর্বল লাগছে রবিনের, ধপ করে শুয়ে পড়ল বাংকে। কুকুরের বাচ্চাটাকে কিছু খাবার দিয়ে মুসা গেল রান্নাঘরে। আবার রিচটনের ক্যালেন্ডারটা নিয়ে বসল কিশোর। দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।

শিক কাবাব, পটেটো চিপস আর ভেজিটেবল সুপ রান্না করে সবাইকে খেতে ডাকল মুসা। তখনও চুপ করে আছে রবিন। কিশোর গম্ভীর। এই পরিস্থিতি ভাল লাগল না মুসার। হালকা করার জন্যে বলল, 'ব্যাপারটা খারাপ লাগেনি তোমাদের?'

মুখ তুলল কিশোর, 'কোনটা?'

'এই যে খোকাবাবু মনে করে আমাদের লেকচারটা দিয়ে দিলেন আরিগন। আমার তো রাগই হচ্ছিল। বনেবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে ঝানু হয়ে গেলাম, আর আমাদের কিনা বলে বন চিনি না। আরে বাবা ক্যাম্প করেই তো থাকলাম কত শতবার।'

চিবাতে চিবাতে রবিন বলল, 'আমারও ভাল লাগেনি। কিছু বললাম না, আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে। গাধামি তো সত্যিই করেছি আমরা।'

কিশোর বলল, 'না, সেটা আমাদের দোষ নয়। নাহয় ধরলামই আমরা আনাড়ি, বন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, কোথায় সাপ শুয়ে রোদ পোহায়, জানি না, কিন্তু আরিগন তো জানতেন। আর জানতেনই যদি আমাদের ওখানে যেতে বললেন কেন?'

'তাই তো, এভাবে তো ভাবিনি!' চিবানো বন্ধ করে দিল রবিন। 'ক্যাপ্টেনকে খোঁজা বন্ধ হয়ে গেল…আমাদের হোলোতে না যাওয়ার পরামর্শ দিলেন…কিশোর, যা-ই বলো, ওই বাড়িটা যেমন রহস্যময়, তার মালিকও

তেমনি রহস্যময়। একটা দরজা বন্ধ হতে শুনেছি আমি, অথচ রান্নাঘরে ঢুকে আর কোন দরজা চোখে পড়েনি।'

'ব্যাপারটা আমারও খটকা লেগেছে।' একমুহূর্ত চুপ করে ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'ইচ্ছে করেই সাপের বাসায় আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওখানে সাপ আছে জানেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল নিয়ে এসেছেন, যাতে গুলি করতে পারেন। এ সব করে শেরিফকে বোঝাতে চেয়েছেন, কয়েকটা নির্বোধ, অপোগণ্ড ছেলে আমরা, আমাদের কথায় ভবিষ্যতে কান না দেয়াই উচিত।'

'আচ্ছা,' মুসা বলল, 'আমাদের খুন করতে চায়নি তো? সাপে কামড়ে আমাদের মেরে ফেললে কারও দোষ হত না। শেরিফ আর তাঁর ডেপুটিদের চোখের সামনে ঘটত ব্যাপারটা। কোন রকম সন্দেহ জাগত না কারও মনে।'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর।

'আরও একটা প্রশ্ন, পিচার আমাদের পাথর ছুঁড়ল কেন? সে-ও কি আরিগনের দলের লোক?'

'না-ও হতে পারে। সাপের গুহার দিকে এগোচ্ছি দেখেও ছুঁড়তে পারে, আমাদের ঠেকানোর জন্যে। তবে শিওর হতে পারছি না।'

ভুরু কুঁচকে রবিন বলল, 'এই আরিগন লোকটা এক বিরাট রহস্য হয়ে দাঁড়াল! কর্নেল হুমবার সঙ্গে অবিকল মিল, এটাই বা হয় কি করে? যমজ ভাই নাকি...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার করে উঠল মুসা, 'এই দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাব তোমাদের! ভুলেই গিয়েছিলাম!' পকেট থেকে একটা ধাতব চাকতি বের করে টেবিলে ফেলল সে।

'কি জিনিস?' হাতে নিয়ে একবার দেখেই ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেল কিশোরের, 'আরি এ তো কুকুরের গলার ট্যাগ! ডবের নাম! পটির কুকুর! কোথায় পেলে?'

'আরিগনের বাড়ির দরজার সামনে, ঘাসের ওপর।'

'তবে কি আরিগনই কুকুর চুরি করছেন?' আগ্রহে বকের মত সামনে গলা বাড়িয়ে এসেছে রবিন, কিশোরের হাতের তালুতে রাখা ট্যাগটা দেখছে। 'কোন ধরনের অপরাধে জড়িত? নিজেই তো বললেন, এই এলাকায় একটা বেআইনী কুকুরের মার্কেট আছে।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর। 'ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে রহস্য। তাঁর বাড়িতে কুকুরের ছায়াও তো দেখলাম না।'

'তাঁর ভেড়ার খোঁয়াড়টা দেখে এসেছি আমি,' মুসা জানাল, 'ভেড়া নেই, অন্য কোন প্রাণীও নেই। এমন হতে পারে, ডব গিয়ে বাড়িটার সামনে ঘুরঘুর করছিল, ওই সময় কোনভাবে তার গলা থেকে খুলে পড়ে যায় ট্যাগটা।'

চুকচুক শব্দ করে দুধ খেতে লাগল ফগ। সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, 'আজ রাতেই ফাঁদ পাতব।'

'রাখবে কোথায়?'

'বারান্দার নিচে, বেঁধে। দরজার কাছে লুকিয়ে থাকবে তুমি আর রবিন। আমি থাকব বাইরে, বাড়ির কোণে। যেদিক থেকেই আসুক চোর, আমাদের চোখে না পড়ে যাবে না।'

রাত দশটায় আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল ছোট্ট কেবিনটা। আকাশে মেঘ করেছে। বাতাস গরম। নিথর হয়ে আছে প্রকৃতি। ঝড়ের সঙ্কেত জানাচ্ছে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে ফগকে নিয়ে বেরোল মুসা। বারান্দার রেলিঙের সঙ্গে বাঁধল কুকুরটার গলার দড়ি। ঘরে ফিরে গেল আবার। পাল্লাটা খোলা রেখে দু-পাশে বসে পড়ল সে আর রবিন।

অন্ধকারে যাতে দেখা না যায়, এ জন্যে গাঢ় রঙের পোশাক পরে বেরোল কিশোর। ক্যাপ্টেনের গাড়ি আর ঘরের দেয়ালের মাঝের ফাঁকে লুকিয়ে বসল, চত্বরের কাছ থেকে কয়েক কদম দূরে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কান খাড়া। ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল অন্ধকার। তারপরেও বন থেকে বেরিয়ে কেউ যদি এগিয়ে আসে, তাকে দেখতে পাবে না পেছনে গাছগুলো কালো হয়ে থাকায়।

ক্রমেই যেন আরও ভারি, আরও গরম হয়ে উঠছে বাতাস। দিগন্তে ঝিলিক দিতে আরম্ভ করল বিদ্যুতের সরু সরু শিখা। গুমগুম আওয়াজ বেরোতে থাকল মেঘের ভেতর থেকে। হঠাৎ পুরো আকাশটাকে চিরে দিয়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল বিদ্যুৎ, ক্ষণিকের জন্যে সবকিছুকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করেই নিভে গেল, অন্ধকারকে ঘন করে তুলল আরও। দশদিক কাঁপিয়ে কানফাটা শব্দে বাজ পড়ল।

ঘড়ি দেখল কিশোর। এখন মধ্যরাত।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। বজ্রপাতের শব্দ আগের বারের চেয়ে দীর্ঘায়িত হলো। বারান্দার নিচে ভীতকণ্ঠে কুঁই কুঁই করতে লাগল বাচ্চাটা।

'ঝড়ের আর দেরি নেই,' ভাবল কিশোর।

আবার বিদ্যুতের চমক, আবার বজ্রপাত…তার পর পরই বড় বড় ফোঁটা…কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টিপাত। আচমকা গোঙানো বাদ দিয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ফগ। কয়েকটা চিৎকার দিয়েই থেমে গেল, মুখ চেপে ধরা হয়েছে যেন, যাতে ডাকতে না পারে।

ঝড় মুহূর্তের জন্যে অমনোযোগী করে দিয়েছিল তিনজনকেই, কুকুরটার ওপর নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিল, এই সময়টুকুতেই ঘটে গেল ঘটনাটা। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এল মুসা ও রবিন, বাড়ির পাশ থেকে ছুটে এল কিশোর।

দেখল, ফগ নেই!

মুখ চেপে ধরলেও বাচ্চাটার গোঙানি শোনা যেত, কিন্তু ঝড়ের শব্দ ঢেকে দিল সেটা। বিদ্যুৎ চমকাল, তীব্র নীলচে আলোয় আলোকিত করে দিল

বনভূমি, সেই আলোতে তিনজনেরই চোখে পড়ল হোলোতে নামার পথটা ধরে ছুটে যাচ্ছে একটা মূর্তি।

'ধরো ওকে!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

টর্চ হাতে ছুটল তিনজনে।

দশ

কয়েক লাফে খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে বনে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা। টর্চের আলো থাকা সত্ত্বেও গতি কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো। বৃষ্টিতে ভেজা ঢালু এই পথ ধরে জোরে ছোটা ওদের পক্ষে অসম্ভব।

সামনে অন্ধকারের মধ্যেই দৌড়ে চলেছে কুত্তাচোর। তার চলা দেখেই অনুমান করা যায়, এই এলাকা তার অতিপরিচিত। ফগের চিৎকার শোনা গেল আবার, তার মুখ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরছে বৃষ্টি। বিদ্যুতের আলোয় প্রায় তিরিশ গজ নিচে ছুটন্ত মূর্তিটাকে দেখতে পাচ্ছে ছেলেরা।

হঠাৎ অন্ধকারে মানুষের আর্তনাদ শোনা গেল। ডান দিকে পাথরের মধ্যে একটা ভারি কিছু গড়িয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে বোধহয় থেমেছিল, আবার শোনা যেতে লাগল ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

'কিশোর, তোমরা দেখো তো কি হলো!' আগে আগে ছুটতে ছুটতে বলল মুসা। 'আমি চোরটার পিছে যাচ্ছি!'

টর্চের আলো ফেলে ঘন ঝোপের দিকে দৌড় দিল কিশোর আর রবিন। ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দেই বোঝা গেল তার মধ্যে দিয়ে ছুটছে কেউ। কিন্তু আর গোঙানি কানে এল না। খানিক পর ঝড়বৃষ্টির শব্দ ছাড়া শোনা গেল না আর কিছুই।

'পালিয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'ধরতে পারব না।'

মুসা ওদিকে গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নেমে যাচ্ছে উপত্যকায়। টর্চ হাতে থাকলেও ওই আলোয় পথ দেখে দৌড়াতে অসুবিধে, কারণ দৌড়ানোর সময় নাচানাচি করে আলো, এ জন্যে নিভিয়ে দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় যতটা পারা যায় দেখে দৌড়াচ্ছে। পথটা তারও মোটামুটি চেনা।

বড় করে বিদ্যুৎ চমকাল। আলো রইল বেশিক্ষণ। তাতে তিরিশ গজ দূরের ছুটন্ত মূর্তিটাকে স্পষ্ট নজরে পড়ল তার। বগলে চেপে ধরে আছে কিছু।

'পিচার!' চিৎকার করে ডাকল সে, 'দাঁড়াও!'

কিন্তু দাঁড়াল না আজব ছেলেটা। হোলোর পাথুরে এলাকার দিকে দৌড় দিল। পায়ে ব্যথা পেয়েছে মনে হলো, অল্প অল্প খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু গতি কমছে না। পাথুরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিন্তু সমতল জায়গায় রয়েছে মুসা,

তার সঙ্গে পারল না ছেলেটা। কয়েক লাফে কাছে পৌঁছে গেল সে। পা সই করে ঝাঁপ দিল। গোড়ালি ধরে ফেলল ছেলেটার। উপুড় হয়ে পড়ে গেল পিচার, বগলের নিচ থেকে ছিটকে পড়ল দূরে ফগ, ব্যথা পেয়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল।

চরমে পৌঁচেছে ঝড়। বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে আলোকিত করে রেখেছে উপত্যকা।

ছেলেটার গায়ের ওপর চলে এল মুসা, কুস্তির কায়দায় চেপে ধরল। কিন্তু পিচারের গায়েও কম জোর না, তার ওপর ভেজা শরীর, ভেজা হাত, তাকে ধরে রাখতে পারল না মুসা। পিছলে নিচ থেকে সরে গিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। একটা বড় পাথর তুলল মারার জন্যে।

নিচ থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'খবরদার, ফেলো ওটা!'

চমকে ফিরে তাকাল পিচার, এই সুযোগে গড়িয়ে সরে গেল মুসা। আবার ছেলেটার পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। আরেকবার ফেলে দিল মাটিতে।

পৌঁছে গেল রবিন আর কিশোর। তিন জনের সঙ্গে পারল না ছেলেটা, কাবু করে ফেলা হলো তাকে। তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। দু-দিক থেকে দুই হাত চেপে ধরে রেখেছে দু-জনে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মুসা বলল, 'আমার কুত্তাটা কোথায়? এই ফগ, ফগ?'

ডাক শুনে কুঁই কুঁই করতে করতে এসে হাজির হলো বাচ্চাটা। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে, ভয় আর ব্যথা ভুলে গিয়ে মুসার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ওটার গলার দড়ি খুলে নিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাঁধা হলো পিচারের। বন্দিকে নিয়ে কেবিনে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল বুনো ছেলেটা, পালানোর চেষ্টা করল না আর।

ভিজে গোসল করে ওরাও কেবিনে পৌঁছল, বৃষ্টিও থেমে গেল। ঝড়ো বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে দিল আকাশ।

'আমার খিদে পেয়েছে,' ঢুকেই ঘোষণা করল মুসা। 'উফ্, যা দৌড়ানটা দৌড়েছি!'

'পেয়েছে তো আর কি,' রবিন বলল, 'খাবার বানাও, মানা করছে কে।'

গা মুছে, কাপড় বদলে রান্নাঘরে চলে গেল মুসা। বিরাট এক পাত্রে স্যুপ বসাল। সেই সঙ্গে চলবে স্যামন মাছের স্যান্ডউইচ।

বন্দির বাঁধন খুলে দিয়েছে কিশোর আর রবিন। কিছু শুকনো কাপড় এনে দিয়ে ভেজাগুলো বদলে নিতে বলল।

কেবিনের উজ্জ্বল আলোয় এই প্রথম কাছে থেকে ভাল করে ছেলেটাকে দেখতে পেল গোয়েন্দারা। বয়েস চোদ্দ হবে, তবে সেই তুলনায় অনেক লম্বা, গঠনও বড়দের মত। কালো লম্বা চুল লেপ্টে রয়েছে ঘাড়ে, কপালে, কতদিন কাটে না কে জানে। টারজানের বাচ্চা সংস্করণ মনে হলো ওকে রবিনের

কাছে'।

কাপড় বদলে চুপ করে বসল পিচার। পায়ে একটা গভীর কাটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এল কিশোর। কাটাটা আইয়োডিন দিয়ে মুছে, ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। বাধা দিল না ছেলেটা। আইয়োডিন লাগানোর সময় যখন ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল জখমটা, তখনও মুখ বিকৃত করল না। ভয় অনেকটা দূর হয়ে গেছে চোখ থেকে, বুঝে গেছে তার কোন ক্ষতি করবে না কিশোররা।

ট্রে বোঝাই খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল মুসা। হাসিমুখে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর একবাটি স্যুপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও পিচার, খেয়ে ফেলো।'

দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না, গপ গপ করে গিলতে শুরু করল পিচার। দেখতে দেখতে শেষ করে ফেলল। আরও কিছু খাবার তার দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা। হেসে বলল, 'বাহ্, আমার সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত একজনকে পাওয়া গেল।'

পিচার আর মুসাকে খাওয়ায় ব্যস্ত রেখে ইশারায় রবিনকে ডেকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল কিশোর। নিচু স্বরে বলল, 'ছেলেটাকে একটুও বিপজ্জনক লাগছে না আমার কাছে। কাল নদীর ধারে আমাদের ওপর চোখ রেখেছিল যে, সে পিচার নয়। ওই লোকটা এর মতই লম্বা, তবে চেহারা মেলে না, অন্য রকম।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমরা তো আর সন্দেহ করিনি, আরিগন বলেছেন পিচার হতে পারে।'

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না ওরা, পিচারকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল মুসা। ফগকেও খাবার দেয়া হয়েছে। তাকে আদর করতে লাগল মুসা।

স্টোভের আগুনে গরম হয়ে উঠেছে রান্নাঘর, বেশ আরাম। বৃষ্টিতে ভিজে এসে শুকনো কাপড় পরে, পেট ভরে খাওয়ার পর বুনো ভাবটা চলে গেছে পিচারের মুখ থেকে। মুসা আর ফগের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসল, বুঝিয়ে দিল কুকুর ভালবাসে সে।

কিশোর ভাবল, ছেলেটার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু পিচার বোবা, জবাব তো দিতে পারবে না, কি করে বলবে? শেষে বসার ঘরে চলে গেল কিশোর, কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে এল। ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, 'আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই, জবাব দেবে?'

ওদের ব্যাপারে ভীতি আর সন্দেহ চলে গেছে পিচারের। মাথা ঝাঁকাল।

'বেশ,' ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলল কিশোর, 'বলো, আমাদের কুকুরটা নিয়ে যেতে চেয়েছিলে কেন?'

বিস্ময় ফুটল ছেলেটার চোখে। টেবিলে কাগজটা বিছিয়ে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করতে লাগল। লম্বা, চওড়া কাঁধ একজন মানুষের চেহারা ফুটে উঠল কাগজে। ভুরু আর গোঁফ ভারি করে দিল সে।

'এ তো আরিগন!' অবাক কণ্ঠে বলে উঠল রবিন। 'কিন্তু ছবি এঁকে

কেন? লিখলেও আরও সহজ হয়ে যায়।'

'লিখতে জানে না বোধহয়।' হাত তুলল কিশোর, 'দাঁড়াও, পিচারের আঁকা এখনও শেষ হয়নি।'

টেবিল ঘিরে এসেছে তিন গোয়েন্দা, তাকিয়ে রয়েছে কাগজটার দিকে। লম্বা একজন মানুষ আঁকল পিচার, হাত আঁকল, ফগের চেহারার একটা বাচ্চা কুকুর ধরেছে হাতটা।

আবার চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ও বলতে চায়, আরিগন চুরি করেছেন বাচ্চাটাকে!'

এগারো

'দাঁড়াও,' আবার বলল কিশোর, 'ওর আঁকা এখনও বাকি আছে।'

আরও কয়েকটা কুকুরের ছবি আঁকল পিচার—একটা ককারেল স্প্যানিয়েল, একটা জার্মান শেফার্ড, আর দুটো হাউন্ড।

'ওটা আবার কি আঁকছে?' পিচারের পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'একটা ধূসর কুকুর?'

'ধূসর কিংবা বাদামী,' কিশোর বলল। 'দেখো, বাঁ কানটা সাদা রেখে দিয়েছে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'ওটা তো পটির কুকুর! তারমানে ডবকেও চুরি করেছেন আরিগান!'

বার বার আরিগন নামটা শুনেই বোধহয় মুখ তুলে একটা রাগত ভঙ্গি করল পিচার। তারপর রেখা টেনে টেনে সবগুলো কুকুরকে যোগ করে দিল মানুষটার ছবির সঙ্গে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। দৃষ্টি আর ভঙ্গি দেখে মনে হলো আরও কিছু বলতে চায়। আরিগনের ছবিতে আঙুল রাখল, তারপর ফগকে দেখাল। হঠাৎ একটা চেয়ারের নিচে চলে গিয়ে মুখ বের করে উঁকি দিল।

'ও বলতে চায়,' ব্যাখ্যা করল কিশোর, 'গাছের আড়ালে কিংবা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।'

হাত টান টান করে দিল পিচার, আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আবার বন্ধ করে বোঝাতে চাইল ভারি কিছু চেপে ধরেছে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল চেয়ারের নিচ থেকে। হাতের অদৃশ্য জিনিসটা দিয়ে ডোনারের ছবির মাথায় বাড়ি মারল, পরক্ষণেই হাতের কুকুরের বাচ্চাটাকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে ঘুরে দৌড় দেয়ার ভঙ্গি করল।

কি বোঝাতে চাইল বুঝল তিন গোয়েন্দা। সে লুকিয়ে বসে চোখ রাখছিল, আরিগন আসতেই তার মাথায় বাড়ি মেরে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

'হুঁ, চোরের ওপর বাটপাড়ি!' মন্তব্য করল উত্তেজিত রবিন।

কিশোরের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি, 'আজ বিকেলে আমাদেরকে পাথর ছুঁড়লে কেন?'

আবার চেয়ারে বসল পিচার। কয়েক টানেই এঁকে ফেলল তিনটে র‍্যাটল স্নেক। ওগুলো দেখিয়ে মুসা আর রবিনের বুকে হাত রেখে ওদেরকে ঠেলে সরানোর ভঙ্গি করল।

হেসে বলল কিশোর, 'বলেছিলাম না, ও তোমাদের বাঁচাতে চেয়েছিল। সাপগুলো দেখেছিল। তার মানে আরিগনের দলে নয় সে।'

আচমকা প্রশ্নটা জাগল রবিনের মাথায়, 'কুত্তাচোরের পেছন নিয়েই বিপদে পড়েননি তো ক্যাপ্টেন রিচটন?'

'পড়তে পারেন। তাঁরও তো একটা কুকুর ছিল। আরিগন হয়তো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, ক্যাপ্টেন পিছু নিয়েছিলেন তার। তারপর গোপন এমন কিছু দেখে ফেলেছিলেন, যেটা কাল হয়েছিল তাঁর।'

'তখন তাঁকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো!' পাতায় লেগে থাকা রক্তের কথা ভেবে বলল রবিন।

নতুন সম্ভাবনাটা নিয়ে এতই মজে গেল তিনজনে, নিঃশব্দে কখন যে দরজার কাছে চলে গেল পিচার, খেয়াল করল না। করল সে বেরিয়ে যাওয়ার পর। লাফিয়ে উঠে তার পিছু নিতে গেল মুসা, ধরে ফেলল কিশোর। 'যাক। ও আমাদের পক্ষেই আছে।'

'ওর জন্যে কিছু করতে পারলে ভাল হত,' রবিন বলল। 'ছবি আঁকার হাত দেখেছ? ট্যালেন্ট একটা! আর্ট স্কুলে ভর্তি হলে ফাটিয়ে ফেলবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সে-সব পরের ভাবনা। আগে এই রহস্যের একটা কিনারা করা দরকার। বুঝলে, কর্নেল হুমবাকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না আমি, আরিগনের সঙ্গে চেহারার এত মিল কেন? ভাবছি, কাল আবার কার্নিভ্যালে গিয়ে হুমবার সঙ্গে কথা বলব। জিজ্ঞেস করব, তার কোন যমজ ভাই আছে কিনা।'

'ফরেস্টবার্গে গেলেও তথ্য মিলতে পারে। আরিগন পরিবার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা দরকার।'

রাতের ঝড়বৃষ্টির পর খুব ঝলমলে হয়ে দেখা দিল সকাল। গাছের সবুজ পাতা চকচক করছে কাঁচা রোদে। ফুরফুরে মন নিয়ে কেবিন থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু বাইরে বেরিয়েই থমকে গেল মুসা, বলে উঠল, 'খাইছে! দেখো!'

কনভারটিবলের টপ তুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল ওরা, বৃষ্টির পানি জমে আছে গাড়ির মেঝেতে। সীট, সীটের কভার, সব ভেজা। পানি মুছে নিয়েও তাতে বসে যাওয়া যাবে না।

'ক্যাপ্টেনের গাড়িটাই নিয়ে যাই,' রবিন বলল। 'এতে আরেকটা কাজ হবে। তাঁর শত্রুরা দেখলে মনে করতে পারে তিনি পালিয়েছেন, বাধা দেয়ার

জন্যে তখন সামনে বেরিয়ে আসতে পারে ওরা।'

বুদ্ধিটা ভাল, পছন্দ হলো কিশোরের। এ ছাড়া আর কিছু করারও নেই, তাদের এত ভেজা গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। পানিটানিগুলো মুছে, শুকানোর জন্যে ফেলে রেখে ক্যাপ্টেনের গাড়িটা নিয়েই রওনা হলো ওরা।

রবিনই চালাল, কিশোর তার পাশে, কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে পেছনে বসল মুসা। ফরেস্টবার্গে পৌঁছে দেখা গেল সীটে এলিয়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে মুসা, বাচ্চাটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে তার কোলে। হেসে ফেলে কিশোর বলল, 'কাল রাতে দু-জনের ওপরই খুব ধকল গেছে। ঘুমাক। চলো, আমরাই যাই।'

কোর্টহাউসের দিকে হেঁটে এগোল ওরা। মাত্র আটটা বাজে, রাস্তায় লোকজন কম। আগের দিন ভাল করে দেখা হয়নি, আজ দেখতে দেখতে চলল ওরা। বেশির ভাগ দোকানেরই ওপরতলায় অফিস করা হয়েছে। একটা সাইনবোর্ডে দেখা গেল:

আর্নি হুগারফ
অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল

ঢুকবে কি ঢুকবে না দ্বিধা করতে লাগল। সে কি ভেবে না ঢোকাই স্থির করল।

রাস্তা পেরিয়ে কোর্টহাউসের সামনে এসে দাঁড়াল দু-জনে। এত সকালে কেউ কাজে আসেনি।

'এক কাজ করি চলো,' কিশোর বলল। 'দোকানগুলোতে খোঁজ নিই। আরিগনদের কেউ চিনতেও পারে।'

পরের একটা ঘণ্টা দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াল দুই গোয়েন্দা। দু-একজনের কাছে নামটা পরিচিত হলেও কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না। কেউ কোন তথ্য দিতে পারল না। অনেকেই এখানে নতুন, তারা চেনেই না আরিগনদের। আর পুরানো যারা, চিনতে পেরেছে, তারা চেপে গেছে; বাইরের কারও কাছে নিজেদের ঘরের কথা বলতে রাজি না ওরা।

পথের মাথার একটা দরজির দোকান দেখিয়ে কিশোর বলল, 'চলো, ওইটাই শেষ।'

'সে-ও বলবে না।'

'এবার অন্য বুদ্ধি করব। ভাব দেখাব, যেন কাজ করাতে এসেছি।'

'দরজির দোকানে আবার কি কাজ?' অবাক হলো রবিন।

হেসে প্যান্টের একটা ছেঁড়া দেখাল কিশোর। 'কাল রাতে পাথরে-টাতরে খোঁচা লেগে বোধহয় ছিঁড়েছে। রিপু করাব।'

দরজা খোলার শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল বুড়ো দরজি। ছোটখাট মানুষ, মাথা জুড়ে টাক। কাউন্টারে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

ছেঁড়াটা দেখিয়ে কিশোর অনুরোধের সুরে বলল, 'এটা রিপু করে দেয়া যাবে? আমরা দাঁড়াই।'

হাসল বুড়ো। সোনায় বাঁধানো দুটো দাঁত দেখা গেল। 'খুলে দাও।'

দোকানের পেছনের ড্রেসিং রুমে ঢুকে প্যান্টটা খুলে ওখানে রাখা অন্য কাপড় পরে এল কিশোর। টেবিলে বসে কাজ শুরু করল দরজি। দুটো টুলে বসে দেখতে লাগল কিশোর আর রবিন।

পুরানো কাপড় মেরামত করার জন্যে দিয়ে গেছে অনেকেই, মেঝেতে স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে সেগুলো। সুন্দর একরোল স্যুটের কাপড় দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কাপড়ের অর্ডার কেমন পান?'

'এখানে আর কাজ কোথায়?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল দরজি। 'খালি ফুটোফাটা মেরামতের জন্যে নিয়ে আসে।'

'ওই যে, নতুন কাপড় রেখেছেন?'

'রেখেছি, যদি কেউ আসে স্যুট করাতে। কিন্তু আসে না, রেডিমেড পোশাকের দিকেই লোকের ঝোঁক,' প্যান্টের ফুটোর চারপাশে সুচ চালাতে চালাতে দুঃখ করে বলল বুড়ো, 'চল্লিশ বছর ধরে আছি এখানে। এখন আমার প্রধান ব্যবসা হলো ধোপাগিরি। কিন্তু দশ বছর আগেও অবস্থা এমন ছিল না। অনেকেই আসত পোশাক বানাতে। কাজ করতে করতে একেক সময় অস্থির হয়ে যেতাম। হ্যারিসনরা আসত, মবাররা আসত, আসত আরিগনরা। কত সুন্দর সুন্দর স্যুট যে ওদের বানিয়ে দিয়েছি আমি। আজ আর সে-সব দিন কোথায়!'

'আরিগন?'

'হ্যাঁ, আরিগন, একটা চমৎকার পরিবার। এই এলাকার অনেক পুরানো বাসিন্দা। টাকাও ছিল, বিলাসিতাও ছিল। বুড়ো আরিগন, লম্বা, সুদর্শন একজন মানুষ। আর তার স্ত্রীর কথা কি বলব, খুবই শৌখিন ছিল। সুন্দরী একটা মেয়ে ছিল তাদের, দুটো যমজ ছেলে ছিল—লম্বা, সুন্দর, একেবারে বাপের মত। চেহারায় এত মিল, কে যে কোনটা আলাদা করাই মুশকিল।'

'যমজ!' উত্তেজনা দেখাতে গিয়েও তাড়াতাড়ি সেটা সামলে নিল রবিন, বুড়োকে সন্দিহান করে তোলা যাবে না, 'দারুণ তো? কি হলো পরিবারটার? এখন আর কাপড় বানাতে আসে না কেন?'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল দরজি, 'থাকলে তো আসবে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কে কোথায় চলে গেছে কে জানে। মেয়েটার খবর জানি না। যমজদের একজন, নুবার আরিগন শহর ছেড়ে একেবারেই চলে গেছে। আরেকজন, ডোবার, কালেভদ্রে আসে।' আবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল বুড়ো। 'তবে কাপড় আর বানাতে আসে না সে-ও। হাতে তৈরি জমকালো পোশাক পরা ছেড়েই দিয়েছে। পরে কেবল সাদাসিধা কাপড়, যেগুলো পরলে হাঁটাচলার সুবিধে হয়।...নাও, তোমার এটা হয়ে গেছে।'

প্যান্টটা পরে নিল কিশোর। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তবে রবিনের মতই সেটা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, হ্যারি'জ কার্নিভ্যালটা এখন

কোথায়, বলতে পারবেন? একবার দেখেছি। কিন্তু আমার বন্ধুর,' রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'আরেকবার দেখার ইচ্ছে।'

ওয়েস্টবাস্কেট থেকে খুঁজে পেতে দোমড়ানো একটা পোস্টার বের করে আনল বুড়ো। দিল কিশোরকে। কবে কোনখানে যাবে কার্নিভ্যালটা, তার শিডিউল করা আছে। বুড়োর মজুরি মিটিয়ে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

আরও চমক অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। কয়েক গজ এগোতে না এগোতেই একটা ওষুধের দোকান থেকে লম্বা একজন মানুষকে বেরোতে দেখল ওরা। আরিগান! মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ফিসফিস করে রবিন বলল, 'বাড়িটা জোরেই মেরেছে পিচার!'

'তাই তো মনে হচ্ছে। ইনি কোন জন, নুবার, নাকি ডোবার, জানতে পারলে ভাল হত। দেখা যাক, কার্নিভ্যালের হুমবা নতুন কিছু জানাতে পারে নাকি আমাদের।'

বারো

তখনও ঘুমাচ্ছে মুসা, কিন্তু বাচ্চাটা জেগে গেছে। কিশোর আর রবিনের সাড়া পেয়ে খেউ খেউ শুরু করল।

জেগে গেল মুসা। লাল চোখ মেলে হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও কি ফরেস্টবার্গেই আছি?'

'দুই ঘণ্টা ধরে আছি,' জবাব দিল রবিন। 'তোমার স্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছে?'

'হয়েছে। তোমাদের কি খবর?'

বলতে লাগল রবিন। শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার, ঘুম চলে গেল বহুদূরে। একটা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়েছে কিশোর।

স্টার্ট দিল রবিন। শহর থেকে বেরিয়ে কিশোরের নির্দেশে পশ্চিমে যাওয়ার একটা রাস্তা ধরল।

'যাচ্ছি কোথায়?' জানতে চাইল মুসা।

'রিভারভিল,' জবাব দিল কিশোর। 'ওখানেই আছে এখন কারনিভ্যালটা। মেইন রোড দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই রাস্তায় গেলে সময় অর্ধেক লাগবে আমাদের।'

সরু, এবড়োখেবড়ো কাঁচা পথটার জন্যে উপযুক্ত ক্যাপ্টেনের গাড়িটা। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। পথের মাঝে মাঝে গর্ত, আগে থেকে খেয়াল না করলে ওগুলোতে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটাবে। দুই ধারে ঘন বন। কখনও নালা এগিয়ে যাচ্ছে পথের সমান্তরালে, কখনও শৈলশিরা। একটা বাড়িঘরও চোখে পড়ল না কোথাও।

কয় মাইল এসেছে মিটারে দেখে নিয়ে কিশোর বলল, 'আর বোধহয় বেশি দূরে নেই।...হায় হায়, ওটার আবার কি হলো? এমন জায়গায় গাড়ি খারাপ হলে তো সর্বনাশ!' নিজেদের কথাও ভাবল সে। পথের পাশে একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এই মন্তব্য করল সে। গাড়িটার বনেট ওপরে তোলা। দু-পাশ থেকে ঝুঁকে তার নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে দু-জন লোক, ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না একজনেরও।

'কি হলো দেখা দরকার,' কিশোর বলল। 'বিপদে পড়েছে মনে হয়। দেখি, কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।'

'কিশোর,' সন্দেহ জেগেছে রবিনের, 'ওরা আমাদের গাড়ি থামানোর জন্যে এই বাহানা করছে না তো? ক্যাপ্টেনের গাড়ি দেখে হয়তো দেখতে এসেছে, ব্যাপারটা কি?'

'সেটা কথা না বললে বোঝা যাবে না। ওরা দু-জন, আমরা তিনজন, সাবধান থাকব, তাহলেই কিছু করতে পারবে না।'

গাড়ি থামাল রবিন। ওরা তিনজন বেরোতে না বেরোতেই লাফ দিয়ে এগিয়ে এল বিরাট এক কুকুর। গাড়ির ওপাশে ছিল এতক্ষণ।

'খাইছে!' তাড়াতাড়ি মুসা বলল, 'এই ফগ বেরোবি না, বেরোবি না, খেয়ে ফেলবে!' কিন্তু আকারের তুলনায় কুকুরটা ভদ্র, কৌতূহলী ভঙ্গিতে তার হাত শুঁকতে লাগল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল একজন লোক। হালকা-পাতলা গঠন, লাল চুল। কুকুরটাকে ডাকল, 'এই মবি, আয় এদিকে।' মুসাকে বলল, 'ভয় পেয়ো না। ও কামড়ায় না।'

'কি হয়েছে গাড়ির?' জানতে চাইল কিশোর।

'চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারছি না।'

এগিয়ে গেল মুসা। ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি একবার দেখি?'

'গাড়ির কাজ জানো নাকি?' জিজ্ঞেস করল উজ্জ্বল রঙের প্রিন্টের শার্ট পরা অন্য লোকটা।

'কিছু কিছু।'

'তাহলে দেখো কিছু করতে পারো কিনা। কি যে বিপদে পড়লাম!'

শার্টের হাতা গোটাতে লাগল মুসা, 'দেখি, টুলস কি আছে দেন?'

টুলস বক্স বের করে দিল লালচুল লোকটা।

একটা স্প্যানার নিয়ে ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকল মুসা। কয়েক মিনিট পর হাসি মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'যান, ঠিক হয়ে গেছে। কন্ডেন্সারে গোলমাল ছিল।'

এত তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারল না লোকগুলো। প্রিন্টের শার্ট পরা লোকটা গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসে ইগনিশনে মোচড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট হয়ে গেল গাড়ি।

বিস্ময় দেখা দিল লালচুল লোকটার চোখে। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো দেখি গাড়ির জাদুকর হে! কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি···বাঁচালে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'

জানা গেল, গাড়িটা একটা স্কুলের। ফরেস্টবার্গে যাওয়ার পথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে। তিন গোয়েন্দাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আবার নিজের পথে রওনা হয়ে গেল লোকগুলো।

'তারমানে ওরা শত্রুপক্ষ নয় আমাদের?' গাড়ি চালাতে চালাতে প্রশ্ন তুলল রবিন।

'মনে হয় না,' জবাব দিল কিশোর। 'আচরণে তো সে-রকম মনে হলো না।'

'হতে পারে,' পেছন থেকে মুসা বলল, 'ওরা ভেবেছিল, ক্যাপ্টেন রিচটন আছেন গাড়িতে। তাঁকে দেখলেই অন্য রকম আচরণ করত। আমাদের দেখে আর কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেনি···'

'কি জানি। আমার সে-রকম মনে হয়নি।'

'তবে ইঞ্জিনে কিন্তু সত্যি গোলমাল হয়েছিল। ওটা বাহানা কিংবা সাজানো নয়।'

রিভারভিলে পৌঁছল গাড়ি। তৃতীয়বারের মত হ্যারি'জ কার্নিভ্যালে এল গোয়েন্দারা। খেলা শুরু হয়নি এখনও। একজন টিকেট কালেক্টরকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হুমবাকে কোনখানে পাওয়া যাবে।

কর্নেল যে তাঁবুতে খেলা দেখায় তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ছোট সাদা রঙের একটা ক্যারাভান ট্রেলার। ওটাতেই থাকে অ্যানিমেল ট্রেনার। ছেলেরা কাছে এসে দাঁড়াতেই খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল খেলা দেখানোর পোশাক পরা হুমবা।

এগিয়ে গেল কিশোর। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'মিস্টার আরিগন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। একটু দাঁড়াবেন, প্লীজ!'

'আরিগন' নামটা শুনেই থমকে গেছে হুমবা। কিশোর দাঁড়াতে না বললেও দাঁড়াত। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এই নাম জানলে কি করে তুমি?'

'আরিগন নামে আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের, চেহারার এত মিল, আপনার ভাই বলেই চালিয়ে দেয়া যায়। খুব ভাল করে খুঁটিয়ে না দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে দু-জন দুই লোক। যখন জানলাম, ওই ভদ্রলোকের একজন ভাই আছে, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলতে অসুবিধে হলো না। একটা কথা বুঝতে পারিনি, নুবার কে, আর ডোবার কে?'

দ্বিধা করল হুমবা, তারপর বলল, 'আমি নুবার।' সঙ্কোচ বোধ করছে লোকটা। হাসল, তাতেও সঙ্কোচ। 'আসলে নিজের পরিচয় দিতেই এখন লজ্জা লাগে, বিলাসিতা করে ফকির হওয়া মানুষদের কেউ দেখতে পারে না।

এতে যদিও আমাদের খুব একটা দোষ ছিল না, আমাদের বাবাই দায়ী…যাই হোক, আসল নামটা রাখলে এই এলাকায় বেকায়দায় পড়ে যেতাম, কে যায় লোকের অহেতুক মন্তব্য শুনতে, তাই বদলেই ফেললাম। অনেক আগে চলে গেছি তো আমরা এই এলাকা ছেড়ে, এখন নিজে থেকে পরিচয় না দিলে সহজে কেউ আর চিনতে পারবে না।…কিন্তু তোমাদেরকে এত কথা বলছি কেন? তোমরা কারা?'

'আমরা ইতিহাসের ছাত্র, অনেক দূরে লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচ থেকে বেড়াতে এসেছি। ভাবলাম, এসেছি যখন, এই এলাকার ইতিহাস যতটা সম্ভব জেনে যাই, পরীক্ষার সময় কাজে লাগবে। ডাচ পেনসিলভ্যানিয়া সম্পর্কে এমনিতেও আমাদের কৌতূহল আছে।'

'ও,' কিছু সন্দেহ করল না নুবার।

'আপনাদের তো শুনলাম অনেক জায়গা-সম্পত্তি আছে এখনও, ফকির বলছেন কেন? পুরো ব্ল্যাক হোলোটাই আপনাদের।'

মাথা ঝাঁকাল নুবার, 'অনেক বড় সম্পত্তি, তা ঠিক। কিন্তু সেটা নিয়ে মারামারি করলে তো আর ভোগ করা যায় না। বাবা মারা যাওয়ার পর জায়গাটা নিয়ে কি করব আমরা, এই একটা সামান্য ব্যাপারেই একমত হতে পারিনি এখনও তিন ভাইবোন। কেস চলছে। তর্কের পর তর্ক করে চলেছে তিন পক্ষের উকিল। কেউ কোন সমাধানে আসতে পারেনি।

'সম্পত্তি থেকে একটা কানাকড়িও পাই না। বসে থাকলে তো আর পেট চলে না, তাই এই কাজ নিয়েছি। জন্তু-জানোয়ারে আমার ছোটবেলা থেকেই আগ্রহ। শখের বশে জানোয়ারকে ট্রেনিং দেয়ার কাজটাও শিখে ফেললাম। সেই শিক্ষাই এখন আমার রুটিরুজির উপায়। এই কাজকে ভাল চোখে দেখে না আমার অন্য দুই ভাইবোন। না দেখুক, আমিও তাদের কাছে যাই না…' সরাসরি কিশোরের দিকে তাকাল নুবার। 'ডোবারের সঙ্গে তাহলে ব্ল্যাক হোলোতেই দেখা হয়েছে তোমাদের? সে যে এই এলাকায় এসেছে আবার, জানতাম না। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। ওখানে কি করছে?'

'তেমন কিছু না। সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছে ব্ল্যাক হোলোর পুরানো কেবিনটায়।'

'সন্ন্যাসী!' বিস্ময়ে কাছাকাছি হয়ে গেল নুবারের ঘন ভুরুজোড়া। 'অসম্ভব! ও টাকা ছাড়া চলতে পারে না! বিলাসিতা ছাড়া বাঁচতে পারে না!'

'দেখে তো মনে হলো, বেশ সুখেই আছে,' খোঁচা দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করল কিশোর।

'কি জানি!' নাক চুলকাল নুবার। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! পাগলই হয়ে গেল না কি…সত্যি যদি তার এই পরিবর্তন হয়ে থাকে, খুশিই হব।'

'খাওয়া-দাওয়ায়ও বিলাসিতা তেমন আছে বলে মনে হয় না,' মুসা বলল। 'সেদিন একটা আধমরা ভেড়া কিনে নিয়ে যেতে দেখলাম। ওই বুড়ো

ভেড়ার মাংসই বোধহয় খান।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল নুবারের। আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এতটা পরিবর্তন! নাহ্, কিছু বুঝতে পারছি না! ভেড়ার মাংস দু-চোখে দেখতে পারে না ও। এখন সেই মাংসই খায়, তা-ও আবার বুড়ো ভেড়ার...'

'পুষতে-টুষতে নেননি তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মাথা খারাপ! জন্তু-জানোয়ার তার শত্রু। একটা কুত্তা পর্যন্ত পালতে পারল না কোনদিন।'

'কুত্তার কথাই যখন উঠল—কি ভাবে নেবেন আপনি জানি না, মিস্টার আরিগন—তবু বলেই ফেলি,' কিশোর বলল। 'যদি বলি আপনার ভাই কুত্তা কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত?'

কি ভাবে নিয়েছে নুবার, সেটা তার চেহারা দেখেই অনুমান করা গেল, বজ্রাহত হয়ে পড়েছে যেন। সামলে নিতে সময় লাগল। বলল, 'এই পরিণতিই হবে, আমি জানতাম! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! আর আমাদের পরিবারের পাপ হলো ভয়াবহ বিলাসিতা! এতক্ষণে বুঝতে পারছি, ওই কেবিন কেন থাকছে ও। সন্ন্যাসীর মত থাকার ছুতোয় নিশ্চয় কোন কুকাজ করে বেড়াচ্ছে। হায়রে, জমিদারের ছেলের শেষে এই পরিণতি!' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। টিকেট কেটে লোকে বসে থাকলে বিরক্ত হয়।'

তাঁবুর দিকে ধীরপায়ে হেঁটে চলে গেল অ্যানিমেল ট্রেনার।

রবিন বলল, 'সত্যি কথাই তো বলল বলে মনে হলো। কিশোর, কি মনে হয়, ভাইয়ের সঙ্গে সে-ও জড়িত নয় তো?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, দেখলে না, খবর শুনে সত্যি সত্যি দুঃখ পেয়েছে। এই লোক কোন খারাপ কাজে জড়িত নয়।'

'হুঁ,' চুপ হয়ে গেল রবিন।

'কথা তো বলা হলো,' মুসা বলল, 'এরপর কি কাজ? কি করব এখন? আজও ঢুকব পুমার খেলা দেখতে?'

'নাহ্, এক খেলা ক'বার দেখে। আর কোন কাজ নেই এখানে। চলো, ব্ল্যাক হোলোতে ফিরে যাই।'

ডোবারের ওপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। রাত্রে কি করে লুকিয়ে থেকে দেখবে। কেবিনে ফিরে তাই আর কোন কাজ না পেয়ে, খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে নিল পুরো বিকেলটা। রাতে আবার জাগতে হবে, হয়তো সারারাতই, কে জানে?

সূর্য ডোবার পর তাকে আর রবিনকে ডেকে তুলল মুসা। ডিনার তৈরি করে ফেলেছে।

পেট ভরে খেয়ে নিল তিনজনে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, পরিষ্কার, ঝকঝকে আকাশে তারা জ্বলছে। আজ রাতে আর ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠতে দেরি আছে। রাতের অভিযানের জন্যে তৈরি হতে লাগল ওরা। গাঢ় রঙের পোশাক পরে নিল, যাতে অন্ধকারে ভালমত লুকিয়ে থাকতে পারে।

বেরিয়ে পড়ল ওরা। শব্দ করে ওদের অস্তিত্ব ফাঁস করে দিতে পারে, এই ভয়ে ফগকে বেঁধে রেখে এল রান্নাঘরে। হোলোর পথঘাট এখন মোটামুটি পরিচিত। রাতে টর্চ নিভিয়ে চলতেও আর তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। নিরাপদেই চলে এল ডোবারের কেবিনটার কাছে। ঘন অন্ধকারে আবছামত চোখে পড়ল ওটার অ কৃতি। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আসছে খুব সামান্য কমলা রঙের আলো।

পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল ওরা।

কথা শোনা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে। ডোবার না একা থাকে বলল, তাহলে কথা বলছে কার সঙ্গে? মনোযোগ দিয়ে শুনে অন্য কণ্ঠটা কার চিনে ফেলল কিশোর, উকিল আর্নি হুগারফ। অবাক হয়ে ভাবল, এই লোক এখানে কি করছে!

'…বললাম না, ডরোথির সঙ্গে দেখা করেছি আমি!' হুগারফ বলছে, 'একচুল নড়াতে পারিনি ওকে। তার সেই এক কথা।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে চেয়ার ঠেলে সরানোর শব্দ হলো। শোনা গেল ডোবারের ভারি গলা, 'অসহ্য! এ একটা জীবন হলো নাকি! এ ভাবে বাঁচা যায়! আর দেরি করতে পারব না, আমি আমার সম্পত্তির ভাগ এখনই চাই!'

'চাইলেই তো আর হলো না, মীমাংসা করতে হবে আগে…আমিও বিরক্ত হয়ে গেছি। অনেক টাকা পাওনা হয়ে গেছে তোমার কাছে, সেটা যে কবে পাব কে জানে! আসল কথা বলো এখন, এদিকের খবর কি?'

জবাব শোনার আশায় কান খাড়া করে রইল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু কথা শোনা গেল না, তার পরিবর্তে চেয়ার টানাটানি…

কথা বলছে না কেন? ভাবল কিশোর। নাকি হুগারফকে কিছু দেখাচ্ছে ডোবার?

হঠাৎ তার কাঁধ খামচে ধরল মুসা। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'কেউ আসছে! একদম নড়বে না!'

পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন কিশোর আর রবিনও। দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আশা করল, এ ভাবে থাকলে, যে আসছে তার চোখে পড়বে না ওরা এই অন্ধকারে। কিন্তু যদি টর্চ জ্বালে? আর আসছেটাই বা কে? ভাইয়ের পরিস্থিতির খবর পেয়ে তাকে দেখতে এসেছে নুবার? নাকি পিচার? পিচার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ এখানে ডোবারের পিছে লেগে থাকে সে; নিশ্চয় কারা আসে কারা যায় লক্ষ করে।

হঠাৎ করেই থেমে গেল পদশব্দ। পনেরো মিনিট চুপ করে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল গোয়েন্দারা। কিন্তু আগন্তুকের আর কোন সাড়া নেই।

তেরো

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলল ওরা, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

কেবিনের ভেতর আবার ভারী গলায় কথা বলে উঠল ডোবার, 'খুব শীঘ্রি কিছু টাকা পেয়ে যাব। না পেলে আমারও চলবে না আর। কিছু একটা করতেই হবে!'

'হ্যাঁ, ভাল কথা, ছেলেগুলোর কি খবর?' আচমকা প্রশ্ন করল হুগারফ।

'যায়নি এখনও। আমার মনে হয় রিচটনের ভাবনাটা এখনও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।'

ওদের কথাই আলোচনা হচ্ছে, বুঝতে পারল কিশোর।

'ভাগাতে হবে তো। নইলে কখন কোন বিপদে ফেলে দেবে কে জানে! সাংঘাতিক ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব।'

'বুঝতে পারছি না কি করব? দেখা যাক!'

দরজা খোলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো। দেয়ালের সঙ্গে গা চেপে ধরে মিশে রইল তিন গোয়েন্দা, পারলে পাথরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায়।

খোলা দরজা দিয়ে আলো পড়ল ঘাসের ওপর। বেরিয়ে এল উকিল। পেছনে আবার দরজা লাগিয়ে দিল ডোবার। বনে গিয়ে ঢুকল হুগারফ, পায়ের শব্দ ঢাকার কোন চেষ্টাই করল না।

পথের ধারের একটা কালো ঝোপ নড়ে উঠল বলে মনে হলো কিশোরের, মুসারও চোখে পড়ল ব্যাপারটা। তারমানে এতক্ষণ কেউ লুকিয়ে ছিল ওখানে।

এগিয়ে গেল হুগারফের পদশব্দ। যে ঝোপটা নড়েছে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ছায়ামূর্তি। পিছু নিল উকিলের।

'আমাদের ওপর নয়,' ফিসফিস করে মুসা বলল, 'হুগারফের ওপর নজর রাখছিল। কোথায় যায় দেখব?'

'দেখো তো,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা এখানেই আছি। দেখি, আর কি ঘটে, আর কেউ আসে কিনা?'

কয়েক মিনিট পরই ফিরে এল মুসা। জানাল, 'পিচারের মতই মনে হলো। ও আসলে চোখে চোখে রাখছে লোকগুলোকে।'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'স্বাভাবিক কৌতূহল হতে পারে। নিশ্চয় সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছে।'

বসে আছে তো আছেই ওরা। খুব ধীরে কাটছে একঘেয়ে সময়, স্থির হয়ে আছে যেন। কিন্তু আকাশের তারাগুলোর স্থান পরিবর্তন প্রমাণ করে

দিল, না, ধীরে হলেও সময় কাটছে। পুবের আকাশে হালকা একটা আভা ফুটল। অবশেষে গাছপালার মাথার ওপর বেরিয়ে এল কাস্তের মত বাঁকা হলুদ চাঁদ। হালকা, কনকনে ঠাণ্ডা একঝলক বাতাস যেন লাফ দিয়ে এসে নামল বদ্ধ উপত্যকাটায়।

আবহাওয়া পরিষ্কার হলে কি হবে, পার্বত্য এলাকার ঘন শিশির ঠিকই পড়তে লাগল। ভিজিয়ে দিল ছেলেদের চুল, কাপড়। সেঁতসেঁতে কাপড় পরে থাকাটা এমনিতেই অস্বস্তিকর, তার ওপর এই ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপুনি ধরিয়ে দিল শরীরে। একভাবে বসে থেকে থেকে পায়ের পেশীতে খিল ধরে গেছে।

এতক্ষণ ডোবারের কেবিনের দরজায় যে হালকা আলোটা ছিল, সেটাও নিভে গেল। শুয়ে পড়েছে বোধহয় সে। আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। উঠল ওরা। ফিরে চলল নিজেদের কেবিনে।

খাড়া পথ বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরল মুসা, 'শুনছ!'

অবশ্যই শুনছে কিশোর আর রবিনও। কাঁপা কাঁপা একটা টানা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'নিশ্চয় সেই পেঁচাটা!' রবিন বলল। 'এল কোনখান থেকে?'

'হোলোর ওপার থেকে,' জবাব দিল কিশোর। 'মনে তো হলো, ডোবারের ঘরের কাছেই ডাকল।'

'ভালই হয়েছে,' কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল মুসা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে, 'আমরা ওখানে থাকতে ডাকেনি! তাহলে বারোটা বাজত! ভূতের সঙ্গে পেঁচার বড় ভাব! একসঙ্গে উড়ে চলে ওরা আকাশপথে!'

হোলোর ওপর উঠে এল ওরা। কেবিনের আলোর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অন্য এক জগৎ থেকে যেন বেরিয়ে এল পরিচিত পৃথিবীর অভ্যস্ত পরিবেশে। ভূত বিশ্বাস না করলেও, মুসার মত ভয় না পেলেও পেঁচার ডাকটা অন্য দু-জনেরও ভাল লাগেনি।

কেবিনে ঢুকে দেখল, ভালই আছে ফগ। মুসাকে দেখে আদুরে গলায় কুঁই কুঁই শুরু করল। এগিয়ে গিয়ে ওটাকে আদর করল সে।

ঘুমানোর আগে ঠাণ্ডা দূর করার জন্যে মগে গরম চকলেট ঢেলে নিয়ে বসল তিনজনে।

মগে চুমুক দিয়ে রবিন বলল, 'তাহলে বোঝা গেল, হুগারফ ডোবারের উকিল। এবং দু-জনেই টাকার পাগল।'

'কিছু টাকা আসবে বলল ডোবার,' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কোত্থেকে আসবে বলো তো?'

'আর যেখান থেকেই আসুক, সম্পত্তি বিক্রি করে নয় এটা ঠিক,' কিশোর বলল। 'এখনও জায়গাটার কোন মীমাংসাই হয়নি।'

'বেআইনী কিছু করছে না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি! তবে টাকার যখন এত লোভ, করলে অবাক হব না। তার

ভাইয়েরও তো সে-রকমই সন্দেহ।'

'কিশোর,' মুসা বলল, 'হুগারফের পাওনা টাকা দেয়ার ভয়ে কোথাও গিয়ে লুকাননি তো ক্যাপ্টেন?'

মাথা নেড়ে রবিন বলল, 'আমার মনে হয় না। একজন পুলিশ অফিসার, মিস্টার সাইমনের বন্ধু, হুগারফের মত একটা ছেঁচড়া লোক তাঁর কাছে টাকা পাবে, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'ডোবারের কথা শুনে কিন্তু মনে হলো, টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিছু একটা ঘটাবে মনে হলো। কি, বলো তো?'

'এটা জানলে তো অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যেত। চলো, শুয়ে পড়ি, রাত প্রায় শেষ। এখন মাথা ঘামিয়ে কিছু করতে পারব না, কাজ করবে না মগজ। তবে একটা কথা বলে রাখি, কাল সকালে উঠেই ডরোথি আরিগনের খোঁজে বেরোব আমরা। দুই ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা হলো, বোনকে বাদ দেয়া উচিত না। হয়তো ওখানে জরুরী কোন তথ্য পাওয়া যাবে।'

'পাবে কোথায় তাকে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দেখি, সে-কথা সকালে উঠে ভাবব।'

অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল ওদের। কুকুরের বাচ্চাটা খুব শান্ত, ডাকাডাকি করে অহেতুক বিরক্ত করেনি বলেই ওরা ঘুমাতে পারল।

নাস্তার টেবিলে বসে ঘোষণা করল কিশোর, 'খেয়ে ফরেস্টবার্গে রওনা হব। প্রথমে ডরোথি আরিগনের নামটা খুঁজব টেলিফোন গাইডে। না পেলে তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।'

'কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল রবিন।

'খোঁজখবর করব। মহিলাদের খবর মহিলারাই বেশি রাখে। মহিলারা চালায় এমন সব দোকানে ঢুকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করব। পুরুষেরা মুখ বন্ধ রাখলেও মহিলারা অতটা রাখতে পারবে না। কিছু না কিছু ফাঁস করে দেবেই।'

সুতরাং নাস্তা সেরেই বেরিয়ে পড়ল ওরা।

ফরেস্টবার্গে এসে সহজেই পেয়ে গেল ডরোথি আরিগনের ঠিকানা। কোর্টহাউসে পাবলিক টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে যেখানে, সেখানে একগাদা ফোনবুক পাওয়া গেল। ফরেস্টবার্গের আশেপাশে আরও যে ক'টা শহর আছে, সবগুলোর ফোন নম্বর আছে একটা বইতে। দেখা গেল, ডরোথি বাস করে ব্রুকউডে।

ম্যাপ দেখে রাস্তা বের করে ফেলল কিশোর। গাড়ি চালাল রবিন।

দুপুরের একটু আগে লাল গাড়িটা এসে ঢুকল ব্রুকউডের শান্ত, প্রায় নির্জন মেইন রোডে। দুই পাশে বড় বড় সাদা বাড়ি, সামনে সুন্দর লন আর বাগান। প্রচুর গাছপালা আছে।

'সুন্দর শহর,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'পুরানোও।'

'এক কাজ করলে হয় না?' রবিন বলল, 'ডরোথির সঙ্গে দেখা করার আগে তার সম্পর্কে বাইরের লোকের কাছে একটু খোঁজখবর নিয়ে নিই। কথা বলতে সুবিধে হতে পারে।'

'মন্দ বলনি।'

একজায়গায় বেশ কয়েকটা পুরানো বাড়ি প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকতে দেখা গেল। বাণিজ্যিক এলাকা, আন্দাজ করল কিশোর। গাড়ি রাখতে বলল রবিনকে।

সাইনবোর্ড দেখে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। কুকুরের বাচ্চাটাকে গাড়িতে রেখে এসেছে। দোকানের ভেতরের চেহারা দেখে দমে গেল মুসা। বলল, 'এখানে ঢুকে লাভটা কি হলো? খাওয়ার জিনিস পাব বলে তো মনে হয় না। সবই বুড়োবুড়ি; দেখগে, সবগুলো ডায়েট কন্ট্রোল করে।'

'এদের কাছেই তো খবরটা পাওয়া যাবে,' হেসে বলল কিশোর। 'কাজ নেই কর্ম নেই, মানুষের সমালোচনা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওদের।'

ওরা টেবিলে গিয়ে বসতেই লম্বা, মাঝবয়েসী অ্যাপ্রন পরা এক মহিলা এগিয়ে এল।

'গুড মর্নিং,' বলল কিশোর। 'আমরা বহুদূর থেকে এসেছি, বেড়াতে। খিদে পেয়েছে। ভাল কিছু দিতে পারেন?'

কিশোরের ভদ্রতায় খুশি হলো মহিলা। হেসে বলল, 'বসো, আনছি।'

মুসাকে অবাক করে দিয়ে ডিমের ওমলেট, ভেজিটেবল সালাদ আর বরফ ও তাজা মিন্টের ফ্লেভার দেয়া কোল্ড টী এনে দিল মহিলা। জিজ্ঞেস করল, 'চলবে?'

'চলবে মানে! এখানে এলে এই দোকান ছাড়া আর চা খেতেই ঢুকব না,' তাড়াতাড়ি ডিমের প্লেটটা টেনে নিল মুসা।

'আস্তে খাও,' রসিকতা করে বলল রবিন। 'বুড়োবুড়িদের খাবার, গলায় আটকে ফেলো না।'

চলে গেল মহিলা। ফিরে এল বড় এক প্লেট স্ট্রবেরি পাই নিয়ে। টেবিলে নামিয়ে রাখল।

আন্তরিক খুশি হলো মুসা। ঢোকার আগে যে অনীহাটা ছিল, একেবারে দূর হয়ে গেছে।

খেতে খেতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ডরোথি আরিগন নামে কাউকে চেনেন? ব্ল্যাক হোলোতে বিশাল সম্পত্তি আছে তাদের। আমার মা'র বান্ধবী। বলেছে দেখা করে যেতে। কিন্তু আমি চিনি না।'

'চিনব না কেন? অনেক বড় দরজির দোকান দিয়েছে। আশপাশের সব শহর থেকে লোকে কাপড় বানাতে আসে তার কাছে।'

'কাছেই থাকে?'

'হ্যাঁ। মহিলা বেশ ভাল, তবে অহঙ্কারী। এই অহঙ্কারটা অবশ্য আরিগনদের রক্তের দোষ, ওদের সবার মধ্যেই আছে। আর এই নিয়েই তো

গণ্ডগোলটা বেধেছে, কেউ কারও কথা মানতে চায় না, নিজের ইচ্ছেটাকেই প্রাধান্য দিতে চায়। পরিবারটাই ভেঙে গেল এ কারণে।'

নতুন কয়েকজন ঢুকল দোকানে। তাড়াহুড়ো করে সেদিকে চলে গেল মহিলা, আর কোন কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল না গোয়েন্দারা। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। ডরোথির বাড়িতে যাওয়ার সময় রবিন বলল, 'কি ভাবে কথা শুরু করবে তার সঙ্গে? ছুতোটা কি?'

'দেখি,' জবাব দিল কিশোর, 'একটা কিছু বের করেই ফেলব।'

পুরানো আমলের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি রাখল রবিন। এখানেই থাকে ডরোথি। একসঙ্গে সবাই ঢুকলে বিরক্ত হতে পারে মহিলা, সে-জন্যে কিশোর একাই চলল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে কাঁচের দরজায় লাল রঙে লেখা দেখতে পেল:

ড্রেস ডিজাইনার
ডরোথি আরিগন

খোলা দরজা। ভাল রকম সাজানো গোছানো একটা সিটিং রুমে ঢুকল কিশোর। কেউ নেই। হয়তো ভেতরে গেছে, আসবে ভেবে একটা সোফায় বসে পড়ল সে। চোখ বোলাতে লাগল সারা ঘরে। পুরু কার্পেট, চকচকে পালিশ করা আসবাবপত্র, চমৎকার ডেকোরেশন। ব্যবসা ভালই চলছে।

প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল একটা দরজা। ঘরে ঢুকল লম্বা, সুন্দরী এক মহিলা, বয়েস চল্লিশের কোঠায়, কালো চুল। গর্বিত ভঙ্গিই প্রমাণ করে দেয়, আরিগনদের বংশধর। তার পেছনে ছাগলছানার মত লাফাতে লাফাতে বেরোল হাসিখুশি একটা ছোট কুকুর। এগিয়ে এল কিশোরের দিকে।

ওটার মাথা চাপড়ে দিতে গিয়ে হাত থেমে গেল তার। মনে পড়ল: বাদামী রঙের কুকুর, একটা কান সাদা! গলায় কলার নেই, নাম লেখা ট্যাগ নেই। পটির ডব নয় তো এটা?

উঠে দাঁড়াল কিশোর, হেসে বলল, 'সুন্দর কুকুর। অবিকল একই রকমের আরেকটা কুকুর দেখেছি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। মনে হয় এটার ভাইই হবে। পেলেন কোথায়, মিস আরিগন?'

'আমার ভাই দিয়েছে,' মহিলা গোমড়ামুখো নয়, তবে ততটা আন্তরিকও নয়। 'বনের মধ্যে নাকি একা একা ঘুরছিল। মালিককে খুঁজে পায়নি। সে কুকুর পছন্দ করে না। তাই আমাকে দিয়ে গেছে।'

'ব্ল্যাক হোলোতে থাকেন যে, মিস্টার ডোবার আরিগন, তিনি নন তো?'

'চেনো নাকি?'

'পরিচয় হয়েছে। ওখানে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বনের মধ্যে দেখা হয়ে গেল, একটা পাথরের কেবিনে সন্ন্যাসী হয়ে আছেন মিস্টার আরিগন।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে ডরোথি, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, 'সন্ন্যাসী!'

'সে-রকমই তো মনে হলো। তিনিও তাই বললেন।'

'কি জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডরোথি। 'হ্যাঁ, বলো কি জন্যে এসেছ?'

'ডিজাইন। আপনার অনেক নামটাম শুনে মা বলছিল, আপনার কাছ থেকে পোশাকের একটা নতুন ডিজাইন নিতে পারলে ভাল হত। এদিকে একটা কাজে এসেছি, আপনার বাড়ির সামনে নেমপ্লেটটা দেখে হঠাৎ মনে পড়ল মা'র কথা। ঢুকে পড়লাম।'

হাসল মহিলা। 'তুমি খুব ভাল ছেলে, কবে কি বলল ঠিক মনে রেখে দিয়েছ। মায়ের কথা শোনে নাকি আজকালকার ছেলেরা! ঠিক আছে, তোমার মাকে গিয়ে বোলো আমার কাছে চিঠি লিখতে। কি চায় বুঝে দেখি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিলাকে লক্ষ করছে কিশোর। তাকে সন্দেহ করছে না তো? কিন্তু ডরোথির হাসিমুখ দেখে তার মনের কথা কিছুই আঁচ করতে পারল না সে। আর কোন প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে বলল, 'আচ্ছা, যাই।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাড়িতে এসে উঠল সে। কি জেনেছে জানার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিশোর বলল, 'পটির কুকুরটাকে খুঁজে পেয়েছি। চুরি করে এনে বোধহয় বোনকে দিয়ে দিয়েছে ডোবার।'

মুসা বলল, 'বলো কি? দান করার জন্যে চুরি করে, এমন কথা তো শুনিনি!'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না!'

'আর কি জানলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমাদের কাজে লাগার মত কিছু না। মহিলার ব্যবসা খুব গরম, এটা বুঝলাম। টাকার জন্যে সম্পত্তি বিক্রি কিংবা বেআইনী কাজ করার কোনই প্রয়োজন নেই।'

'তারমানে এগোনো আর গেল না,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'রহস্যের জট থেকেই গেল!'

'জট ছাড়াতে হলে একটা জায়গারই খুব কাছাকাছি থাকতে হবে, ব্ল্যাক হোলো। ভাবছি, আজ রাতে কেবিনে না থেকে বনের মধ্যেই ক্যাম্প করে থাকব কিনা। রাত হলে ফিরব আমরা। ঘরেও ঢুকব না, আলোও জ্বালব না। আমরা চলে গেছি মনে করে এমন কিছু করে বসতে পারে ডোবার, যা সব রহস্যের সমাধান করে দেবে।'

'এতটা সময় তাহলে কি করব?'

'ঘুরে বেড়াব। এলাকাটা দেখব।'

চোদ্দ

ক্যাপ্টেনের কেবিনের কাছে গাড়ি নিল না ওরা। পথের পাশে কয়েকটা গাছের

আড়ালে পার্ক করে রেখে অন্ধকারে নিঃশব্দে এসে ঢুকল কেবিনে। কুকুরটাকে বাঁধল রান্নাঘরে, তাকে সঙ্গে নেয়া যাবে না, কিছু দেখলে চিৎকার শুরু করবে। একা তাকে এ ভাবে ফেলে যেতে ভাল লাগছে ওদের, তবু কিছু করার নেই। স্লীপিং ব্যাগগুলো বের করে নিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের বনে, পায়েচলা পথ ধরে নেমে এল উপত্যকায়। একটা ঘন ঝোপের ধারে শোয়ার ব্যবস্থা করল।

চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে লাগল কিশোর। কয়েকটা তারা মিটমিট করছে। পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে আকাশ খুব একটা চোখে পড়ে না; পড়লে দেখত, দিগন্তের কাছে ইতিমধ্যেই জমে গেছে একটুকরো কালো মেঘ।

ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার।

অন্ধকারে মুসার ফিসফিসে কণ্ঠ শোনা গেল, 'শুনছ!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন, 'পেঁচা ডাকছে।'

কয়েক মিনিট পর আবার ডাক শোনা গেল, এবার অন্য রকম। কয়েকবার ডেকে থেমে গেল।

'এটা পেঁচা নয়!' গলা কাঁপছে মুসার। 'ডাইনী!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'পেঁচার মত ঠিক না, বরং মানুষের চিৎকারের সঙ্গে মিল আছে। প্রথম রাতে যেটা শুনেছিলাম, তার সঙ্গে এগুলোর একটারও মিল নেই।'

'সে-জন্যেই তো বলছি পেঁচা,' জোর দিয়ে বলল রবিন। 'তবে দু-রকম পেঁচা।'

'প্রথম দিনেরটা তাহলে কি ছিল...?' অন্ধকারে গাছের আড়াল থেকে লম্বা একটা ছায়ামূর্তিকে বেরোতে দেখে চমকে উঠে বসল মুসা, 'কে!'

চোখের পলকে দুটো টর্চের আলো বিদ্ধ করল মূর্তিটাকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, 'ও, তুমি, পিচার!'

'কি চাও?' জিজ্ঞেস করল মুসা, তারপর মনে পড়ল পিচার বোবা, জবাব দিতে পারবে না।

বসে পড়ল পিচার। কিশোর, রবিন, আর মুসার দিকে আঙুল তুলে হাত নাড়ল জোরে জোরে।

'মনে হয়, তাড়াতাড়ি এখান থেকে আমাদের পালাতে বলছে,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় কোন বিপদ! কি বিপদ, পিচার?' পকেট থেকে নোটবুকের পাতা ছিঁড়ে দিল সে। পেন্সিল বের করে দিল কিশোর।

টর্চের আলোয় দ্রুত একটা জানালাবিহীন কেবিন এঁকে ফেলল ছেলেটা। একমাত্র দরজা দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা বন্দুকের নল।

'ডোবারের কেবিন,' উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল রবিন। 'তার কাছে বন্দুক আছে। কি করছে...'

'দাঁড়াও,' বাধা দিল কিশোর, 'আরও কিছু আঁকছে।'

দুটো পেঁচার মাথা আঁকল পিচার। কিন্তু একটা পেঁচার খাড়া খাড়া কান, আরেকটার কান নেই বললেই চলে। পেঁচার চেয়ে বানরের মুখের সঙ্গেই ওটার মিল বেশি।

'আঁকিয়ে বটে!' আবারও প্রশংসা করতে হলো রবিনকে, 'দারুণ হাত! দেখলে, বলেছিলাম না পেঁচার ডাক? দুটো দু-রকম পেঁচা। একটার ডাকের সঙ্গে মানুষের গলার মিল বেশি, সেটাকেই ডাইনী ভাবে লোকে।'

এঁকেই ক্রস চিহ্ন দিয়ে দুটোকে কেটে দিল পিচার। হাত নেড়ে আবার চলে যেতে বলল তিন গোয়েন্দাকে।

'বুঝলাম না,' কিশোর বলল। 'পেঁচাকে ভয় পাও তুমি?'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিচার।

'ডাইনীর সঙ্গে পেঁচার সম্পর্ক আছে বলছ? ওগুলোর কবল থেকে বাঁচাতে চাও আমাদের?'

জোরে মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

'মনে হয়,' মুসা বলল, 'পেঁচাগুলোকে গুলি করার কথা বলছে ডোবার।'

মাথা নাড়ল পিচার, মুসার অনুমানও ঠিক না।

'নাহ্, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল। 'তবে ডাইনীই হোক, পেঁচাই হোক, কিংবা ডোবার, কারও ভয়েই এখান থেকে যাচ্ছি না আমরা। বুঝলে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল পিচার। তারপর নিরাশার ভঙ্গি করল।

কিশোর বলল, 'বরং একটা উপকার করতে পারো আমাদের। কুকুরের বাচ্চাটা একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, তাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধে হবে। একলা ওকে ঘরের মধ্যে ফেলে রাখাটা নিষ্ঠুরতা।'

মাথা ঝাঁকাল পিচার। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি করেই হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। অন্ধকারে বিড়বিড় করল কিশোর, 'সারাক্ষণই ডোবারের পেছনে লেগে আছে! নিশ্চয় তার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেছে লোকটা...পেঁচা এঁকে কি বোঝাতে চাইল, বুঝতে পারলে ভাল হত...'

বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়।

'সর্বনাশ, বৃষ্টি আসবে নাকি?' শঙ্কিত হয়ে উঠল রবিন, 'তাহলে তো আর বাইরে থাকা যাবে না।'

'মনে হচ্ছে আজ কিছু একটা ঘটবেই,' কিশোর বলল। 'ঝড় এখনও অনেক দূরে, আসতে দেরি আছে। দেখি, যতক্ষণ থাকতে পারি থাকব।'

কয়েক মিনিট পর খুট করে একটা শব্দ হলো।

'কি ব্যাপার? আবার ফিরে আসছে নাকি পিচার?' মুসার প্রশ্ন।

ছেলেটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল কিশোর। আরও গাঢ় হয়েছে অন্ধকার। মেঘ জমেছে আকাশে, তারার আলোও নেই।

আবার হলো শব্দটা।

তারপরই ভারি নীরবতাকে খান খান করে দিল ভয়াবহ, তীক্ষ্ণ চিৎকার। পরক্ষণে আবার। কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আরও একবার। কেমন যেন মানুষের চিৎকারের মত।

'প্রথম রাতে এই চিৎকারই শুনেছি! নিশ্চয় কেউ বিপদে পড়েছে!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'জলদি ওঠো!'

'ডাইনীটা তো আছেই দেখা যাচ্ছে, গল্প নয়!' জুতো পায়ে গলাতে গলাতে বলল মুসা। 'কাউকে ধরে এনে রক্ত খাওয়ার তাল করছে নাকি?'

জবাব দিল না কেউ। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

কিশোরের জুতো পরা শেষ। বলল, 'কাছেই কোথাও। চলো।'

টর্চ জ্বেলে দৌড় দিল ওরা। কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর, কারণ আবার শোনা গেল চিৎকার। কোনখান থেকে আসছে বোঝার চেষ্টা করল। 'উপত্যকার নিচে নয়, ওপরে, ঢালের গায়ে রয়েছে,' বলল সে। বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া পায়েচলা পথটা ধরে ছুটল আবার।

ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল আবার।

হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, 'আর তো শোনা যাচ্ছে না! যাব কোনদিকে?'

'আমি কিন্তু আরেকটা শব্দ শুনছি,' কান পেতে আছে মুসা। 'তোমার শুনছ না?'

শোনাটা কঠিনই। কারণ এখন আর নীরব হয়ে নেই রাতটা। ঝড় আসার সঙ্কেত জানিয়ে শুরু হয়ে গেছে প্রবল বাতাস, দমকে দমকে ঢেউয়ের মত আসছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই আলোয় চোখে পড়ছে দুলন্ত গাছের মাথা, পাগল হয়ে উঠেছে যেন গাছগুলো। এদিকে মাথা নোয়াচ্ছে, ওদিকে হেলে পড়তে চাইছে, মড়মড় করে উঠছে ডাল, পাতার মধ্যে দিয়ে শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে দিয়েও শব্দটা ঠিকই কানে আসছে মুসার।

'কিসের শব্দ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মানুষের চিৎকার বলে মনে হলো…কিন্তু বাতাস যা আরম্ভ করেছে, বুঝতে পারছি না…'

বড় করে বিদ্যুৎ চমকাল, থাকল অনেকক্ষণ। হাত তুলে কাছের একটা গাছ দেখাল রবিন। চুপ করে বসে আছে একটা পেঁচা, বাতাসের পরোয়া করছে না, বড় বড় চোখগুলো কেমন ভূতুড়ে লাগল। ক্ষণিকের জন্যে দেখা গেল দৃশ্যটা, আলো নিভে যেতেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

আচমকা উপত্যকার নিচ থেকে ভেসে এল ভয়াবহ চিৎকার। ভীষণ চমকে দিল তিন গোয়েন্দাকে। মনে হলো এগিয়ে আসছে শব্দটা। তাড়াতাড়ি

কাছের একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। নজর বাঁয়ের একটুখানি ঘাসে ঢাকা খোলা জায়গার দিকে।

হঠাৎই চোখে পড়ল ওটাকে। কালো, ভারী একটা শরীর, বিশাল বেড়ালের মত চারপায়ে ভর করে বেড়ালের মতই হেলেদুলে বন থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গাটায়। তারপর নিঃশব্দে, যেন বাতাসে ভেসে পার হয়ে গিয়ে ঢুকল অন্য পাশের কালো বনের মধ্যে।

'বনবেড়াল!' ফিসফিসিয়ে বলল উত্তেজিত রবিন। 'এই তাহলে ডাইনী! চিৎকার ওটারই!

'কিন্তু এখানে বনবেড়াল আসবে কোত্থেকে?' প্রতিবাদ করল কিশোর, 'এই অঞ্চলে ওই জীব বাস করে না! তাছাড়া বনবেড়াল এত বড় হয় না।'

'চুপ!' ওদের থামতে বলল মুসা, এখনও আগের ক্ষীণ শব্দটা শোনার চেষ্টা করছে।

এইবার শুনতে পেল তিনজনেই। বাতাসের গর্জন আর বজ্রের গুড়ুগুড়ুকে ছাপিয়ে শোনা গেল পাতলা, কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার, বাচ্চা ছেলের কণ্ঠ, 'ডব! ডঅব! ডবিইইই!'

'খাইছে! এ তো পটি!' বলে উঠল মুসা, 'এত রাতে বনের মধ্যে এসেছে কুকুর খুঁজতে!'

'সামনেই আছে কোথাও!' কিশোর বলল।

তার কথা শেষ হতে না হতেই সেই ভীষণ চিৎকারটা আবার শোনা গেল। থেমে যেতেই কানে এল বাচ্চা ছেলের ভীত ফোঁপানোর শব্দ, 'ডব, ডবি, কোথায় তুই?...আমার ভয় লাগছে!'

আর শোনার অপেক্ষা করল না তিন গোয়েন্দা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল শব্দ লক্ষ্য করে। আবার চিৎকার করে উঠল বিশাল জন্তুটা।

পটারের কান্নার শব্দ জোরাল হচ্ছে, 'আমার ভয় লাগছে! আমি বাড়ি যাব! মা, মাগো, কোথায় তুমি!'

চিৎকার করে মুসা বলল, 'পটি, যেখানে আছো দাঁড়িয়ে থাকো! নোড়ো না!'

সামনে হঠাৎ পথ আটকে দিল একটা গাছের মাথা, চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ডালপাতা। নিচের উপত্যকায় গোড়া ওটার, মাথাটা উঠে এসেছে এখানে। তারমানে গর্তের কিনারে পৌঁছে গেছে গোয়েন্দারা, সামনে খাড়া হয়ে নেমেছে দেয়াল।

কিনারে এসে টর্চ জ্বেলে মরিয়া হয়ে পথ খুঁজল ওরা। প্রথমে চোখে পড়ল শুধু ঝড়ে দুলন্ত গাছপালার মাথা।

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

অবশেষে সবকটা টর্চের আলোই খুঁজে পেল ছোট্ট ছেলেটাকে। জারসি আর শর্ট ট্রাউজার পরনে, ওদের নিচে বড় একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। একহাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, আরেকটা হাত তুলে

রেখেছে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

কয়েক গজ দূরে টর্চের আলোয় ঝিক করে উঠল ভয়ঙ্কর দুটো সবুজ চোখ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে শিকারের দিকে। কেশে ওঠার মত শব্দ করল জানোয়ারটা। ধীরে ধীরে শরীরের সামনের অংশ নিচু হয়ে যাচ্ছে। লেজ নাড়ছে এপাশ ওপাশ। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ওটা।

বিশাল এক পুমা। হলুদ রঙ।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। গর্তের কিনারের একটা বড় পাথর দেখিয়ে বলল, 'কিশোর, ওই পাথরটা গড়িয়ে দাও···আমি পটিকে তুলে আনছি!'

জানোয়ারটার চোখে টর্চের আলো নাড়ছে রবিন, ওটাকে দ্বিধায় ফেলে দেয়ার জন্যে। তাতে আক্রমণ চালাতে দেরি করবে, সময় পাবে মুসা। কিশোর ছুটে গেল পাথরটার দিকে।

কোন রকম দ্বিধা না করে শূন্যে ঝাঁপ দিল মুসা। পড়ল বড় গাছটার মাথায়। একটা ডাল ধরে ফেলল। তারপর এ ডাল থেকে সে-ডালে দোল খেতে খেতে নেমে চলে এল পটির মাথার ওপরের একটা নিচু ডালে।

টর্চের আলো দেখে ওপরে তাকিয়ে আছে পটি।

দড়াবাজিকরের মত হাঁটু ভাঁজ করে ভেতরের দিকটা ডালে আটকে দিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল মুসা। দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'জলদি হাত ধরো!'

ভয়ে, বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে পটি। মুসার কথা যেন বুঝতেই পারল না। তাকিয়ে আছে নীরবে। তারপর যেন যন্ত্রচালিতে মত ধীরে ধীরে ওপর দিকে তুলে দিতে লাগল দুই হাত।

গর্জন করে সামনে ঝাঁপ দিল পুমাটা। একই সময়ে ডাল আর ঝোপঝাড় ভেঙে ওটার ওপর নেমে আসতে লাগল পাথর। মাটি ভিজে গোড়া আলগা হয়ে ছিল, কাজেই ঠেলে ফেলতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি কিশোরের।

থমকে গেল জানোয়ারটা। এই সুযোগে পটির হাত দুটো চেপে ধরে ওপর দিকে তুলে ফেলল মুসা। তাকে নিয়ে উঠে বসল ডালের ওপর।

লাফিয়ে উঠে দু-জনকেই ধরে ফেলতে পারত জানোয়ারটা। কিন্তু ওপর থেকে খসে পড়া বিরাট পাথর ঘাবড়ে দিল তাকে, একলাফে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। আর বেরোল না।

পটিকে নিয়ে গাছ বেয়ে ওপরে উঠে আসতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো মুসাকে। গাছের মাথার কাছে পৌঁছে একটা ডাল বেয়ে চলে এল খাদের কিনারে। হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে টেনে নিল কিশোর আর রবিন।

মুসাও নেমে উঠে এল খাদের কিনারে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে।

উত্তেজনা শেষ হয়ে যেতে হঠাৎ করেই যেন ক্লান্তিতে হাঁটু ভেঙে আসতে লাগল তিনজনের। খাদের কিনার থেকে সরে গিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

রবিন বলল, 'একটা খেলা দেখালে বটে তুমি, মুসা! টারজান ছবিতে হীরোর রোলটা চাইলেই তোমাকে দিয়ে দেবে পরিচালক।'

মুসা বলল, 'কাজে লেগেছে কিশোরের পাথর ফেলাটা। ওটা না পড়লে ভয়ও পেত না, যেতও না জানোয়ারটা। পটি আর আমি দু-জনেই মরতাম!'

ফোঁপাচ্ছে এখনও পটি। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল রবিন, 'কেঁদো না, আর ভয় নেই। বাড়ি নিয়ে যাব তোমাকে। কুকুরটাকে খুঁজতে এসেছিলে তো? ওটাকেও পেয়ে গেছি আমরা। শীঘ্রি এনে দেব।'

'সত্যি পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

ভয়ে, ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে ছেলেটা, হাঁটারও শক্তি নেই। তাকে কোলে তুলে নিল মুসা। টর্চ জ্বেলে আগে আগে চলল কিশোর, পেছনে রইল রবিন। সতর্ক রইল, অন্য কোন দিক দিয়ে ঘুরে এসে যাতে আক্রমণ চালাতে না পারে জানোয়ারটা। ঢাল থেকে নেমে, উপত্যকা পার হয়ে কেবিনে ওঠার পথটায় পড়ল ওরা। নিরাপদেই উঠে এল ওপরে। বিদ্যুতের বিরাম নেই, থেকে থেকেই চমকাচ্ছে। বনের বাইরে বেরিয়ে এসে এখন আকাশ চোখে পড়ছে। দেখা গেল, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, একখানে জড় হতে পারছে না, তীব্র বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে ইতিউতি।

কেবিনের পাশের খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দূরে হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই দেখো, ওটা কি?'

'আলো!' হোলোর অন্যপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের আলো?'

'ডোবারের কেবিনটার ওপর থেকে আসছে না?'

'সে-রকমই লাগছে,' কিশোর বলল। 'কিছু একটা ঘটছে ওখানে।'

'চলো, আগে পটিকে বাড়ি দিয়ে আসি। তারপর দেখতে যাব। সব কিছুর একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়ব আজ। রহস্যের মধ্যে এ ভাবে লটকে থাকতে ভাল লাগছে না আর।'

পথ বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে গাড়িতে উঠল ওরা। মিসেস ভারগনের বাড়ির সামনে এসে থামল। সব ঘরে আলো জ্বলছে। গাড়ির শব্দ শুনে পাগলের মত ছুটে বেরোলেন মহিলা। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমাকে সাহায্য করো! পটিকে খুঁজে পাচ্ছি না! নিশ্চয় বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে! সেই ভয়ঙ্কর ডাক শুনলাম...'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাকল পটি, 'মা, এই যে আমি!'

হাঁ হয়ে গেল বিস্মিত মা।

দরজা খুলে দিতেই পটি নেমে গেল। ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল মা। বুকে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগল।

'কুত্তা খুঁজতে বনে চলে গিয়েছিল সে,' মুসা জানাল মিসেস ভারগনকে। 'ওকে তো পেয়েছিই, ওর কুত্তাটাকেও পেয়ে গেছি আমরা। দু-একদিনে

মধ্যেই এনে দেব।'

'ব্ল্যাক হোলোতে পেয়েছ ওকে?' এই অন্ধকারে ঝড়ের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর জায়গায় চলে যাওয়ার মত দুঃসাহস করেছে তার ছেলে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন মহিলা।

'হ্যাঁ, ওখানেই পেয়েছি।'

'কুত্তাটাকে না পেয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। আর থাকতে না পেরে আজ...' ডাইনীর কথা ভেবেই বোধহয় থমকে গেল মহিলা। শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়নি তো তোর, পটি?'

অভয় দিয়ে বলল কিশোর। 'না, কোন ক্ষতি হয়নি। নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিন। সকালে সব কথা ও-ই বলবে আপনাকে। ডাইনীটা আসলে কি, তা-ও জানাবে।'

আবার এসে গাড়িতে চড়ল তিন গোয়েন্দা। এতটাই অবাক হয়েছে মিসেস ভারগন, ওদেরকে ধন্যবাদ জানানোর কথাও ভুলে গেল। ছেলেকে কোলে নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল গাড়িটার দিকে।

মুসাকে নির্দেশ দিল কিশোর, 'ডোবারের কেবিনটা যে পাশে আছে, ঘুরে ওখানটায় চলে যাও।'

রাস্তা নেই, উঁচুনিচু জমির ওপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। খাদের একেবারে কিনার ঘেঁষে চলছে। ছোট ছোট ঝোপ মাড়িয়ে যাচ্ছে। নিচু ডাল বাড়ি লাগছে উইন্ডশীল্ডে। গতি একেবারে কমিয়ে রেখেছে মুসা। শক্ত হাতে ধরেছে স্টিয়ারিং। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই, স্টিয়ারিং ভুল ঘোরালেই পড়বে গিয়ে খাদে।

হেডলাইটের আলো পড়ল আরেকটা গাড়ির ওপর। খাদের একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, পুরানো একটা জেলপি। রবিন বলল, 'খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। ফেলে রেখে গেছে।'

এগিয়েই চলল মুসা, রহস্যময় আলোটার সন্ধানে, খানিক আগে কেবিনের কাছে দাঁড়িয়ে যেটা দেখা গেছে।

আরও কিছুদূর এগোতেই মোটামুটি চওড়া খোলা একটুকরো জায়গায় ঢুকল গাড়ি। আরেকটু এগোলেই ডোবারের কেবিনের ওপর চলে যাবে, যেখানটায় আলো দেখেছে। থেমে গেল মুসা। কি করবে জিজ্ঞেস করল কিশোরকে।

'আর এগিও না। এখানেই গাড়ি ঘুরিয়ে রেডি রাখো,' কিশোর বলল। 'দরকার পড়লে যাতে এসেই দৌড় দিতে পারি। তখন হয়তো আর ঘোরানোর সময় থাকবে না।'

বাতাসের বেগ বেড়েছে। যে কোন মুহূর্তে বনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঝড়। অনেক ডালপালা ছড়িয়ে আকাশের এমাথা ওমাথা চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুৎ-শিখা, সঙ্গে সঙ্গে কানফাটা শব্দে বাজ পড়ল। তারপর এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, টর্চ জ্বালার আর প্রয়োজন হলো না।

সরু পথে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল ওরা। কথা শোনা গেল, 'এই যে, ধরো তো এটা।'

চট করে ঝোপের আড়ালে ঢুকে গেল গোয়েন্দারা। যেদিকে কথা শোনা গেছে তাকিয়ে রইল সেদিকে। আবার বিদ্যুৎ চমকালে দেখল, একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে লম্বা একটা বাক্স নামাচ্ছে দু-জন লোক। নামিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল গাছপালার মধ্যে, হোলোর কিনারের দিকে।

'কোথায় গেল?' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'ওদিকে তো জায়গা নেই। না জেনে এগোলে পড়ে যাবে নিচে।'

উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা, কিন্তু লোকগুলো ফিরল না।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে কিশোর। অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব যেন মিলতে আরম্ভ করেছে। সমাধান হয়ে আসছে ধাঁধার। বলল, 'শোনো, পিচার দুটো পেঁচা এঁকে কেন কেটে দিয়েছিল, বুঝে গেছি। ও বোঝাতে চেয়েছে, চিৎকারগুলো পাখিতে করেনি, করেছে মানুষে। এক ঢিলে দুই পাখি মারে কেউ। যারা ট্রাক নিয়ে আসে পেঁচার ডাক ডেকে তাদেরকে সঙ্কেতও দেয়, আবার আশপাশের মানুষকে হুঁশিয়ারও করে: খবরদার, এদিকে এসো না, এখানে ডাইনী আছে! সেটাকে আরও জোরদার করার জন্যে কুকুর চুরি করে। ভয় পেয়ে কেউ এদিকে না এলে নিরাপদে মাল খালাস করতে পারে ওরা।'

'কুকুরগুলোকে এনে কি করে তা-ও বুঝে ফেলেছি!' রবিন বলল, 'নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় চোরাই মার্কেটে। পটিরটা বোধহয় তাড়াহুড়োয় বেচতে পারেনি, দিয়ে এসেছে ডরোথির কাছে।'

'তারমানে বেআইনী কিছু করছে ওরা এখানে?' মুসার প্রশ্ন।

'তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'কি করছে?'

'আমার তো মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে এই এলাকায় যে ছিনতাই শুরু হয়েছে, সেটা এদেরই কাজ। ডোবারও এতে জড়িত।'

'ঠিক,' রবিন একমত হলো। 'সেটা কোনভাবে জেনে গিয়েছিলেন হয়তো ক্যাপ্টেন রিচটন, ওদেরকে মাল খালাস করতে দেখে ফেলেছিলেন, সে জন্যেই তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে!'

'মেরে ফেলেনি তো?' শঙ্কিত হয়ে উঠল মুসা।

'কতটা বেপরোয়া ওরা, সেটা এখনও জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে খুনের ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে আটকে রাখাটাই নিরাপদ মনে করবে। কিন্তু কোথায় আটকাল? আরেকটা কথা মনে আছে, সেদিন ডোবারের সঙ্গে কথা বলার সময় দরজা লাগানোর শব্দ শুনেছিলাম, কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকে কোন দরজা দেখিনি?'

আছে, জানাল দু-জনেই।

'কোথায় সেই দরজাটা?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

'আমার বিশ্বাস,' কিশোরই বলল, 'রান্নাঘরের মধ্যেই কোথাও আছে ওটা, লুকানো, গুপ্তদরজা।'

আর কোন কথা হলো না। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল তিনজনে। করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল, কিন্তু ওরা আর আসে না।

'দেখা দরকার কোথায় গেল,' কিশোর বলল। 'তোমরা এসো আমার পেছনে। দূরে দূরে থাকবে। ধরা পড়লে যাতে একজন পড়ি, অন্য দু-জন পালাতে পারি।'

ঝোপের আড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে এগোল সে। তার পেছনে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে রবিন, সবশেষে রইল মুসা।

লোকগুলোকে দেখা গেল না কোথাও। খাদের কিনারে গাছের সারির কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। একটু পর মুসা আর রবিনও চলে এল তার পাশে। খোলা জায়গায় না থেকে বসে পড়ল ঝোপের আড়ালে। নিচে উঁকি দিল।

তাদের সামনে কোন গাছপালা নেই, পাথরের দেয়ালটা প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে উপত্যকায়।

শাঁই শাঁই করে বইছে ঝোড়ো বাতাস। তাদের পেছনে সাংঘাতিক দুলছে গাছপালাগুলো। এই ঝোপের কাছেও বাতাসের শক্তি অনুভব করতে পারছে ছেলেরা। বিদ্যুতের আলোয় ব্ল্যাক হোলোর অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ডোবারের কেবিনটাও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লোকগুলোকে চোখে পড়ল না। অবাক কাণ্ড! গেল কোথায় ওরা?

'ওপরেও নেই, নিচেও নেই,' বিড়বিড় করল রবিন, 'তাহলে গেল কোথায়? আর নিচেই যদি গিয়ে থাকে, নামল কোনখান দিয়ে? যা দেয়ালের দেয়াল, নিচে নামাই মুশকিল, সঙ্গে আছে আবার ভারী বাক্স!'

ওরা যেখানে রয়েছে তার ঠিক নিচে নয় কেবিনটা, ওটার ওপরে যেতে হলে একপাশে আরও খানিকটা সরতে হবে। ওখানটায় গেলে লোকগুলোকে দেখা যেতে পারে ভেবে উঠে দাঁড়াল কিশোর। পেছনে আগের মত দূরত্ব রেখে আসতে বলল রবিন আর মুসাকে।

খাদের কিনার ধরে এগোল তিনজনে, একজনের পেছনে আরেকজন।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর। বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়। অবাক হয়ে রবিন আর মুসা দেখল, খানিক আগেও যেখানে ছিল গোয়েন্দাপ্রধান, সেখানে নেই সে, অদৃশ্য হয়ে গেছে!

পনেরো

'কিশোর! কিশোর!' বলে চিৎকার দিয়ে দৌড় মারল রবিন। মুসা ছুটল তার পেছনে। 'কিশোর, কোথায় তুমি?'

সাড়া নেই। বিদ্যুৎ চমকাল বড় করে, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সবকিছু আলোকিত করে রেখে দপ করে নিভে গেল। আশপাশটা পরিষ্কার চোখে পড়ল ওদের। এবারও দেখা গেল না কিশোরকে। ওই লোকগুলোর মতই সে-ও গায়েব হয়ে গেছে।

'গেল কোথায় ও!' ককিয়ে উঠল রবিন। তার কথা ঢেকে দিল প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ।

আবার চমকাল বিদ্যুৎ। আকাশটাকে যেন ফেড়ে ফেলে তার ভেতরটা দেখিয়ে দিতে চাইল। মনে হলো, এতক্ষণ মেঘগুলোকে ধরে রেখেছিল যে চাদরটা, সেটাকেও চিরে দিল বিদ্যুৎ। অঝোরে নেমে এল বৃষ্টি। গাছপালার মাথায়, পাথরের গায়ে আঘাত হানার শব্দ উঠল ঝমঝম, ঝমঝম।

কিন্তু বৃষ্টি শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আরেকটা শব্দ ঢুকল মুসার তীক্ষ্ণ শ্রবণযন্ত্রে, মনে হলো তার পায়ের নিচ থেকে এসেছে।

'চিৎকার না? ওদিকে!' চেঁচিয়ে উঠে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে একটা বড় ঝোপের দিকে দৌড় দিল সে। আরেকটু হলে সে-ও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় দেখল সামনে মাটিতে গোল একটা কিছু, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল সে।

টর্চের আলো ফেলল দু-জনে। মাটিতে একটা গর্ত। ঝোপটার আড়ালে থাকায় দূর থেকে চোখে পড়ে না। উঁকি দিয়ে দেখল, একধার থেকে একটা কাঠের স্লাইড নেমে গেছে। আরেকধার থেকে উঠেছে একটা কাঠের সিঁড়ি।

নিচ থেকে ওদের নাম ধরে ডাকছে কিশোর।

তাড়াতাড়ি নামার জন্যে সাবধানে স্লাইডের ওপর বসে দু-হাতে দু-ধার খামচে ধরল মুসা। পার্কের স্লিপারে বসলে যেমন হয়, তেমনি সড়াৎ করে নেমে চলে এল নিচে। তার পেছনে বসেছিল রবিন, সে এসে পড়ল তার গায়ের ওপর।

মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দু-জনে।

অন্ধকারে কিশোরের গলা শোনা গেল, 'টর্চ জ্বালো! আমারটা হারিয়ে ফেলেছি!'

হলুদ আলো পড়ল পাথরের দেয়ালে। একটা কুয়ার মধ্যে রয়েছে ওরা। সুড়ঙ্গমুখ দেখা গেল।

'নিশ্চয় এটা চোরের আড্ডা,' নিচু স্বরে বলল রবিন। 'ওই কাঠের স্লাইডে মালগুলো রাখে, পিছলে নেমে আসে ওগুলো কুয়ার নিচে। পরে অন্য কোথাও

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'সেটাই দেখতে হবে,' কিশোর বলল।

সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা। সাবধানে এগোল। কিছুদূর এগোতে সামনে দেখা গেল একটা কাঠের দরজা।

'খুলব?' রবিনের প্রশ্ন।

'না খুললে দেখব কি করে?'

এগিয়ে গিয়ে ঠেলা দিল কিশোর। ভেতরের দিকে খুলে গেল পাল্লাটা।

ওপাশে তাকিয়েই থ হয়ে গেল ওরা। পাথর কুঁদে তৈরি চারকোনা একটা ঘর, একটা প্যারাফিনের ল্যাম্প জ্বলছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন মানুষ পড়ে আছে একটা ক্যাম্পখাটে। এলোমেলো ধূসর চুল। শব্দ শুনে দুর্বল ভঙ্গিতে মুখটা ঘুরল এদিকে।

'ক্যাপ্টেন রিচটন?' ছুটে গেল রবিন।

'কে তোমরা?' দুর্বল কণ্ঠস্বর মানুষটার।

জানাল কিশোর, 'আমরা গোয়েন্দা। মিস্টার সাইমন আপনার চিঠি পেয়েছেন।'

আশার আলো ঝিলিক দিল রিচটনের চোখে, 'সে কোথায়?' মাথা তুললেন তিনি।

'তিনি জরুরী কাজে ব্যস্ত। সে-জন্যেই আমাদের পাঠিয়েছেন।'

আলো নিভে গেল আবার চোখ থেকে। গড়িয়ে পড়ে গেল মাথাটা। একজন দক্ষ গোয়েন্দার পরিবর্তে তিনটে ছেলেকে দেখে নিরাশ হয়েছেন রিচটন, সেটা বুঝে কিশোর বলল, 'কদিন ধরেই এখানে আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছি, ক্যাপ্টেন। আজকে পেলাম। এখন সাবধান থাকতে হবে আমাদের, নইলে বিপদে পড়ব। ডোবার আর তার চ্যালারা কোথায় আছে, এখনও জানি না।'

'আমি জানি ওরা কোথায়,' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন। 'পাথরের কেবিনটাতে। এই ঘর থেকেও যাওয়া যায়, ওই দরজা দিয়ে।' কিশোররা যেদিক দিয়ে ঢুকেছে তার উল্টো দিকের আরেকটা দরজা দেখালেন তিনি।

তাঁর শার্টের ছেঁড়া জায়গাগুলো চোখ এড়াল না কিশোরের। ঝোপের কাঁটায় আটকে থাকা কাপড়ের টুকরোগুলো এটা থেকেই ছিঁড়েছে, বুঝতে পারল।

'তোমরা একা কিছু করতে পারবে না, গিয়ে শেরিফকে জানাও, পুলিশ নিয়ে এসো। ওরা ডাকাত, ভয়ঙ্কর লোক। দলটা লুটপাট করে বেড়ায় বাইরে বাইরে, মাল এনে লুকিয়ে রাখে এখানে। ডোবার ওদের নেতা, উকিল হুগারফটাও আছে তার দলে। তোমাদেরকে এখানে দেখে ফেললে বিপদ হবে।'

'চলুন আপনাকে বের করে নিয়ে যাবে,' মুসা বলল। 'কুয়াটাতে একটা

সিঁড়ি আছে। সেটা বেয়ে ওপরে ওঠা যাবে। ওই পথেই ঢুকেছি আমরা, পালাতেও পারব। ওরা কিছু জানবেই না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। বলল, 'কিন্তু ওরা যখন দেখবে, ক্যাপ্টেন নেই, বুঝবে খেল খতম। গা ঢাকা দেবে। ধরতে আর পারব না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' একমত হলেন ক্যাপ্টেন। 'তার চেয়ে যা বললাম, তাই করো, গিয়ে পুলিশ নিয়ে এসো...'

'বরং এক কাজ করো,' রবিনকে বলল কিশোর। 'তুমি চলে যাও। শেরিফকে খবর দাও। আমি আর মুসা থাকছি এখানে।'

কি ভেবে তর্ক করল না রবিন, বেরিয়ে গেল।

কিশোর আর মুসাকেও যাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করে করে হাল ছেড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, যাবে না ওরা। শেষে কিশোরের প্রশ্নের জবাবে তাঁর কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন, 'চিৎকারটা প্রথম যখন শুরু হলো, বিশেষ মাথা ঘামালাম না আমি। তারপর কুকুর হারাতে লাগল। মনে পড়ল ডাইনীর কিংবদন্তীর কথা। ক্যালেন্ডারে লিখে রাখতে লাগলাম ডাক কবে শোনা যায়, আর কুকুর কবে হারায়। কোনটা কি কুকুর, মালিক কে, তা-ও লিখলাম, পরে যাতে ভুলে না যাই সে-জন্যে। দুটো ঘটনার মধ্যে একটা যোগাযোগ লক্ষ করলাম। সে-জন্যেই ভিকটরকে চিঠি লিখেছিলাম, জানি, এ সব উদ্ভট রহস্যগুলোতে কাজ করে আনন্দ পায় সে। শেরিফকে গিয়ে বলতে পারতাম, কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত একজন পুলিশ অফিসার এ সব গুজবে বিশ্বাস করে তদন্তের সাহায্য চাইতে গেছি দেখলে মনে মনে হাসত সে। ভাবত, বুড়োটার মাথায় দোষ পড়ে গেছে।'

'আপনি কি ডাইনী বিশ্বাস করেন?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা।

'না। তবে ব্যাপারটা বেশ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল। তলে তলে সিরিয়াস কিছু একটা ঘটছে বুঝতে সময় লাগল। হাইজ্যাকারদের কথা আগেই শুনেছি, সন্দেহ করলাম, ওরাও এসে আস্তানা গেড়ে থাকতে পারে এখানে। তারপর একরাতে আমার ককার স্প্যানিয়েল কুকুরটাও চুরি হয়ে গেল। আর কারও অপেক্ষা না করে নিজেই তদন্ত করব ঠিক করলাম।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এবং সেদিন বেরিয়েই ধরাটা পড়লেন।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'সঙ্গে বন্দুক নিয়েছিলাম। হোলোতে নেমে খুঁজতে শুরু করলাম। ঝোপের মধ্যে একটা রহস্যজনক শব্দ শুনে এগিয়ে গেলাম সেদিকে, ভেতরে কে জিজ্ঞেস করলাম? জবাব পেলাম না। তারপর দেখি দুটো জ্বলন্ত চোখ, পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর এক চিৎকার। একটা পুমা। এখানে ওই জানোয়ার দেখে খুব চমকে গিয়েছিলাম, কখনও শোনা যায়নি এই এলাকায় পুমা আছে। গুলি করতে দেরি করে ফেললাম। আমি নিশানা করার আগেই লাফ দিল ওটা। দুটো গুলির একটাও লাগাতে পারলাম না। আমাকে ধরার জন্যেই লাফ দিয়েছিল, কিন্তু গুলির শব্দে ভয় পেয়ে

পালাল। মনে হলো, পুরোপুরি বুনো নয়। তা ছাড়া কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল।'

'গুলির খোসাগুলো পেয়েছি আমরা,' মুসা বলল।

'গুলির শব্দ শুনে চুপি চুপি দেখতে এল ডোবার। পেছন থেকে মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলল আমাকে। জ্ঞান ফিরলে দেখি, ডোবারের কেবিনটাতে শুয়ে আছি। রান্নাঘরের দেয়ালে পাথরের একটা গোপন দরজা খুলছে সে। আগে থেকে জানা না থাকলে দরজাটা আছে ওখানে বোঝাই যায় না।

'বেহুঁশের ভান করে পড়ে রইলাম। আমাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে একটা গলি পার করে আনল সে, তারপর একটা ঘর—একধারে অনেকখানি জায়গায় শিক লাগিয়ে আলাদা করা, হাজতের মত; এবং সবশেষে নিচু একটা দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে এনে ফেলল এই ঘরটায়। তারপর থেকেই আছি। একটাই ভরসা ছিল আমার, ভিকটরকে চিঠি লিখেছি, সে আসবেই। কেবিনে আমাকে না পেলে খুঁজে বের করবে।'

'অথচ তিনি কল্পনাও করেননি আপনি এই বিপদের মধ্যে আছেন,' কিশোর বলল। 'তাহলে সব কাজ বাদ দিয়ে নিজেই ছুটে আসতেন।'

ওরা এসে কি কি করেছে রিচটনকে বলতে লাগল সে। হুগারফ তাঁর কাছে টাকা পায় বলেছে শুনে রেগে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'মিথ্যে কথা! আমার কাছে কেউ টাকা পায় না। ওই বাহানা করে ও তোমাদের খোঁজ নিতে গিয়েছিল। ওর মত একটা চোরের কাছে টাকা নিতে যাব কেন আমি?'

'আমরাও বিশ্বাস করিনি একথা। বরং বলে তার ওপর আমাদের সন্দেহ জাগিয়েছে।'

পেঁচার ডাকটা যে আসলে পেঁচার নয়, মানুষই ওরকম করে ডেকে সঙ্কেত দেয়, তার এই সন্দেহের কথা জানাল কিশোর।

'ঠিকই অনুমান করেছ তুমি। দুই রকম পেঁচার ডাক ডাকে সে। একভাবে ডেকে হাইজ্যাকারদের বোঝায়, রাস্তা পরিষ্কার, চলে এসো। আরেক ভাবে ডেকে বলে, বিপদ, চলে যাও। এই দ্বিতীয় ডাকটা শুরু করেছে তোমরা আসার পর।'

'তারমানে আমাদের ভয় পায় সে?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, পাই,' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা পরিচিত, ভারী কণ্ঠ।

ঝট করে ঘুরে তাকাল দুই গোয়েন্দা। হাতে লম্বা নলওয়ালা সেই পিস্তলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোবার। নিঃশব্দে দরজা খুলে কখন ঢুকে পড়েছে টেরই পায়নি কেউ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন লোক, একজনকে চেনে গোয়েন্দারা—উকিল আর্নি হুগারফ। আরেকজনের বিশাল দেহ, রুক্ষ চেহারা।

'স্বাগতম,' রসিকতার ঢঙে বলল ডোবার, 'সুন্দরভাবে সমাধান করে ফেলেছ কেসটার। এমনকি পেঁচার ডাকের রহস্যও ভেদ করে ফেলেছ, ভাল

গোয়েন্দা তোমরা, বুদ্ধি আছে। ডাকগুলো আমিই ডেকেছি, একেবারে আসলের মত হয়েছিল, তাই না? কিন্তু বুদ্ধিটা খারাপ জায়গায় খাটিয়েছ, এর জন্যে খেসারত দিতে হবে তোমাদের। কিংবা পুরস্কারও বলতে পারো, জ্যান্ত ডাইনীর সাক্ষাৎ পাবে। তো, তোমাদের আরেক বন্ধু কোথায়?'

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

'হুঁ, এরা বলবে না।' হঠাৎ বদলে গেল তার কণ্ঠস্বর, হাসি হাসি ভাবটা চলে গিয়ে কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। কর্কশ কণ্ঠে বিশালদেহী লোকটাকে বলল, 'ফেরেল, নিশ্চয় বাইরে কোথাও আছে। ধরে নিয়ে এসো। ও পালালে মুশকিল হয়ে যাবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল ফেরেল।

হুগারফ রইল রিচটনের পাহারায়, আর পিস্তলের মুখে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল ডোবার। একটা গলিপথ পেরিয়ে আরেকটা ঘরে এসে ঢুকল, যেটাতে হাজতের দরজার মত শিক লাগানো আছে বলেছিলেন রিচটন।

ডোবারের টর্চের আলোয় পাথরের ঘরটা দেখতে পাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। পেছনের দেয়ালের কাছটায় তেরপল দিয়ে ঢাকা রয়েছে কিছু। বাতাস ভারী আর ভেজা ভেজা এখানে—মাটির নিচের ঘর বলেই বোধহয়; কিন্তু তার সঙ্গে মিশে আছে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ!

'কোয়ার্টার পছন্দ হয়েছে?' হেসে ছেলেদের জিজ্ঞেস করল ডোবার। 'প্রাকৃতিক গুহাই ছিল এগুলো, খুঁড়ে খুঁড়ে বড় করেছে ক্রীতদাসপ্রথার বিরোধিতা করেছিল যারা, তারা। এখানে এসে লুকিয়েছিল। খুব চালাক ছিল ওরা স্বীকার করতেই হবে। কুত্তা চুরি আর রাতে বিকৃত চিৎকার করে করে ডাইনীর কিংবদন্তীটাকে জাগিয়ে তুলেছিল ওরা, লোকে ভয় পেয়ে আর হোলোর কাছে ঘেঁষত না। ক্রীতদাসদের লুকিয়ে থাকার সুবিধে হত। ইতিহাসের সেই অধ্যায়টাকেই আবার কাজে লাগিয়েছি আমি এত বছর পর, প্রশংসা করবে না?'

'করতাম, যদি ওদের মত সৎ উদ্দেশ্য থাকত আপনার,' কিশোর বলল। 'কিন্তু আপনি তো করছেন অপরাধ, হাইজ্যাকিঙের মত জঘন্য অপরাধ। ভাল কথা, ডব কোথায় আছে জেনে গেছি আমরা।'

মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় দেখা দিল ডোবারের চোখে, তারপর সামলে নিল, 'কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'বন্য মানুষের মুখোশ পরে আমাদের ফাঁকি দেয়ার ব্যাপারটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন না?'

'না, তা পারছি,' হাসিমুখে স্বীকার করল ডোবার। 'আমিই পিচার সেজেছিলাম, রবারের মুখোশ আর কালো পরচুলা পরে।'

'মহাপুরুষের কাজ করেছেন,' ডোবারের এই হাসি হাসি ভাবটা সহ্য করতে না পেরে রেগে উঠল মুসা। 'আমাদের নিয়ে এখন কি করবেন, সেটা শুনতে চাই।'

ডোবার বুঝতে পারল অসাধারণ স্নায়ুর জোর এই ছেলেগুলোর, এত সহজে ভয় ধরাতে পারবে না ওদের মনে। কঠিন পথটাই বেছে নিল সে। এগিয়ে গেল তেরপলে ঢাকা জায়গাটার দিকে।

'ডাইনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক এবার!' নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা বলে একটানে তেরপল সরিয়ে নিল। বেরিয়ে পড়ল একটা লোহার খাঁচা। ভেতরে শক্তিশালী একটা জানোয়ার। ম্লান আলোতে ঝিক করে উঠল ওটার সবুজ চোখ।

'ডাইনীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চিৎকারগুলোর জন্যে এটাকে দায়ী করতে পারো,' ডোবার বলল। 'যখন শুনলাম আমার ভাই নুবার একটা পুমাকে কিছুতেই কন্ট্রোল করতে না পেরে বিক্রি করে দিতে চায়, টরিকে পাঠালাম ওটা কিনে নিয়ে আসতে। তবে আমি যে কিনছি জানতে দিলাম না নুবারকে। ভাবলাম, জানোয়ারটা পেলে অনেক কাজে লাগাতে পারব। আমার আন্দাজ ভুল হয়নি।'

আধমরা ভেড়া কেন কিনেছিল ডোবার, এখন নিশ্চিত হলো গোয়েন্দারা। পুমাকে খাওয়ানোর জন্যেই।

মুসা বলল, 'আপনার ভাইই যে জানোয়ারকে কন্ট্রোল করতে পারেনি, সেটাকে আপনি করছেন কি করে?'

মিটিমিটি হাসছে ডোবার। 'জন্তু-জানোয়ারকে কন্ট্রোল করার একটাই উপায়, পিটুনি দেয়া, নিষ্ঠুর ভাবে পেটাতে হবে। পুমাটা এখন বুঝে গেছে কে তার মনিব। আমার সঙ্গে তো কই গোলমাল করে না, ভয় পায়।'

'আজ রাতে ওটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। খাঁচার পেছনে ওই দরজাটা দেখছ না, ওটা খুলে দিই, বেরিয়ে যায়। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ আছে, ও পথে বেরোয়। তবে বেরোতে দেয়ার আগে ঘুমের বড়ি মেশানো খাবার খাইয়ে দিই, যাতে বেশি গোলমাল না করে। পালানোর বুদ্ধি না হয়। প্রতিবারেই ফিরে এসেছে ওটা।

'তবে আজ রাতে ডোজ বোধহয় কম হয়ে গিয়েছিল, কিংবা অন্য কোন কারণে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে ওষুধের ক্ষমতা, ফলে খেপে উঠেছিল। সে জন্যেই পর পর দু-বার পেঁচার ডাক ডাকতে হয়েছিল, সব ঠিক আছে জানানোর পর পরই জানাতে হয়েছিল আমার লোকদের, ঠিক নেই, সাবধান হও। তবে ভাগ্য ভাল, কারও কোন ক্ষতি না করেই খাঁচায় ফিরেছে পুমাটা। হয়তো তার সামনে পড়েনি কেউ। পড়লে ছাড়ত বলে মনে হয় না।'

'ছাড়েন কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'কে ওটার গু সাফ করবে? বাইরেই সেরে আসতে পাঠাই। আরেকটা কারণ আছে, যেদিন আমাদের কাজ থাকে সেদিন পাহারা দেয়ার কাজটাও অনেকটা ওকে দিয়ে করাই। ব্ল্যাক হোলোতে অচেনা কেউ ঢুকলে ঠেকাবে। ও বাইরে বেরোলে আরও একটা উদ্দেশ্য সফল হয় আমাদের, ওই যে

বললাম, ডাইনী। চিৎকার করে। ওর ভয়াবহ ডাক শুনে লোকে ভাবে ডাইনীর চিৎকার। ভয়ে আর এ পথ মাড়ায় না কেউ। সাধারণ একটা পুমার কাছে আর কত কাজ চাও?

'আজকে অবশ্য নতুন একটা কাজ করাব ওকে দিয়ে।' রহস্যময় কণ্ঠে বলল ডোবার। 'খাঁচার এদিকেও একটা দরজা আছে, শেকল টেনে তুলে নেয়া যায়। পালাতে যদি চাও,' মুচকি হেসে আবার চোখ টিপল সে, 'সহজ একটা পথ বাতলে দিতে পারি। এদিককার দরজাটা তুলে ফেলবে, তারপর ওদিকেরটা, আর কোন বাধা থাকবে না, পুমাটাকে ডিঙিয়ে কেবল ওপাশের সুড়ঙ্গে গিয়ে ঢুকবে। ব্যস, বেরিয়ে যেতে পারবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা লাগাল সে। বাইরে থেকে ভারি খিল তুলে দিল। চেঁচিয়ে বলল, 'ও, নতুন কাজটা কি, বলতে ভুলে গেছি। আরও একটা শেকল আছে আমার এখানে। এটা টেনেও খাঁচার তোমাদের দিকের দরজাটা তোলা যায়। ভাবছি, আজই রাতে কোন একসময় সেটা তুলে নেব। গুডবাই।'

টর্চ নিয়ে গেছে ডোবার। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে নিজের টর্চটা শার্টের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল মুসা, সেটা বের করে নিয়ে আলো জ্বালল। পরীক্ষা করে দেখতে লাগল তাদের বন্দিশালাটা।

'নাহ্, কোন পথ নেই,' দেখেটেখে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'আমাদের একমাত্র ভরসা এখন রবিন। নিরাপদে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশ নিয়ে যদি ফিরে আসতে পারে!'

অহেতুক ব্যাটারি নষ্ট না করে আলোটা নিভিয়ে দিল মুসা। গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘর। মাত্র কয়েক ফুট দূরে খাঁচার মধ্যে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে পুমাটা।

অনেকক্ষণ পর বাইরের করিডরে কথা শোনা গেল। ডোবার বলছে, 'ছেলেটাকে পেলে না?'

'না, বস্,' জবাব দিল ফেরেলের খসখসে কণ্ঠ। 'কুয়ার বাইরে বেরিয়েই শুনলাম গাড়ির শব্দ। লাল কনভারটিবলটা চলে যাচ্ছে। বুঝলাম, কোন কারণে ছেলেটা পালাচ্ছে। ট্রাক নিয়ে পিছু নিলাম। কিন্তু সাংঘাতিক গাড়ি ওর, চালায়ও ভাল, কাছেই যেতে দিল না আমাকে...'

'আর তুমিও পরাজিত হয়ে ফিরে এলে, গর্দভ!' গর্জে উঠল ডোবার। 'জানো, এখন আমাদের কি হবে...'

'কিছুই হবে না, বস্, ও আর কিচ্ছু করতে পারবে না আমাদের,' হাসি শোনা গেল বিশালদেহী লোকটার। 'আমিও যতটা সম্ভব গতি বাড়ালাম। এত্তবড় ট্রাক নিয়ে কি আর ওই গাছপালার মধ্যে জোরে চলা যায়, বলুন? তবে থামলাম না। মোড় নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল গাড়িটা। একটু পরেই শুনলাম সাংঘাতিক শব্দ। গিয়ে দেখি, নিচে পড়ে আগুন ধরে গেছে গাড়িতে। ওই গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁচবে ও? অসম্ভব!'

'গুড!' শান্ত হয়ে এল ডোবার। 'একটা ঝামেলা নিজে নিজেই কমল!'
অন্ধকারে যেন বরফের মত জমে গেছে কিশোর আর মুসা, অবশ হয়ে আসতে চাইছে হাত-পা।

ষোলো

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কথা ফুটল না ওদের মুখে। তারপর বিড়বিড় করল মুসা, 'এ হতে পারে না, কিশোর! এটা সত্যি হতে পারে না!'

'গল্পটা আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না,' গলা কাঁপছে কিশোরের। 'বেরোতেই হবে আমাদের, যে ভাবেই হোক, সত্যিটা জানতে হবে!'

বেরোনোর একমাত্র পথ, খাঁচার দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

শিকের কাছে এসে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ঙ্কর স্বরে গরগর করে উঠল পুমাটা।

'মোজা, শার্ট, বেল্ট, সোয়েটার সব খুলে ফেলো,' কিশোর বলল। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

মুহূর্তে সব খুলে খাঁচার সামনে স্তূপ করে ফেলল দু-জনে।

'একটা জিনিসকে সব জানোয়ারই ভয় করে,' বিড়বিড় করল কিশোর। দুটো বেল্টকে এক করে পাকিয়ে নিল সে, তার ওপর জড়াল সোয়েটার আর শার্ট। মোজা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল, যাতে সহজে না খোলে কাপড়গুলো।

'কি করছ?' বুঝতে পারছে না মুসা।

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে লাইটার বের করল কিশোর।

বুঝে গেল মুসা, 'আগুন!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আগুনকে ভয় পায় না এমন জানোয়ার নেই।'

লাইটার জ্বেলে কাপড়ে তৈরি বিচিত্র মশালটার মাথায় আগুন ধরাল সে। আগুন দেখেই চাপা গর্জন করতে করতে খাঁচার দরজার কাছ থেকে সরে গেল পুমাটা। টর্চ নিভিয়ে দিল মুসা। কিন্তু অন্ধকার হলো না আর ঘরটা, মশালের আলোয় আলোকিত। কিম্ভূত ছায়া নাচছে দেয়ালে।

কি ঘটে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মশালটা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে পুমাটাকে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল কিশোর। গর্জে উঠে একলাফে সরে গেল ওটা। মুচকি হাসল সে। বুঝল কাজ হবে। মুসাকে বলল, 'শেকল টেনে আস্তে আস্তে দরজাটা তোলো।'

লোহায় লোহায় ঘষা লাগার শব্দ তুলে উঠে যেতে শুরু করল দরজাটা। সামনে মশাল বাড়িয়ে ধরে ঢুকে গেল কিশোর। এগোল পুমাটার দিকে। ভয়ে, রাগে হিসিয়ে উঠে খাঁচার দেয়ালে নিজেকে ঠেসে ধরল ওটা। বিশাল থাবা বাড়িয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতে চেয়েও আবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে ওটাকে পেছনের দরজাটার কাছে নিয়ে গেল কিশোর। জানোয়ারটার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ না সরিয়ে মুসাকে বলল, 'এই দরজাটাও তোলো।'

সবে অর্ধেক উঠেছে দরজাটা, এই সময় চিৎকার শোনা গেল পেছনে। পুমার চিৎকার আর শেকলের শব্দ কানে গেছে ডোবারের, দেখতে এসেছে কি হয়েছে। চেপে ধরল মুসাকে।

পেছনে তাকাল না কিশোর, ঝটকা দিয়ে মশালটা বাড়িয়ে দিল পুমার দিকে। গর্জন করে পিছিয়ে গেল ওটা, খোলা দরজা দিয়ে চলে গেল সুড়ঙ্গমুখে। আগুনের ভয় ক্ষুব্ধ করে তুলেছে ওটাকে। সাহস সঞ্চয় করে থাবা তুলল কিশোরকে মারার জন্যে।

মরিয়া হয়ে ওটার হাঁ করা মুখে মশালটা ঠেসে ধরল কিশোর।

পুরোপুরি সাহস হারাল পুমাটা। আগুনের আঁচে ঝলসে গেছে মুখ। বিকট চিৎকার করে একলাফে ঘুরে দাঁড়িয়ে দিল দৌড়। হারিয়ে গেল সুড়ঙ্গের অন্ধকারে। মশাল হাতে কিশোরও ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। চেঁচিয়ে উঠে তার পিছু নিল ফেরেল।

বেশি লম্বা না সুড়ঙ্গটা। অল্পক্ষণেই বেরিয়ে চলে এল কিশোর। পুমাটাকে চোখে পড়ল না কোথাও। বনে ঢুকে পড়েছে।

কিশোরও ঢুকে পড়ল। হাতে যতক্ষণ আগুন আছে, জানোয়ারটাকে ভয় নেই। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে পারল না ওটা। পিস্তলের গুলি ফুটল টাশ্‌শ্‌ করে। কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। মশালটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে ডাইভ দিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ল সে।

ছুটে আসছে পদশব্দ। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল সে। গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটতে লাগল। আরেকবার গুলি হলো পেছনে। তার হাতখানেক তফাতে গাছের গায়ে বিঁধল বুলেট। গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে। ছুটতে ছুটতে চলে এল পাথরের ঢালের কাছে। থমকে দাঁড়াল। মুহূর্ত পরেই তার পাশের দেয়াল থেকে চলটা তুলে দিয়ে বিইঙ করে চলে গেল বুলেট।

ঢাল বেয়ে উঠতে গেলে গুলি খাবে, খোলা জায়গায় তাকে মিস করবে না ফেরেল। আর কোন উপায় না দেখে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর।

ভোর হয়ে আসছে। ধূসর আলোয় পা টিপে টিপে লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। যে রকম বিশালদেহী, খালি হাতে এলেও তার সঙ্গে পারত না সে, তার ওপর হাতে রয়েছে পিস্তল। আত্মসমর্পণ না করলে গুলি খেতে হবে।

পাথরটার কাছে চলে এসেছে ফেরেল। হাত তুলে বেরিয়ে আসবে কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় উড়ে এল একটা পাথর। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ, এই অল্প আলোতেও একটু এদিক-ওদিক হলো না, ঠিক এসে ফেরেলের হাতের পিস্তলে লাগল ওটা। হাত থেকে খসে পাথরে পড়ল পিস্তলটা, গড়িয়ে চলে গেল কয়েক

হাত। পরমুহূর্তে ওপর থেকে উড়ে এল একটা দেহ, ফেরেলকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

'পিচার!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'তুমি কোত্থেকে...'

কিন্তু জবাব দিতে পারল না বোবা ছেলেটা। কিশোরের দিকে তাকানোরও সময় নেই। ধস্তাধস্তি শুরু করছে লোকটার সঙ্গে। বেশিক্ষণ যুঝতে পারবে না সে, বোঝাই যাচ্ছে। যা করার তা-ই করল কিশোর। তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিল ফেরেলের পিস্তলটা। অপেক্ষা করতে লাগল।

পিচারের বুকের ওপর উঠে এল ফেরেল। দু-হাতে গলা টিপে ধরে ছেলেটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার চেষ্টা করল।

তার মাথার পেছনে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ধমকে উঠল কিশোর, 'খবরদার!'

ফিরে তাকাল ফেরেল। থামল না। কিশোর যে গুলি করবে না এটা বুঝে হাত বাড়াল ধরার জন্যে। যা থাকে কপালে ভেবে পিস্তলটা তুলে গায়ের জোরে লোকটার চাঁদিতে বসিয়ে দিল কিশোর।

টু শব্দ করল না ফেরেল। আস্তে ঢলে পড়ে গেল পিচারের গায়ের ওপর।

ঠিক এই সময় দুপদাপ করে একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। অবাক হয়ে দেখল, পড়িমরি করে দৌড় দিয়েছে ডোবার, ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় পালাচ্ছে। দেয়ালের কাছে পৌঁছেও থামল না, বেয়ে উঠতে শুরু করল।

কেন পালাচ্ছে বুঝতে পারল না কিশোর। বোঝার চেষ্টাও করল না, চেঁচিয়ে বলল, 'পিচার, জলদি...ওটাকেও পালাতে দেয়া যাবে না!' বলে সে-ও পিছু নিল ডোবারের।

হরিণের গতিতে কিশোরের পাশ কাটাল পিচার। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল।

কিশোরও বসে রইল না, তবে পিচারের তুলনায় তার ওঠাটাকে শামুকের গতিই বলা চলে।

একটা শৈলশিরায় পৌঁছে পেছন ফিরে তাকাল ডোবার। দেখল, বোবা ছেলেটাও পৌঁছে গেছে। তাকে ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল সে।

একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। ডোবারের পা সই করে ডাইভ দিল পিচার। তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল চ্যাপ্টা পাথরের ওপর। অনেক ওপরে শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। পরক্ষণেই উড়ে এল দুশো পাউন্ড ওজনের একটা ভারী শরীর। ডোবার আর পিচারের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল, পড়ল গিয়ে কয়েক গজ নিচের পাথরে। উঠে দাঁড়ানোর সাধ্য হলো না আর পুমাটার, গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে। ডোবারকে সই করেই ঝাঁপ দিয়েছিল ওটা। ওই মুহূর্তে পিচার তাকে ফেলে না দিলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত আরিগনদের বংশধর।

ঘটনাটা স্তব্ধ করে দিল ডোবারকে। উঠে বসল কোনমতে, থরথর করে কাঁপছে। পালানোর চেষ্টা করল না আর, ক্ষমতাই নেই যেন শরীরের।

শৈলশিরায় পৌঁছে গেল কিশোর। পিস্তল তাক করল ডোবারের দিকে। কিন্তু তার দিকে নজর নেই লোকটার, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। পরাজিত ভঙ্গি।

এতক্ষণে হই-হট্টগোল খেয়াল করল কিশোর। ফর্সা হয়ে গেছে পুবের আকাশ। নিচে তাকিয়ে দেখল সে, অনেক পুলিশ। জাল দিয়ে আটকে ফেলেছে পুমাটাকে।

ঢাল বেয়ে উঠে আসতে লাগল কয়েকজন পুলিশ। প্রথম যে লোকটা কাছে এল তাকেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রবিন ঠিক আছে? আমার বন্ধু?'

'আছে,' জবাব দিল লোকটা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, 'গাড়িতে পুড়ে মরেনি তাহলে!'

অবাক হলো পুলিশম্যান, 'কিসের গাড়ি!'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। নিচে নেমে দৌড় দিল ডোবারের কেবিনের দিকে।

হাঁ হয়ে খুলে আছে একমাত্র দরজাটা। একছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। থমকে দাঁড়াল।

রান্নাঘরের গোপন পাথরের দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুসা, ওটা এখন খোলা। চেয়ারে বসে আছে রবিন, রিচটন আর শেরিফ ইকার।

শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন শেরিফ। হেসে বললেন, 'এসো কিশোর। তোমাদের পাত্তা না দিয়ে, ডোবারের কথায় গুরুত্ব দিয়ে ভুল করেছিলাম, সরি। যাই হোক, কেসটার কিনারা করার জন্যে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ।'

হাঁটু ভেঙে এল যেন কিশোরের। সমস্ত উত্তেজনা শেষ হয়ে যেতে এতক্ষণে টের পেল ক্লান্তি। ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

পুরো আধমিনিট কথা বলল না সে, জিরিয়ে নিয়ে মুখ তুলে তাকাল রবিনের দিকে, 'এত তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দিলে কি করে?'

হাসল রবিন, তারপর খুলে বলল সব, 'বেরিয়েই গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, মিসেস ভারুগানের বাড়িতে টেলিফোনের তার দেখেছি। ফরেস্টবার্গে যেতে-আসতে অনেক সময় লাগবে। তাই ভাবলাম শেরিফকে একটা ফোন যদি করতে পারি অনেক সময় বাঁচবে।

'হঠাৎ পেছনে শুনলাম চিৎকার। তারপর ট্রাকের ইঞ্জিন চালু হলো। আসতে লাগল আমার পেছন পেছন। কেন আসছে বুঝতে পারলাম। নিশ্চয় আমাকে দেখে ফেলেছে, ধরতে আসছে। ট্রাকে কয়জন আছে জানি না। আমাকে ধরার জন্যে বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালাবে ওরা। রাস্তা যতক্ষণ খারাপ থাকবে ততক্ষণ ধরতে পারবে না জানি, কিন্তু তারপর? ওরা পিছে লেগে থাকলে পুলিশকেও খবর দিতে পারব না। কি করি, কি করি, ভাবছি, এই সময় চোখে পড়ল পুরানো গাড়িটা। দেখেই একটা বুদ্ধি এল মাথায়, সিনেমায় দেখা

একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ল—কি করে তেড়ে আসা ডাকাতদের ফাঁকি দিয়েছিল একজন লোক।

'তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে গাড়িটা ঢুকিয়ে রাখলাম একটা ঝোপে। দৌড়ে ফিরে এসে পুরানো গাড়িটায় আগুন ধরিয়ে ঠেলে ফেলে দিলাম পাড়ের ওপর থেকে। পেট্রোল ছিল ওটার ট্যাঙ্কে। দাউ দাউ করে যে ভাবে জ্বলে উঠল, ওটার মধ্যে নিজেকে কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। রাস্তাটা ঘোরাল আর গাছপালা ছিল বলে আমাকে এ সব করতে দেখতে পায়নি লোকটা, আসতেও দেরি হয়েছে তার। ঝোপে লুকিয়ে দেখলাম, গাড়ি থেকে নামল সে, আগুন লাগা গাড়িটা দেখল, তারপর ট্রাক নিয়ে ফিরে গেল। বুঝলাম, আমার ফাঁকি কাজে লেগেছে।

'সে চলে গেলে আবার রওনা হলাম মিসেস ভারগনের বাড়িতে। খুশি হয়েই ফোন করতে দিলেন তিনি। শেরিফকে পেতেও অসুবিধে হলো না। তিনি বললেন, এখুনি আসছি। বার বার মনে হতে লাগল, কেবিনে ফিরে আসি, তোমাদের কোন সাহায্য লাগতেও পারে। কিন্তু ভয়ও হলো, সাহায্য করতে এসে না বিপদে ফেলে দিই। দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে মিসেস ভারগনের বাড়িতেই বসে রইলাম পুলিশ না আসা পর্যন্ত।'

'দারুণ একখান কাজ করেছ,' হাসল মুসা। 'মস্ত ফাঁকি দিয়েছ ব্যাটাকে। তবে টেলিফোনটা করে সবচেয়ে ভাল করেছ। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ না এলে আমাদের কি হত কে জানে! ডোবার ভয়ঙ্কর লোক! ও আমাকে আর ক্যাপ্টেন রিচটনকে খুন করার মতলব করছিল।'

কিশোর পুমাটার পেছনে বেরিয়ে যাওয়ার পর কি হলো, জানাল মুসা। তাকে ধরে ফেলল ডোবার। গায়ে অসম্ভব জোর লোকটার, তাছাড়া হাতে পিস্তল ছিল, কাবু করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। ওকে নিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একই ঘরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল। ফেরেল ফিরে এলে একটা ব্যবস্থা করবে বলছিল। এই সময় কেবিনের দিকের দরজা খুলে পুলিশ নিয়ে ঘরে ঢুকল রবিন।

ডোবার আর ফেরেলকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলা হয়েছে, এসে খবর দিল একজন পুলিশ। হুগারফকে আগেই তোলা হয়েছে। এখানে আর কোন কাজ নেই। ওঠার আগে তিন গোয়েন্দাকে একটা খবর জানালেন শেরিফ, ডাকাতদের খোঁজ কেউ দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে ঘোষণা করেছে একটা কোম্পানি। তাদের অনেক মাল লুট করেছে ডাকাতেরা। এখন একেবারে বমাল ওদের ধরে দেয়াতে নিশ্চয় ভাল একটা অঙ্কের টাকা পাবে তিন গোয়েন্দা। শীঘ্রি সেটার ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা দিয়ে, কয়েকবার করে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে, উঠলেন তিনি। যাওয়ার আগে বললেন, 'হ্যাঁ, একবার আমার অফিসে দেখা কোরো, পারলে আজই। তোমাদের কেসের রিপোর্ট লিখে নিতে হবে।'

তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর রবিন বলল, 'যাক, একটা কাজের কাজ

হলো। ওকে কি করে সাহায্য করা যায়, ভাবছিলাম। আমার ভাগের পুরস্কারের টাকাটা ওকে দিয়ে দেব। আর্ট স্কুলে যাতে ভর্তি হতে পারে।'

'আমারটাও,' সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল মুসা।

'পুরোটাই দিয়ে দেয়া হবে। তাতেও না কুলালে অন্য ব্যবস্থা করার কথা ভাবব। চলো, ওকে খুঁজে বের করি। সুখবরটা জানাই,' বলে উঠতে গেল কিশোর।

কিন্তু ওঠার আগেই দরজায় দেখা দিল পিচার। হাসিমুখে ভেতরে ঢুকল কুকুরের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে।

গুপ্তচর শিকারি

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৬

'দেখতে এমন সাধারণ হলে কি হবে,' হাতের যন্ত্রটা দেখিয়ে বলল মুসা, 'সাংঘাতিক জিনিস। যে কোন জিনিস খুঁজে বের করতে পারবে এটা দিয়ে, ধাতু হলেই হলো।'

'যেমন?' জানতে চাইল রবিন।

'গহনা, মুদ্রা, সোনার কলম...'

'বলো কি হে,' কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন, 'বাড়ির আশপাশের গুপ্তধন তো আর রাখবে না তুমি...'

'দেখো, অত ইয়ার্কি মেরো না,' আদর করে পুরানো যন্ত্রটায় হাত বুলাল মুসা, 'আসলেই রাখব না। এর ক্ষমতা তুমি জানো না।'

'আমি জানি,' কিশোর বলল, 'এ সব মেটাল ডিটেক্টর সত্যিই কাজের জিনিস। কিনে ফেলেছ নাকি? দাম দিয়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, পানির দাম বলতে পারো। নষ্ট ছিল। কিনে নিয়ে নিজেই মেরামত করেছি। চমৎকার কাজ করে এখন। কিন্তু পরীক্ষাটা কোথায় চালাব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, তোমাদের বাড়ির আশেপাশে?' রবিন বলল, 'ওখানে তো গুপ্তধন আছে বলে গুজব রয়েছে।'

'চেনা জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে ভাল্লাগে না।'

'তা বটে,' মাথা দোলাল রবিন, 'চেনা জায়গায় গুপ্তধন আছে, ভাবা যায় না। গুপ্তধন শব্দটা শুনলেই মনে হয় অচেনা, ভয়ানক দুর্গম কোন জায়গা...'

মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর কোথায় তোরা? একটা মেয়ে দেখা করতে এসেছে তোদের সঙ্গে।'

ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

জঞ্জালের স্তূপের পাশে মেরিচাচীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। কালো চুল, বাদামী উজ্জ্বল চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। কিশোরকে দেখে এগিয়ে এল, 'আমি ইভা গেনার। জিনার বন্ধু। ওর কাছে তোমাদের কথা শুনেছি।'

চুপ করে রইল কিশোর। মেয়েটা কি বলে শোনার অপেক্ষা করছে।

রবিন আর মুসাও বেরিয়ে এল।

মেরিচাচীর তাড়া আছে, চলে গেলেন।

ইভা বলল, 'তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি... জিনা বলল...'

'এসো, ভেতরে এসো,' ওঅর্কশপের দরজা দেখাল কিশোর।

ইভাকে ভেতরে নিয়ে এল সে। চারপাশে তাকাতে লাগল মেয়েটা।

অবাক হলো না। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে কোথায় কি আছে জিনার কাছে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

একটা টুল দেখিয়ে ওকে বসতে বলল কিশোর।

বসল ইভা। কোন রকম ভূমিকার মধ্যে গেল না। বলল, 'একটা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি···তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?' বলেই কেঁদে ফেলল।

এ সব পরিস্থিতিতে বিব্রত বোধ করে কিশোর। কি করে কান্না থামাবে বুঝতে পারছে না। মুসা তাড়াতাড়ি ওর মেটাল ডিটেক্টরে হাত দিল। কেবল রবিন স্বাভাবিক রইল, শান্তকণ্ঠে বলল, 'কেঁদো না। কি হয়েছে, বলো, সাহায্য আমরা অবশ্যই করব।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ডলল ইভা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমার মা-বাবা কেউ নেই। দুজনেই মরে গেছে।'

এইবার থমকে গেল রবিন। কি করে সাহায্য করবে মেয়েটাকে? কারও বাবা-মা মরে গেলে তো আর এনে দেয়া যায় না।

সহানুভূতির সুরে কিশোর বলল, 'কেঁদে আর কি হবে? তোমার কষ্ট আমি খুব বুঝতে পারছি, আমিও তোমার মতই এতিম।'

'ওদের জন্যে কাঁদছি না আমি,' আরেকবার চোখ ডলল ইভা। 'ওরা অনেক ছোটবেলায় মারা গেছে, চেহারাও ভালমত মনে নেই। কাঁদছি আমার ভাইয়ের জন্যে।'

'খাইছে! সে-ও কি মারা গেছে নাকি?' ফস করে বলে ফেলেই পস্তাতে শুরু করল মুসা, এ ভাবে বলাটা বোকামি হয়ে গেছে।

মাথা নাড়ল ইভা, 'জানি না! ওকে খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যেই এসেছি তোমাদের কাছে।'

'কি হয়েছে ওর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চোখের পানি মুছতে মুছতে ইভা বলল ওর ভাইয়ের নাম হ্যারিস গেনার। আরলিঙটন কলেজের ফরেন অ্যাফেয়ার্সের ইনস্ট্রাক্টর ছিল। হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গেছে। 'এবং আমি চাই তোমরা ওকে খুঁজে বের করো,' অনুরোধের সুরে বলল সে। 'পুলিশকে জানিয়েছি। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না ওরা।'

জানা গেল, আরলিঙটন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ইভা। স্প্রিঙ টার্ম সবে শেষ হয়েছে। ভেবেছিল গরমের ছুটিতে ভাইকে নিয়ে ওয়েস্ট কোস্টে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাবে। এই সময় হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল ওর ভাই।

'কি করব, বুঝতে পারছি না আমি, কিশোর,' ককিয়ে উঠল ইভা। 'প্লীজ, কিছু একটা করো আমার জন্যে!'

দুই সহকারীর মতামতের জন্যে ওদের দিকে তাকাল কিশোর।

ইভার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার ভাই কিছুদিন আগে বিদেশে পলিটিক্যাল মেথড নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়েছিল,

তাই না?'

অবাক হলো ইভা. 'তুমি জানলে কি করে?'

'পত্রিকায় পড়েছি। তোমার ভাইয়ের নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হয়েছে। ওখানেই লিখেছে কথাটা।'

মাথা ঝাঁকাল ইভা। কোন দেশে পড়তে গিয়েছিল ওর ভাই, জানাল। দেশটার সঙ্গে আমেরিকার সদ্ভাব নেই। ওখানে থাকতে নাকি একদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় খুব আঘাত পেয়েছিল হ্যারিস গেনার। 'দেশে ফেরার পর ওকে স্বাভাবিকই মনে হয়েছে,' ইভা বলল, 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছিল না। নিশ্চয় স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে দাদার। পথ ভুলে কোনদিকে চলে গেছে কে জানে।'

'ওই আঘাতের কারণে নষ্ট হয়েছে ভাবছ?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ। ডাক্তারের কাছে শুনেছি এ ধরনের আঘাতের প্রতিক্রিয়া আঘাত পাওয়ার বেশ কিছুদিন পরেও হয়ে থাকে।'

'কিশোর,' মুসা বলল, 'আমার মনে হয় কেসটা নিয়ে ফেলা উচিত আমাদের।'

হাসল কিশোর। 'তা তো নেবই···'

উজ্জ্বল হলো ইভার মুখ। কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ওহ্, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!···কেঁদেকেটে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করে ফেলেছি, সরি!'

'না না, ঠিক আছে, ও কিছু না,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। আর বিব্রত হতে চায় না।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ইভা, তোমার ভাইয়ের কোন ছবি আছে তোমার কাছে?'

হাতব্যাগ থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে দিল ইভা। 'এই একটাই ছিল আমার কাছে,' হাসল সে, 'হারালে আর পাব না।' উঠে দাঁড়াল। 'তো, চলি আজ।'

'কোথায় থাকো, ঠিকানা দিয়ে যাও তোমার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে।'

ইভা বেরিয়ে গেলে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'যাক, অনেক দিন পর কেস একটা পাওয়া গেল।'

'তেমন জটিল কোন রহস্য বলে তো মনে হচ্ছে না,' মুসা বলল। 'একজন মাথা খারাপ লোককে খুঁজে বের করতে হবে, ব্যস। এ আর এমন কি কঠিন।'

'পুলিশ যে রহস্যের সমাধান করতে পারেনি, ওটাকে এত সহজ ভাবছ কেন? বলা যায় না কি খুঁজতে গিয়ে কি বেরোয়।'

'তাহলে আরলিংটনে যাচ্ছি আমরা?'

'অবশ্যই। ইভাকে কথা দিয়ে দিলাম না আমরা। তুমিও তো বললে কাজটা নেয়া উচিত আমাদের।'

'তা তো বলেছি, কিন্তু আমার গুপ্তধন খোঁজার কি হবে? যন্ত্রটা কেনার

পর ব্যবহারই করতে পারলাম না…'

'গাড়িতেই রেখে দাও,' হেসে বলল রবিন। 'গুপ্তধন বাদ দিয়ে আপাতত মানুষ খুঁজতে কাজে লাগাবে।'

'মানুষের ব্যাপারে সঙ্কেত দেয় না। শুধু ধাতব জিনিস।'

'মানুষও অনেক ধাতুতে গড়া। আমাদের শরীরে কত রকমের ধাতু আছে, শুনতে চাও?'

'না, চাই না! ওসব শুনতে এ মুহূর্তে ভাল লাগবে না আমার!'

দুই

পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা মুসার পুরানো জেলপি গাড়িটাতে করে। দ্রুত ছুটল সাগরতীরের রাস্তা ধরে।

রবিন বলল, 'তোমার এই ভটভটি নিয়ে তো বেরোলাম, শেষে রাস্তাঘাটে না আটকে পড়ি। চলবে তো?'

'চলবে না মানে! দেখতে খারাপ, আওয়াজও করে, কিন্তু কোনদিন কোথাও বিপদে ফেলেনি আমাকে,' আদর করে স্টিয়ারিঙে হাত বোলাল মুসা।

ওর কথা ঠিক। এবারও ওদের ঝামেলায় ফেলল না গাড়িটা। ঠিকমতই পৌঁছে দিল আরলিঙটনে। শহরে ঢোকার পর কিশোর বলল, 'ভালমত নজর রাখো। থাকার জায়গা দেখলেই থামতে হবে।'

কয়েকটা মোটেল পেরিয়ে এল ওরা। কোনটাই পছন্দ হলো না। হয় বেশি দামী, নয়তো একেবারে সাধারণ। অত সাধারণ জায়গায় থাকতে ইচ্ছে করে না কিশোরের। ওর মতে ওগুলোতে থেকে কষ্ট করার চেয়ে বাইরে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটানো অনেক আরামের।

'অ্যাই, কিশোর, ওটা কেমন মনে হয়?' হাত তুলে একটা সাইনবোর্ড দেখাল রবিন।

ব্রিজ মোটেল, নাম লেখা রয়েছে। নিজেদের গুণকীর্তন সবিস্তারে লিখে রেখেছে নিচে।

'মনে হয় খারাপ হবে না,' কিশোর বলল। 'মুসা, ঘোরাও তো। যাও ওদিকে।'

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা। পাতার ছাউনি দেয়া একটা সুন্দর কটেজ দেখা গেল। সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে: অফিস। বাঁয়ে লম্বা একটা নিচু একতলা বাড়ি। প্রতিটি ঘরের সামনে একটা করে পামগাছ লাগানো হয়েছে। ডানে রয়েছে একসারি কটেজ। মোট বারোটা, সব একই রকম দেখতে। অফিস বাড়িটার মত ওগুলোরও পাতার ছাউনি।

'কোথায় উঠলে ভাল হয়?' রবিনের প্রশ্ন। 'লম্বা বাড়িটাতে ঘর নেব, নাকি একটা কটেজ ভাড়া করব।'

'চলো, আগে দাম জিজ্ঞেস করে দেখি,' কিশোর বলল। অফিসের দিকে য়েতে বলল মুসাকে।

অফিসে ডেস্কের ওপাশে বসে থাকতে দেখা গেল মাঝবয়েসী এক লোককে। পুরো মাথা জুড়ে গোল টাক, কেবল কান আর ঘাড়ের ওপরে অল্প কিছু পাতলা ফুরফুরে চুল বাদে। টাকে হাত বুলিয়ে হাসি দিয়ে ছেলেদের স্বাগত জানাল সে, 'এসো এসো। বেড়াতে এসেছ? ছাত্র নিশ্চয়? বেড়াতে এলে ছাত্ররা এই মোটেল ছাড়া আর কোথাও ওঠে না।'

প্রশ্নের জবাব দিয়ে মোটেলে রুম খালি আছে কিনা, ভাড়া কত জানতে চাইল কিশোর। একটা ঘরই খালি আছে, জানাল ম্যানেজার। রেজিস্টারে নাম সই করে, ক্লার্কের হাতে টাকা গুণে দিল কিশোর। ঘরের চাবি দিল ওকে লোকটা।

সাত নম্বর রুম। চাবি দিয়ে দরজা খুলে মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা।

রবিন বলল, 'কিছু মানুষ আছে অতিরিক্ত কথা বলে, অহেতুক।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তা ঠিক। দেখলে না কেমন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের কাছ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করছিল। কেন এসেছি আমরা এটা যত কম লোকে জানবে, ততই ভাল।'

ওদের কথায় কান দিল না মুসা, সুটকেস খুলতে খুলতে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।' তোয়ালে বের করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল সে।

হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় পরে, আবার বেরোল ওরা। দরজায় তালা দিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। মুসা বলল, 'রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি তো, নাকি?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'আগে খাওয়া। তারপর থানায় যাব পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে।'

'হ্যারিস গেনারের ব্যাপারে কতটা জানে ওরা জানার জন্যে?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

খাওয়া সেরে নিয়ে থানায় রওনা হলো ওরা।

নতুন তৈরি একটা বিল্ডিঙের মাটির নিচে পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ওপরটায় টাউন হল। পুলিশ চীফ অফিসে নেই, সুতরাং ডেস্ক সার্জেন্টের কাছে নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর। রকি বীচের পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচার তিন গোয়েন্দাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, শহরের বাইরে অন্য অঞ্চলে কাজ করতে গেলে সেটা দেখালে যাতে পুলিশ ওদের সহায়তা করে। সেটা দেখিয়ে সার্জেন্টের কাছে গেনারের কেসটার কথা জানতে চাইল কিশোর।

'ও কিছু না,' গুরুত্বই দিল না সার্জেন্ট, 'অন্যমনস্ক হয়ে কলেজ থেকে হেঁটে বেরিয়ে গায়েব হয়ে গেছে হ্যারিস গেনার। ওয়াল্ট ডিজনির অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর দেখোনি, ওরকম ব্যাপার আরকি।'

'কোন সূত্র পাওয়া যায়নি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না, কিছুই না। আশা করছি দু'চারদিনের মধ্যেই ওর খবর পাব।' সামনে ঝুঁকল সার্জেন্ট, 'একটা গোপন কথা বলি তোমাদের, আমার ধারণা

লোকটা পাগল। অতিরিক্ত মাথা ঘামিয়ে অনেক বিজ্ঞানী আছে না পাগল হয়ে যায়, মগজে চাপ পড়ে বলে, এরও হয়েছে ওরকম।'

মন্তব্য করল না গোয়েন্দারা। চুপচাপ বেরিয়ে এল থানা থেকে। বাইরে বেরিয়েই ফুঁসে উঠল মুসা, 'এই সার্জেন্ট লোকটাও পাগল! জ্ঞান দিতে আসে!'

'জ্ঞান আর উপদেশ বিতরণ করা অনেক মানুষের স্বভাব, কি আর করা,' আনমনে মাথা চুলকাল কিশোর।

এরপর কলেজের ডিনের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কলেজটা কোথায় একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল মুসা। গাড়ি চালাল সেদিকে। শহরের একধারে ছোট্ট একটুকরো বনের মাঝে কলেজটা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে এনে গাড়ি রাখল সে।

একসঙ্গে সবার যাওয়ার দরকার নেই। গাড়িতে বসে রইল মুসা। কিশোর আর রবিন নেমে মার্বেল পাথরে তৈরি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। একটা হলওয়েতে ঢুকল।

ডিনের অফিসটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। দরজার গায়ে লেখা রয়েছে:

DEAN WALTER FOLLETT

ডিনের ঘরে ঢুকতে হলে অনুমতি নিতে হয়। একজন রিসেপশনিস্টকে বুঝিয়ে বলল কিশোর, জরুরী কারণে দেখা করতে এসেছে ওরা। ব্যাপারটা গোপনীয়। সবাইকে বলা যাবে না, কেবল ডিনকেই বলবে।

অনুমতি মিলল। ওদেরকে ডিনের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল রিসেপশনিস্ট।

বড় ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন লম্বা একজন মানুষ, ঝাঁকড়া চুল বয়সের কারণে ধূসর হয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ফলেট। হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন হয়ে গেলে বললেন, 'বসো। কি নাকি গোপন কথা আছে আমার সঙ্গে? বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে।'

ডেস্কের অন্যপাশে ডিনের মুখোমুখি বসল তিন গোয়েন্দা।

হ্যারিস গেনারকে খুঁজতে এসেছে, জানাল কিশোর।

'ভাল করেছ,' ডিন বললেন, 'আমরা সবাই তাকে খুঁজছি। তা তোমরা কে, তাই তো জানা হলো না।'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল কিশোর।

হাতে নিয়ে দেখলেন ফলেট। তারপর কার্ডটা টেবিলে রেখে দিয়ে বললেন, 'বুঝলাম। হ্যাঁ, তা আমার কাছে কি জানতে চাও, বলো?'

'হ্যারিস গেনারের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে যতটা জানাতে পারেন।'

'আশা করি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জেনে যাবে তোমরা শিগগিরই, গোয়েন্দা যখন।' আনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করলেন তিনি, 'অদ্ভুত! ভারি অদ্ভুত!'

'কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওই তো, যেভাবে গায়েব হয়ে গেল গেনার।' কি করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন লেকচারার, জানালেন ফলেট। পরদিন নাকি ছেলেদের পরীক্ষা ছিল, এর জন্যে প্রশ্নপত্রও তৈরি করেছেন গেনার। তারপর রহস্যজনক ভাবে সেটা ডেস্কের ওপর ফেলে রেখে রাতের বেলা কোথায় চলে গেছেন।

'পরদিন সকালে কাগজগুলো পাওয়া গেছে,' ডিন বললেন। 'পেয়েছে ওরই একজন সহকারী। সেই সব প্রশ্ন ছেপে পরীক্ষাও নেয়া হয়েছে ছেলেদের।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ডেস্কে ঠুকতে লাগলেন তিনি। 'কিন্তু সেই যে গেল, আর ফিরে এল না গেনার। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত!'

'সহকারীর নাম কি, যিনি কাগজগুলো পেয়েছেন?' জানতে চাইল রবিন। 'বলতে অসুবিধে আছে?'

প্রশ্নটায় অবাক হলেন যেন ডিন। একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো। 'না, অসুবিধে থাকবে কেন? ওর নাম মেরিন ডিগ। গেনারের সহকারী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। একই কথা খেলে গেল দু'জনের মনে, মেরিন ডিগের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

'ও-কে, বয়েজ, আর কিছু বলার নেই আমার, যা যা জানি, বলেছি,' উঠে দাঁড়ালেন ডিন। 'আমার ধারণা, মাথায় কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে গেনারের। স্মৃতিবিভ্রমও ঘটে থাকতে পারে।'

'মিস্টার ডিগের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমরা,' অনুরোধ করল কিশোর, 'আপনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন? আর, মিস্টার গেনারের ঘরটাও একবার দেখতে চাই।'

একটা কাগজে ঠিকানা লিখে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন ফলেট। জানালার কাছে গিয়ে হাতের ইশারায় কিশোরকে ডাকলেন। মাঠের শেষধারে কতগুলো বাড়ি দেখিয়ে বললেন, 'বড় বিল্ডিঙটাতে গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা থাকে। আর তার ওপাশের ছোট ছোট বাড়িগুলোতে ইনস্ট্রাক্টর আর লেকচাররা।'

ডিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। গাড়িতে উঠে মুসাকে বলল, মাঠের ধারের বাড়িগুলোর কাছে নিয়ে যেতে।

তিন

গাড়ি চালাল মুসা। ডিনের কাছে কি জেনে এসেছে, সব জানাল ওকে রবিন আর কিশোর। পথে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে দেখা গেল—সামার সেশনের জন্যে নাম রেজিস্ট্রি করতে এসেছে।

বাড়িটা থেকে খানিক দূরে গাড়ি রেখে বসে রইল মুসা। কিশোর আর রবিন নেমে গেল আগেরবারের মত। সামনে বেঁটেমত এক লোক হেঁটে

যাচ্ছে। বয়েসে তরুণ। ওকে চোখে পড়ে যায় তার কারণ গাঢ় রঙের জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে, আর হাস্যকর ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। দ্রুত হেঁটে ওর পাশ কাটিয়ে এল দুজনে।

পাশ কাটানোর সময় রবিনের গায়ে আলতো খোঁচা দিল কিশোর। ইঙ্গিত করল লোকটার দিকে। একবার পেছনে ফিরে তাকানোর কৌতূহল সামলাতে পারল না রবিন। গোলগাল, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা লোকটার।

বাড়িটাতে পৌঁছে ১৭ নম্বর রুম খুঁজে বের করল কিশোর। দরজার পাশে বসানো কলিং বেলের সুইচ টিপল। কান পেতে রইল ভেতরের শব্দ শোনার আশায়। নেই, কোন শব্দ নেই। আবার বেল টেপার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর, এই সময় পেছন থেকে বলে উঠল একটা হাসিখুশি কণ্ঠ, 'আমাকে খুঁজছ?'

চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর আর রবিন। সেই লোকটা।

'মেরিন ডিগ?' আপনা থেকেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল কিশোরের মুখ থেকে।

'হ্যাঁ। কি সাহায্য করতে পারি?'

নিজের আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর।

দরজা খুলে ওদেরকে নিজের ঘরে নিয়ে এল ডিগ।

কেন এসেছে, জানাল কিশোর। হ্যারিস গেনার সম্পর্কে যা যা জেনেছে, ডিগকে জানিয়ে জিজ্ঞেস করল সে এর বেশি আর কিছু জানে কিনা।

'জানি,' জবাব দিল ডিগ, 'তবে পুলিশের ধারণা, ওগুলো জরুরী কোন বিষয় নয়।'

'কি জানেন?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল রবিন।

'দাঁড়াও, বলছি,' ওদের বসতে বলে একটা চেয়ার টেনে এনে মুখোমুখি বসল ডিগ। 'খুব শীঘ্রি বিয়ে করতে যাচ্ছে হ্যারিস, এই খবরটা কি জানো তোমরা?'

অবাক হলো দুজনেই। মাথা নাড়ল।

ডিগ জানাল, ইয়োরোপের যে দেশটায় লেখাপড়া করতে গিয়েছিল গেনার, ওখানে একটা মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। ওই মেয়েটাকেই নাকি বিয়ে করবে সে। যেহেতু দেশটার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভাল না, ওই দেশের মেয়েকে বিয়ে করার কথা তার বোনকেও বলতে অস্বস্তি বোধ করেছে গেনার।

'তারমানে আপনি বলতে চান স্মৃতি হারানো কিংবা পাগল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল ডিগ, 'একেবারেই না।'

এটা অবশ্য নতুন তথ্য; তবে এর বেশি আর কিছু জানাতে পারল না ডিগ। গেনারের ঘরটা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে ওকে অনুরোধ করল কিশোর।

'এসো,' উঠে দাঁড়াল ডিগ, 'এই তো, পাশের ঘরটাই।'

গেনারের ঘরের চাবি আছে তার কাছে। খুলে দিল। দুই গোয়েন্দার

সঙ্গে ভেতরে ঢুকে বলল, 'দেখেছ, কি রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? সব ঠিকঠাক। বোঝাই যায় না পালানোর প্ল্যান করছিল গেনার। আমিও কিছু বুঝতে পারিনি।'

'কিন্তু বিয়ে করার জন্যে একটা লোক পালাবে কেন, এটাও তো মাথায় ঢুকছে না,' রবিন বলল।

'আমার মাথায়ও না।'

'এগুলো কি?' টেবিলে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কতগুলো কাগজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আপনি বলতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব। পরীক্ষার প্রশ্ন। নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে এগুলো তৈরি করেছিল গেনার...'

কিশোর আর রবিন মিলে পুরো ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজল। সঙ্গে সঙ্গে থেকে চিলের নজর রাখল ডিগ, তার সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ওরা। কিন্তু লোকটাকে সরানোর কোন ছুতো বের করতে পারল না। অগত্যা ওর সামনেই খুঁজতে হলো। কোন সূত্র পেল না। পাওয়ার আশাও অবশ্য করেনি, কারণ এর আগে পুলিশ এসে খুঁজে গেছে।

'থ্যাংক ইউ,' কিশোর বলল, 'এখন যাই। সময় করে আবার আসব। আরেকবার খুঁজে দেখব ঘরটা।'

'যখন খুশি এসো,' নির্দ্বিধায় স্বাগত জানাল ডিগ। 'এক কাজ করো না বরং, আমার এখানেই থেকে যাও। আলাদা বিছানা আছে, থাকার অসুবিধে হবে না।'

হেসে মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'না, না, ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। লোক বেশি আমরা, সঙ্গে আরও একজন আছে। যাই। পরে আসব।'

গাড়িতে ফিরে এল ওরা। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে মুসা, ওরা কি খবর আনে শোনার জন্যে। যা জানল তাতে তেমন খুশি হতে পারল না। তদন্তের অগ্রগতি হয়নি প্রায় কিছুই। এখনও এমন কোন জরুরী সূত্র পায়নি যেটা গেনারকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

মোটেলে ফিরে চলল ওরা।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ডিগ লোকটাকে কেমন মনে হলো তোমার?'

'উঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল কিশোর, 'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আজব চরিত্র মনে হয়নি?'

'আজব কিনা জানি না, তবে হাঁটার ভঙ্গি দেখলে ভাঁড় বলবে ওকে লোকে,' আবার চিন্তায় ডুবে গেল কিশোর।

'ঘরে যাওয়ার আগে কোথাও কিছু খেয়ে নিলে হয় না?' গাড়ি চালাতে চালাতে আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল মুসা।

'তা যায়,' রাজি হলো কিশোর।

রবিন বলল, 'আমারও খিদে পেয়েছে।'

একটা ফার্স্ট-ফুড শপ থেকে হালকা খাবার খেয়ে নিল ওরা। ফিরে এল মোটেলে। ঘরের দরজা খুলেই থমকে দাঁড়াল কিশোর। দুজন বয়স্ক মানুষ বসে আছে—একজন পুরুষ, আরেকজন মহিলা। লোকটা খবরের কাগজ পড়ছে, মহিলা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে।

'মাফ করবেন,' ভদ্রকণ্ঠে রবিন বলল, 'আপনারা বোধহয় ভুল জায়গায় ঢুকে পড়েছেন।'

'হ্যাঁ, এটা আমরা ভাড়া নিয়েছি,' বলল কিশোর। 'সাত নম্বর।'

ফিরে তাকিয়ে হাসল মহিলা, 'তোমরা নিশ্চয় তিন গোয়েন্দা? তোমাদের মালপত্র বের করে নিয়ে গেছে ম্যানেজার। অসুবিধে নেই, সব পাবে ওর কাছে।'

'কেন, নেবে কেন?' কিশোর অবাক। 'আমরা এটা ভাড়া নিয়েছি। রেজিস্টারে নাম সই করে চব্বিশ ঘণ্টার ভাড়াও অগ্রিম দিয়েছি।'

বলেই বুঝল, এদেরকে প্রশ্ন করে লাভ নেই, ঠিকও হবে না, কারণ দোষটা এদের নয়। যা করার ম্যানেজার করেছে। চাবি না দিলে এরা খুলতে পারত না। নিশ্চয় কোন গোলমাল হয়েছে, কিছু একটা ঘটেছে, নাহলে ম্যানেজারও এ রকম করত না। কি ঘটল?

জানার জন্যে উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজারের অফিসে ছুটল তিন গোয়েন্দা।

ওদের দেখে চওড়া হাসি হাসল টেকো লোকটা। 'এসো, এসো, সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি। মালপত্র তোমাদের ঘরে পৌঁছে গেছে। ভাল জায়গা পছন্দ করেছ। আগেই বলেছিলাম, কটেজ নাও...তবে আগে সাধারণ রুমটা দেখে নিয়ে ভালই করেছ, নিজেরা বুঝে নিয়েছ, আমি চাপাচাপি করলে ভাবতে জোর করে গছাতে চাইছি...'

'মানে?' অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'যা করতে বলেছ তাই করেছি। তোমাদের মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কটেজ ঠিক করে, রুম থেকে তোমাদের মালপত্র বের করে এনে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি,' টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ম্যানেজার। 'যাও, সব ঠিকঠাক পাবে। একটা জিনিসও খোয়া যাবে না। এ সব দিকে আমার কড়া নজর। ম্যানেজারি করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেললাম...'

টাকমাথা লোকটার মুখে চুল পাকানোর কথা শুনতে কেমন হাস্যকর লাগল। মুসার তো শুধরেই দিতে ইচ্ছে করল—বরং বলুন, চুল খসিয়ে ফেললাম; কিন্তু বলল না কিছু, চুপ করে রইল।

বোকা হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল তিনজনে। কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছে না।

বকবক করে চলেছে ম্যানেজার, 'কটেজ নিয়ে ভাল করেছ। আরামে থাকবে, শান্তিতে থাকবে, রুমের চেয়ে ভাড়াও তেমন বেশি না, অথচ দুটো জায়গায় পার্থক্যটা অনেক। যে তিনজন বন্ধুকে পাঠালে তোমরা, ওরা এসে মেসেজটা দিয়ে বলল, আগের ঘরটা পছন্দ হয়নি তোমাদের, নিরিবিলি থাকতে চাও, একটা কটেজ যেন রেডি করে রাখি আমি। তা রেখেছি। তোমাদের

আসতে দেরি হবে জেনেও একমুহূর্ত সময় নষ্ট করিনি। বোর্ডাররা বিরক্ত হয় এমন কোন কাজ আমাকে দিয়ে হবে না...'

'তা কটেজটা কোথায়?' কিছুটা রেগে গিয়েই জানতে চাইল মুসা।

ওর রাগটা বোধহয় ধরতে পারল না ম্যানেজার। হাত তুলে ছোট ছোট বাড়িগুলো দেখিয়ে বলল, 'অসুবিধে নেই, খুব সুন্দর, গিয়ে দেখোই না...'

আবার ছুটল তিন গোয়েন্দা। কটেজের কাছে এসে জানালা দিয়ে দেখল ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে গাট্টাগোট্টা এক তরুণ, ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড় হবে। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই রেগে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'এ সবের অর্থ কি?'

ঘুরে দাঁড়াল তরুণ। কালো একটা মুখোশে মুখের ওপরের অংশ ঢাকা, বড় বড় ফুটো দিয়ে চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা বড় আলমারির দরজা। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরও চারটে মুখোশধারী ছেলে।

'আরি, হচ্ছেটা কি! কে আপনারা?' চিৎকার করে উঠল রবিন।

তার কথার জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন মনে করল না ছেলেগুলো। তিনজনকে মেঝেতে ফেলে চেপে ধরে বেঁধে ফেলল। বয়ে এনে তুলল একটা গাড়িতে। মোটেল থেকে বেরিয়ে মহাসড়ক ধরে কয়েক মাইল এগোল গাড়িটা। তারপর মোড় নিয়ে একটা সরু রাস্তায় নামল। সেটা ধরে মাইলখানেক এগোতে দেখা গেল রেললাইন।

তিন গোয়েন্দাকে বয়ে আনা হলো লাইনের ধারে। ছোট ছোট ঝোপঝাড় জন্মে আছে ওখানে। ওগুলোর জন্যে রাস্তা থেকে লাইনটা ভালমত চোখে পড়ে না। তিনটে তক্তায় ওদেরকে চিত করে বেঁধে ওগুলো লাইনের ওপর আড়াআড়ি ফেলে চলে গেল ছেলেগুলো।

বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমেছে অনেক আগেই। রাতের অন্ধকার এগিয়ে আসছে। ছেলেগুলো সরে যেতেই বাঁধন খোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল তিন গোয়েন্দা। টানাটানি করতে করতে ঘেমে গেল, কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘাম। কিন্তু বাঁধন ঢিল করতে পারল না একচুল।

ঠিক এই সময় কলজে কাঁপিয়ে দিয়ে দূরে শোনা গেল রেলইঞ্জিনের বাঁশি।

চার

মাথা ঘুরিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিনজনে। প্রাণপণে আরেকবার বাঁধন খোলার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। আর কোন আশা নেই। কপালে মৃত্যুই আছে বুঝি এবার!

এগিয়ে আসছে ইঞ্জিনের ভারি শব্দ। ওদের ধ্বংস করে দিতে ছুটে আসছে যেন এক ভয়াল দানব। আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে হাত-পা।

এসে গেছে। আর একশো গজ দূরেও নেই। শেষবারের মত পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। যেন নীরবে শেষ বিদায় জানাল একে অন্যকে।

এসে গেল ইঞ্জিন। তারপর যেন কোন অলৌকিক কারণে ওদের গায়ের ওপর দিয়ে না গিয়ে কানফাটা ভয়ানক শব্দ আর প্রবল কম্পন তুলে পাশ দিয়ে চলে গেল। বেঁচে আছে, বিশ্বাস হতে চাইল না ওদের। কি করে ঘটল ঘটনাটা? ঘটারং-ঘট ঘটারং-ঘট করে এখনও পার হচ্ছে একের পর এক মালবাহী ওয়্যাগন।

থরথর করে কাঁপছে শরীর। বেঁচে গেছে এটা যখন বিশ্বাস হলো মুসার, বাঁধন খোলার চেষ্টা চালাল আবার সে। বড় ধাক্কাটা কেটেছে, ওদেরকে লাইনের ওপর ফেলে রেখে যাওয়ার পর এই প্রথম মাথাটা আবার ঠিকমত কাজ করতে আরম্ভ করেছে। আড়চোখে অস্পষ্টভাবে দেখল লাইনের একটা মোটা পেরেকের চোখা মাথা বেরিয়ে আছে। শরীরটা আঁকাবাঁকা করে ঝাঁকাতে লাগল সে। তিল তিল করে ওর মাথার দিকটা এগিয়ে চলল পেরেকের দিকে। অনেক কষ্ট করে, লাইন আর পাথরের ঘষায় শরীরের কয়েক জায়গার চামড়া ছিঁড়ে-কেটে অবশেষে হাতের বাঁধন পেরেকটার কাছে নিয়ে যেতে পারল। দড়ি ঘষতে লাগল পেরেকের সঙ্গে। এক সুতা এক সুতা করে কাটতে লাগল দড়িটা।

আবার শোনা গেল ট্রেনের শব্দ। আরেকটা ট্রেন আসছে। একবার বেঁচেছে বলেই যে আবার বাঁচবে এমন সম্ভাবনা নেই। তাড়াহুড়া শুরু করল সে। অবশেষে যেন দীর্ঘ কয়েক যুগ পর দড়িটা কাটতে সক্ষম হলো।

দড়িটা ছাড়িয়ে নিয়েই উঠে পড়ল সে। পকেটনাইফ বের করে পায়ের বাঁধন কাটল। তারপর কেটে দিল কিশোরের হাতের বাঁধন।

তিনজনেই মুক্ত হয়ে সরে গেল লাইনের ওপর থেকে। অনেক কাছে এসে গেছে দ্বিতীয় ট্রেনটা।

বিমূঢ় ভাব কাটেনি এখনও রবিনের। কব্জি ডলতে ডলতে বলল, 'এপারে আছি তো? না মরণের ওপারে চলে গিয়ে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখছি?'

'চলে যেতাম, যদি পাশের লাইনটা দিয়ে না যেত ট্রেনটা,' কিশোর বলল। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে হাত-পা ঝাড়ছে।

চাঁদের আলোয় চকচক করছে কয়েক গজ দূরের আরেকটা লাইন। সেদিকে তাকিয়ে তারপর আবার ওদের পায়ের কাছের লাইনটার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল সে, 'দেখো, এটায় মরচে পড়া।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন।

'এটা সাইডলাইন,' জবাব দিল কিশোর, 'পুরানো। ব্যবহার হয় না।'

'তারমানে আমাদের ভাগ্যের জোরে ওরা ভুল করে বাতিল লাইনে ফেলে গেছে আমাদের।'

'আমার তা মনে হয় না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, 'জেনেশুনে ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে। হয়তো কেবল ভয় দেখানোর জন্যে। মারতে চায়নি।'

দাঁতে দাঁত চাপল মুসা, 'কায়দা মত পেয়ে নিই! ভয় দেখানো ওদের আমি বের করব!'

'পাঁচজনের সঙ্গে পারব না আমরা, মুসা,' মনে করিয়ে দিল রবিন।

'সে দেখা যাবে। ওরা আমাদের সঙ্গে এ রকম করতেই থাকবে আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করব, কিছুই না করে ছেড়ে দেব, এটা ভাবলে মহাভুল করবে ওরা।'

'কি করবে তাহলে?'

'আপাতত মোটেলে ফিরে যাব,' জবাব দিল কিশোর।

লাইন ধরে কয়েক মিনিট হাঁটার পর সরু রাস্তাটা চোখে পড়ল ওদের। সেটা ধরে এগিয়ে এসে উঠল মহাসড়কে। রাতের বেলা জোয়ান ছেলেছোকরা হাত তুললে গাড়িগুলো থামতে চায় না। সবাই ছিনতাই বা ডাকাতিকে ভয় পায়। তবে একজন ট্রাক ড্রাইভারের মনে হলো, ছেলেগুলো খারাপ নয়। থামল সে। কোথায় যাবে জানতে চাইল। লিফট দিতে রাজি হলো।

ড্রাইভারের পাশে গাদাগাদি করে বসল তিনজনে। মুসার পাশের দরজাটা খোলা রাখতে হলো, নইলে বসা যায় না। তার অর্ধেকটা শরীরই বেরিয়ে রইল।

ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাচ্ছে, নিচুস্বরে কিশোরের সঙ্গে কথা বলল রবিন, 'আচ্ছা, ওরা কোন ভুল করেনি তো? ভুল করে আমাদের শাস্তি দিয়েছে হয়তো। স্কুলের দলাদলি হতে পারে।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। অন্ধকারে কারও চোখে পড়ল না সেটা। বলল, 'উঁহু, ভুল ওরা করেনি। ভয় দেখাতে চেয়েছে আমাদের, যাতে গেনারকে খোঁজাখুঁজি না করে আরলিঙটন থেকে কেটে পড়ি আমরা।'

'তারমানে তোমার ধারণা গেনারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

'হওয়াটা কি অসম্ভব? হয়নি যে তেমন কোন সূত্র তো এখনও পাইনি আমরা।'

ওদের আলোচনায় যোগ দিল না ড্রাইভার। বেশি কথা বলার মানুষ না সে। নীরবে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছল আরলিঙটনে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা। সোজা রওনা হলো ম্যানেজারের অফিসে।

'টেকোকে ভালমত চেপে ধরার সময় হয়েছে এখন,' ভারি গলায় বলল কিশোর। 'আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ওকে।'

দরজা বন্ধ। বেল টিপে ধরল কিশোর। কয়েকবার করে টেপার পর আলো জ্বলল ভেতরে। দরজা খুলে দিল ম্যানেজার। ঘুমে জড়ানো ফোলা ফোলা চোখ, চকচকে টাক, পায়জামা আর গেঞ্জি পরা পেটমোটা লোকটাকে হাস্যকর লাগছে এখন। মেজাজ খারাপ না থাকলে হেসে ফেলত মুসা।

'রাত দুপুরে ঘুমন্ত মানুষকে বিছানা থেকে টেনে তোলার অর্থ কি, অ্যাঁ?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার। অফিসের চেয়ারে বসা বিগলিত হাসিওয়ালা সেই লোকটার সঙ্গে একে মেলানো যায় না। যেই মনে করেছে,

ওরা কটেজ ছেড়ে দিচ্ছে, ওদের সঙ্গে ব্যবসা শেষ, অমনি বদলে গেছে আচরণ। 'মোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে হলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন কিছু করতে পারব না।'

'আর কিছু না পারেন, আমার কিছু প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবেই,' কিশোরও সমান তেজে বলল। 'আমাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ারই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

থমকে গেল ম্যানেজার। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ঘরে ঢোকার জন্যে। সব শোনার পর বলল, ছেলেগুলোকে চিনতে পেরেছে। আরলিঙটন কলেজে পড়ে। এই এলাকারই ছেলে। খুব পাজি। মারামারি, দলাদলি এ সব করে বেড়ায়।

'মনে হয় নতুন মুখ দেখে তোমাদের সঙ্গে একটু মজা করতে চেয়েছিল ওরা,' ম্যানেজার বলল।

'মনে করা ওদের বের করব এবার...' গজগজ করতে লাগল মুসা।

'পুলিশকে খবর দিতে যাচ্ছি আমরা,' কিশোর বলল। 'নাম কি ওদের? কোথায় থাকে?'

সবার নাম জানে না ম্যানেজার। দু'তিনজনের জানে, ওদের নাম আর ঠিকানা একটা কাগজে লিখে দিল। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে একটা বাড়িতে ঢুঁ মেরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। মুসাকে বলল সেদিকে যেতে। নীরব রাতে বিকট শব্দ তুলে ছুটল জেলপি। পুব আকাশে অন্ধকার কাটতে শুরু করেছে। ভোর হতে দেরি নেই।

বাড়ির সামনে এসে আগের মতই গাড়িতে বসে রইল মুসা, রবিন আর কিশোর নেমে গেল। কলিং বেলের বোতাম টিপল কিশোর। সাড়া না পেয়ে দরজায় থাবা মারতে লাগল রবিন।

অবশেষে দরজা খুলে দিল পায়জামা পরা একটা ছেলে। খালি পা। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল, 'মাঝরাতে এত ডাকাডাকি কিসের? আমরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।' বলে দরজা লাগিয়ে দিতে গেল।

চট করে একটা পা ঢুকিয়ে দিয়ে আটকাল কিশোর, 'মজা করতে আসিনি আমরা। বব বোম্যান কোথায়?'

বড় করে হাই তুলল ছেলেটা, 'ওকে জাগানো যাবে না।'

'যাবে না কেন?' কিশোরের কাঁধের কাছ থেকে বলে উঠল মুসা, গাড়িতে বসে থাকতে পারেনি, কি ঘটছে এখানে দেখার জন্যে চলে এসেছে। 'জোরে জোরে ধাক্কা দাওগে, জেগে যাবে।'

'কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছ না, ও আমাদের প্রেসিডেন্ট...'

কিশোরকে সরিয়ে তার জায়গায় চলে এল মুসা, 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নাকি ও? যাও, জলদি গিয়ে উঠতে বলো। নাকি থানায় যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে?'

ভেতরে চলে গেল ছেলেটা। উত্তেজিত কথা আর ধমক শোনা গেল। বেরিয়ে এল গাট্টাগোট্টা আরেকটা ছেলে। পরনে লাল-সাদা স্ট্রাইপের

পায়জামা। তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়তেই থমকে গেল। দু'চোখে বিস্ময়।

'তোমরা...'

ওকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা, বলল, 'হ্যাঁ, আমরা। নরক থেকে প্রেতাত্মা হয়ে বেরিয়ে এসেছি তোমার চোয়ালের হাড্ডি ক'খান ভাঙার জন্যে। আরও কাছে এসো, কোনখান থেকে শুরু করা যায় বুঝে দেখি...'

ওর কাঁধে হাত রেখে বাধা দিল কিশোর, 'দাঁড়াও, পেটে কি কি কথা লুকিয়ে আছে, আগে বের করি, তারপর তোমাকে একটা চান্স দেয়া যাবে...'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আরও এক পা এগিয়ে এল বব। কি করবে বুঝতে পারছে না।

ওর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রেললাইনের ওপর আমাদের ফেলে আসার মানেটা কি? মোটেলে আমাদের ঘর থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছ কেন?'

'এমন ভঙ্গি করছ তোমরা, যেন আমি তোমাদের শত্রু,' ছেলেটা বলল। 'একটু পরখ করতে চেয়েছিলাম, স্রেফ যাচাই করে নেয়া, আর কিছু তো না। এত রাগার কি হলো?'

'রেললাইনের ওপর ফেলে এসেছ মরার জন্যে, আর বলছ স্রেফ যাচাই? মানেটা কি এ সবের?'

'মারার জন্যে ফেলে আসিনি,' বব বলল, 'যেটাতে রেখে এসেছিলাম, ওটা বাতিল লাইন, ট্রেন চলাচল করে না। তারপরেও আড়াল থেকে নজর রেখেছিলাম, বাই চান্স যদি কোন বিপদ ঘটে যায় সাহায্য করার জন্যে। দেখলাম, তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে যথেষ্ট, সাহায্যের কোন প্রয়োজনই নেই। তোমরা আরলিঙটনে ভর্তি হতে এসেছ, তাই না?'

'না,' জবাব দিল রবিন।

'আমাদের কি পরখ করছিলে?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর। 'কার হুকুমে?'

প্রশ্নটা দ্বিধায় ফেলে দিল ববকে। পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকাল সে। এই অসময়ে কার সঙ্গে কথা বলছে দেখার জন্যে আরও কয়েকটা ছেলে নেমে আসছে দোতলা থেকে।

কিশোরের দিকে ফিরল বব, 'এর জবাব তোমাকে দিতে পারব না আমি।'

'যদি কথা দিই, মুখ খুলব না? কাউকে বলব না ওর কথা?'

কিশোরের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বব বলল, 'আমরা ভেবেছি তোমরা লায়ন কাবসে যোগ দিতে এসেছ, কসম...'

'লায়ন কাবসটা কি?'

'আমাদের তরুণদের একটা সংঘঠন। তোমাদের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম। আমরা ভেবেছি তোমরা আরলিঙটনে ভর্তি হবে, তাই আগে থাকতেই আমাদের দলে টানতে চেয়েছি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ববের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ওর মনে হলো সত্যি কথাই বলছে ছেলেটা। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার হাতের সুখ মেটাতে পারলে না, মুসা। অন্য সময় দেখা যাবে। চলো এখন, যাই।'

সারারাত ঘুমায়নি, তার ওপর নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর পরিশ্রম, ঘুমে ভেঙে আসতে চাইছে চোখ। তবু মোটেলে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আরও খানিকটা তদন্ত সেরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

বাইরে এসে সঙ্গীদের বলল, 'ডিগ ঘুম থেকে ওঠার আগেই গেনারের ঘরটা আরেকবার দেখব, চলো।'

হাতঘড়ি দেখল রবিন, ছ'টা বাজে। এত সকালে নিশ্চয় ঘুম থেকে ওঠেনি ডিগ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'চলো।'

গেনারের কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলো ওরা। পথে কয়েকটা দুধের গাড়ি আর একজন খবরের কাগজের হকারকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। এত ভোরে অন্য কেউ নেই রাস্তায়। কলেজের কোয়ার্টার-গুলোতেও প্রাণের সাড়া নেই, ঘুমন্ত।

কোয়ার্টারের সামনে এসে আগের মতই গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মুসা। কিশোর আর রবিন নেমে গেল।

সোজা গেনারের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। পকেট থেকে মাস্টার কী বের করে তালা খুলতে একটা মিনিটও লাগল না তার। রবিনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল। ডিগ যে পাশে থাকে সেপাশের দেয়ালে কান ঠেকিয়ে শুনল। নীরব।

'এখনও স্বপ্নের জগতেই আছে,' ফিসফিস করে রবিনকে বলল সে।

'কি দেখতে এসেছ?'

'জানি না। এসো, খুঁজি।'

বাতি জ্বালতে হলো না। সামনের দুটো জানালা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে। এখনও অস্পষ্ট, তবে ঘরের জিনিসপত্র সব দেখা যায়। রবিনকে আসবাবগুলো পরীক্ষা করতে বলে নিজে ডেস্কে রাখা নোট আর বইগুলো দেখতে এগোল কিশোর।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও নতুন কিছু পেল না ওরা, গেনারের কি হয়েছে বা ও কোথায় গেছে এ ব্যাপারে সামান্যতম সূত্র পাওয়া গেল না।

'পুলিশ এত করে খুঁজে যাওয়ার পর আর কিছু পাওয়ার কথাও না,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল রবিন। 'আসলে কি খুঁজছ তুমি, কিশোর?'

জবাব না দিয়ে একটা প্রশ্নপত্রের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর মনোযোগ। কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা।

এগিয়ে গেল রবিন। 'কিছু পেয়েছ মনে হচ্ছে?'

'দেখো এটা!' উত্তেজনায় গলা কেঁপে উঠল কিশোরের।

পাঁচ

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। 'কই, কি আছে এতে? কয়েকটা প্রশ্ন ছাড়া তো আর কিছু দেখছি না।'

'হ্যাঁ, এই প্রশ্নগুলোর মধ্যেই রয়েছে একটা জরুরী সূত্র,' কিশোর বলল।

'আমি কিছুই দেখছি না!'

'প্রথম প্রশ্নটা দেখো…'

'দেখলাম। রাশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার।'

'আমারও না। পরের প্রশ্নটা দেখো।'

'আফ্রিকায় কি ঘটছে…তাতেই বা আমার কি?'

'আমারও না,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর। রবিন বুঝতে পারছে না দেখে মজা পাচ্ছে সে।

'দেখো, কিশোর,' অধৈর্য হয়ে বলল রবিন, 'দোহাই তোমার, যা বুঝেছ, বলে ফেলো! না বোঝালে বুঝব না!'

'মোট ক'টা প্রশ্ন আছে?'

'দশটা।'

'প্রতিটি প্রশ্নের প্রথম অক্ষরটা নিয়ে পর পর সাজাও। কি হয়?'

দ্রুত ওপর থেকে নিচে চলে গেল রবিনের চোখ। অক্ষরগুলো সাজালে হয়:

S-H-E-E-P-R-I-D-G-E

শিস দিয়ে উঠল সে, 'শিপরিজ! কোনও শহরের নাম!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'বেশ চালাকি করে সূত্র রেখে গেছে গেনার। আমার ধারণা পুলিশ এটা বের করতে পারেনি। সম্ভবত গেনারের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে তেমন গুরুত্বই দেয়নি পুলিশ।'

'তাতে আমাদেরই ভাল হয়েছে, রহস্যটার মীমাংসা করতে পারব। কিন্তু আর তো দাঁড়াতে পারছি না, চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোন রকম চিন্তা-ভাবনা করতে পারব না এখন। মাথা কাজ করছে না।'

'ঘুমাতে যাওয়ার আগে নাস্তা খেয়ে নিতে হবে, খালি পেটে ঘুম ভাল হবে না,' কিশোর বলল। 'ঘুম থেকে উঠে পোস্ট অফিসে যাব শিপরিজটা কোথায় জানতে।'

'কমন নেম। পুরো আমেরিকায় অন্তত পঁচিশটা শিপরিজ পাওয়া যাবে। ক'টাতে খুঁজব? সবগুলোতে খুঁজতে গেলে খোঁজা শেষ হতে হতে আশি বছরের বুড়ো হয়ে যাবে গেনার।' বড় করে হাই তুলল রবিন। তাড়াতাড়ি গিয়ে কান পাতল দেয়ালে।

'শুনেছ নাকি কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মনে হয় ডিগ উঠে পড়েছে। জলদি পালানো দরকার। ধরা পড়লে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যাবে।'

বেরিয়ে এল দুজনে। দরজার তালাটা আবার লাগিয়ে দিল কিশোর। নিচে নেমে দেখল স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে মুসা। ধাক্কাধাক্কি করেও তাকে জাগানো গেল না। তবে নাস্তার কথাটা কানের কাছে বলতেই মুহূর্তে পুরো সজাগ হয়ে গেল। স্টার্ট দিল গাড়িতে।

ক্যামপাসের ক্যাফেটেরিয়া এখনও খোলেনি। তাই শহরের একধারে একটা অল-নাইট কাফের সামনে গাড়ি রাখল মুসা।

ভরপেট খেয়ে কাফে থেকে বেরোল ওরা। মোটেলে ফিরে চলল।

ঘরে ফিরে একটানে জুতো খুলেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। কাপড় বদলানোর কষ্টও সহ্য করতে রাজি নয়। বলল, 'আমি গেলাম, আর পারছি না!'

অন্য দুজনেরও একই অবস্থা। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজনেই।

কয়েক ঘণ্টা টানা ঘুম দিয়ে জাগল ওরা। ঝরঝরে লাগছে এখন শরীর। হাতমুখ ধুয়ে, তৈরি হয়ে রওনা হলো ওরা। দরজা দিয়ে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াল রবিন। ঘোষণা করল, 'ঝামেলা আসছে! লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হও!'

'কি হয়েছে?' রবিনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর।

মুসা এসে দাঁড়াল তার পেছনে।

রিজ মোটেলের চওড়া লন পেরিয়ে হেঁটে আসছে চারজন তরুণ। দলপতি বব বোম্যান।

'লায়ন কাবস,' বিড়বিড় করল মুসা। 'আজ যদি আবার সিংহগিরি দেখাতে এসে থাকে, ভাল হবে না। কেশর কেটে দিয়ে তবে ছাড়ব।'

'আগেই মারামারি শুরু করে দিয়ো না,' সাবধান করল কিশোর, 'কি জন্যে এসেছে দেখি।'

দরজা দিয়ে আগে বেরোল সে।

এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলল বব, 'হাই! তোমাদের চমকে দিতে এলাম।'

কিশোরের দু'পাশ দিয়ে বেরোল মুসা আর রবিন।

মুসার মারমুখো ভঙ্গি ভাল ঠেকল না ববের, ওর হাতের কিলবিলে পেশীগুলোর দিকে তাকাল চোখে সন্দেহ নিয়ে। বলল, 'দেখো, মারামারি করতে আসিনি আমরা।'

তাহলে কি করতে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

কি জন্যে এসেছে, বলল বব। তিন গোয়েন্দাকে ওর পছন্দ হয়েছে। সে চায় ওরা লায়ন কাবসে যোগ দিক।

'কাজ নেই তো আর খেয়েদেয়ে, মানুষ থেকে শেষে পশুর বাচ্চা হতে যাই...' বলে ফেলল মুসা।

অহেতুক ঝগড়া বাধাতে চায় না এখন কিশোর, তাই মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'যোগ দিতে পারি, এক শর্তে। কাল রাতে কে আমাদেরকে

লাইনের ওপর ফেলে আসতে বলেছিল, যদি তার নাম বলো।'

দ্বিধায় পড়ে গেল বব। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বলতে চায় সে, কিন্তু কোন কারণে পারছে না। শেষে বলল, 'দেখো, বলতাম, সত্যি। কিন্তু একজন বন্ধুকে ফাঁসিয়ে দেয়া কি ঠিক?'

'তাহলে বোলো না।'

'কিন্তু তোমরা তো তাহলে আমাদের দলে আসবে না।'

'শর্ত না মানলে কি করে আসব।'

'এলে খুব ভাল হত।' মুসার দিকে তাকাল বব, 'তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি, মুসা আমান। দারুণ বাস্কেটবল খেলো। তোমার খেলা দেখেছি। আরলিঙটনের যে কোন টিম তোমাকে পেলে লুফে নেবে।'

'ধন্যবাদ,' মুসা বলল, 'আপাতত আরলিঙটনের কারও লোফালুফির পাত্র হবার ইচ্ছে আমার নেই, এমনিতেই খুব ভাল আছি।'

কোনমতেই তিন গোয়েন্দাকে লায়ন কাবসে ঢোকাতে রাজি করতে না পেরে হতাশ হয়েই ফিরে চলল বব। তবে বোঝা গেল, আশা ছাড়েনি সে। আবার আসবে চাপাচাপি করতে।

বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। পোস্ট অফিসে ঢুকে একজন ক্লার্ককে অনুরোধ করতেই একটা পোস্টাল ডিরেক্টরি বের করে কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন।

অনেকক্ষণ পাতা ওল্টানোর পর নিশ্চিত হলো, শিপরিজ অনেকগুলো আছে আমেরিকায়, তবে লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে মাত্র একটা। কাজ সহজ হয়ে যাওয়ায় খুশি হলো ওরা। ডিরেক্টরিটা ক্লার্ককে ফেরত দিয়ে, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কোথায়?'

জবাব দিল কিশোর, 'অবশ্যই শিপরিজে, তবে তার আগে ক্যাম্পাসে যাও। ডিন আর মেরিন ডিগের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।'

'তার কোন প্রয়োজন আছে?'

'আছে।'

আগেরবারের মতই শীতলভাবে ওদেরকে গ্রহণ করলেন ডিন ফলেট। ওরা চলে যাচ্ছে শুনে জানতে চাইলেন কোথায় যাচ্ছে।

জানাল কিশোর।

কোন ভাবান্তর হলো না তাঁর। গেনারকে খোঁজার জন্যে ওদের একটা শীতল ধন্যবাদ জানিয়ে আবার কাজে মন দিলেন।

বেরিয়ে এল ওরা। ডিগের সঙ্গে দেখা করতে চলল।

ঘরেই পাওয়া গেল তাকে।

কিশোর বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি। এখানে আমাদের কাজ শেষ।'

হাত মেলাতে মেলাতে রবিন বলল, 'আপনার সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

'দুঃখ একটাই,' বলল কিশোর, 'আপনার বন্ধুকে খুঁজে বের করতে

পারলাম না।'

'তাতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই,' বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন মনে হলো না ডিগকে, বরং তিন গোয়েন্দা চলে যাচ্ছে শুনে যেন খুশিই হলো। 'আমার এখনও বিশ্বাস, ইয়োরোপেই গেছে সে, বিয়ে করতে, হয়তো এতক্ষণে করেও ফেলেছে। হানিমুন করছে নতুন বউকে নিয়ে। হাহ্ হাহ্ হা!' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।

'সেটা হলে তো ভালই। যাই হোক, অনেক সাহায্য করেছেন আমাদের। থ্যাংক ইউ।'

'তা কোথায় যাচ্ছ তোমরা? বাড়ি?'

'না,' ইচ্ছে করেই সত্যি কথাটা জানিয়ে দিল কিশোর, ডিগের চোখের দিকে তাকিয়ে, 'ভাবছি শিপরিজটা একবার ঘুরে যাব...'

চমকে গেল মনে হলো ডিগ, 'কেন? ওখানে কেন? গুহাটা দেখতে নাকি?'

'গুহা!' সতর্ক হলো কিশোর।

'ও, জানো না। একটা বিখ্যাত গুহা আছে ওখানে, নাম ব্ল্যাকহোল। তবে বিখ্যাত না বলে কুখ্যাত বলাই ভাল...'

'আপনি দেখেছেন নাকি গুহাটা?'

'উঁ!' থমকে গেল ডিগ। হাসল। 'দেখেছি। আমার এক চাচা থাকে ওখানে, তার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম...তো, ঠিক আছে, যাও। দেরি করিয়ে দিচ্ছি। আমারও কাজ আছে। লেকচারের জন্যে কিছু কাগজ রেডি করতে হবে।'

কিশোরের মনে হলো, কোন কথা চেপে যাচ্ছে ডিগ। ওরা যে মেরিনকে খুঁজতে যাচ্ছে ওখানে সন্দেহ করেছে নাকি? সন্দেহ কাটানোর জন্যে বলল, 'শুনেছি, শিপরিজটা সুন্দর জায়গা, দেখার মত। গুহাটা যাওয়ার আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিল। গুহার ভেতরে রাত কাটানো খুব মজার, কি বলেন?'

ছয়

মোটেলে ফেরার পথে রবিন বলল, 'শিপরিজের কথা শুনে অমন চমকে উঠল কেন? আমার মনে হয় কিছু লুকাচ্ছে ডিগ।'

'কি জানি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'হতে পারে গেনারের প্রশ্নপত্রে শিপরিজের নামটা সেও আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু কথা হলো, সে জানে আমরা গোয়েন্দা, আবিষ্কারই যদি করে থাকে, আমাদের সেকথা জানাল না কেন?'

'নিজেই যেতে চায় হয়তো ওখানে। বন্ধুকে খুঁজে বের করে সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার তা মনে হয় না। লোকটার ব্যাপারে

সাবধান থাকা দরকার।'

'কি করে থাকব?' মুসার প্রশ্ন। 'আমরা তো চলেই যাচ্ছি এখান থেকে।'

জবাব দিল না কিশোর। ভাবনায় ডুবে গেল।

মোটেলে ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল রবিন আর মুসা, কিশোর ফোন করল রকি বীচে, গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের পাইলট ল্যারি কংকলিনকে। বাড়িতেই পাওয়া গেল ওকে। মেরিন ডিগের কথা তাকে জানিয়ে অনুরোধ করল কিশোর, 'লোকটার ওপর সন্দেহ হচ্ছে আমাদের, ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাবেন?'

'তোমাদের ঠিকানা বলো।'

'শিপরিজে যাচ্ছি। কোথায় উঠব বলতে পারছি না। আপনি খোঁজখবর নিন, আমি আবার ফোন করব।'

টাকমাথা বাচাল ম্যানেজারকে অফিসে পাওয়া গেল। বিল মিটিয়ে দিল কিশোর। আবার তিনজনে গাড়িতে উঠতে মুসা বলল, 'তাহলে শিপরিজেই যাচ্ছি?'

'কেন, কোন সন্দেহ আছে নাকি তোমার?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'না না, বলছিলাম কি ব্ল্যাকহোল গুহায় যাব নাকি?'

'দরকার পড়লে যাব।'

হেসে বলল রবিন, 'ভয় করছে নাকি তোমার?'

'তা একটু-আধটু যে করে না তা নয়। আমি ভাবছি, আমার মেটাল ডিটেক্টরটা এবার কাজে লাগানো যাবে কিনা?'

'গুহার মধ্যে কি খুঁজবে? ভূত?'

'আরে দূর!' জোরে হাত নাড়ল মুসা, 'এটা কি গোস্ট ডিটেক্টর নাকি? আমি বলছি গুপ্তধনের কথা। সোনার মোহর-টোহর যদি লুকানো থাকে...'

'তাহলে বড়লোক হয়ে যাব,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'নাও, বকবকানি থামিয়ে এখন গাড়ি চালাও।'

রওনা হওয়ার সময় আকাশটা ভালই ছিল, এখন যতই সামনে এগোচ্ছে ধূসর হয়ে আসছে আকাশের রঙ। একসময় কুয়াশায় ঢেকে গেল সবকিছু। হেডলাইট জ্বেলে খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে মুসাকে। ঘণ্টাখানেক পরই কুয়াশা কেটে গেল, হেসে উঠল উজ্জ্বল রোদ। আবহাওয়ার এই যখন-তখন পরিবর্তনে অবাক হলো না ওরা, এদিকে এ রকমই হয়, জানা আছে।

সাগর সমতল থেকে এখানে দুশো ফুট ওপরে রাস্তা। পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। সাগরের দিকটায় কোথাও খাড়া, কোথাও ঢালু হয়ে নেমেছে পাহাড়ের দেয়াল। ঢালু অংশগুলোতে সাগর আড়াল করে দিয়ে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা, ঝোপঝাড়।

কিছুদূর এগোনোর পর সামনে ঢালু হয়ে এল পথ। লম্বা একটা পাহাড়ের কিনার দিয়ে নিচে নামতে নামতে একসময় চোখে পড়ল শিপরিজ। মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা অতি খুদে একটা গ্রাম। সৈকতের ধারে ছোট্ট জেটি তৈরি করেছে জেলেরা। শান্ত, সুন্দর গ্রাম। দেখে মনে হয় ঘুমিয়ে

আছে। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রাস্তার পাশে একটা পুরানো বাড়ি দেখা গেল। রোদ-বৃষ্টি আর নোনা হাওয়ায় রঙ এমন চটেছে, যতটা না পুরানো তার চেয়ে অনেক বেশি পুরানো মনে হয়।'

দরজায় বড় করে সাইনবোর্ড লেখা:

HARRY'S GENERAL STORE.

মুসাকে বলল কিশোর, 'থামো, কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে ক্যাম্প করার জন্যে।'

বাড়িটার সামনে গাড়ি রেখে মুসা বলল, 'একটা করে বার্গার খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না।'

কাউন্টারের ওপাশে বসে আছে মাঝবয়েসী, ঝাড়ুর শলার মত খাড়া খাড়া গোঁফওয়ালা এক লোক। পত্রিকা পড়ছে।

সাড়া পেয়ে কাউন্টারের ওপর কাগজটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। চশমার ভারি লেন্সের ওপাশ দিয়ে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তাকাল ওদের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হয় যেন বহুদিন বাদে এই প্রথম মানুষ চোখে পড়েছে।

'আপনিই মিস্টার হ্যারি?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ,' খসখসে গলায় জবাব দিল লোকটা, 'কি সাহায্য করতে পারি?'

'ব্ল্যাকহোলটা কতদূরে, বলতে পারেন?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল হ্যারির, 'ব্ল্যাকহোল! ওখানে যাওয়ার জন্যে এসেছ নাকি?'

'হ্যাঁ, গুহার কাছে ক্যাম্প করতে চাই।'

কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে দিল হ্যারি। 'ক্যাম্প করবে? ব্ল্যাকহোলে?'

'কেন, অসুবিধে আছে নাকি?'

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'এখানে এই প্রথম এলে নাকি?'

'হ্যাঁ, রকি বীচ থেকে। বেড়াতে বেরিয়েছি।'

'শিপরিজ বেড়ানোর জন্যে খুব ভাল জায়গা।'

'গুহাটা কতদূরে, বলেননি কিন্তু।'

'এই রাস্তা ধরেই চলে যাও পাঁচ মাইল। তারপর খানিক হাঁটতে হবে।'

কাউন্টারে কনুই ঠেকাল মুসা। 'বার্গার আছে নাকি?'

'আছে,' হ্যারি বলল, 'খুব ভাল বার্গার। তাজা। তাজা জিনিস ছাড়া বেচি না আমি

'দিন তাহলে। তিনটা।'

প্লেটে করে বার্গার এনে দিল হ্যারি।

বার্গারের কাগজের মোড়ক ছাড়াতে ছাড়াতে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'গুহার কাছে ক্যাম্প করাব জায়গা আছে নাকি?'

'আছে। কাছেই একজন জেলে থাকে, নাম রিক ডেলভার। খাতির করে

নিতে পারলে ওর বাড়ির কাছে তোমাদের থাকতে দেবে সে। লোক ভাল। গুহার কাছে না গিয়ে ওর বাড়ির কাছাকাছি থাকলেই ভাল করবে।' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে মুখ খুলল হ্যারি, 'আমি হলে অন্তত ওই গুহার কাছে ক্যাম্প করতে যেতাম না কিছুতেই।'

'শুধু ক্যাম্প করা নয়, আমরা তো ভাবছি গুহাটাতেই ঢুকব।'

'পাগল!' ঢোক গিলল হ্যারি।

'কেন, বেআইনী নাকি?'

'না। তবে সুস্থ মস্তিষ্ক কোন লোক এখন আর ওই গুহায় ঢুকতে চাইবে না।'

'কেন?'

'বললাম তো, মাথা খারাপ না হলে ওই গুহায় ঢোকার কথা ভাববে না কেউ,' এমন ভঙ্গি করল হ্যারি, যেন এতেই সব প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে।

'আপনার কথা কিছুই বুঝলাম না!' রবিন বলল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'গুহায় ঢোকাটা বিপজ্জনক নাকি?'

'নাহলে এত কথা বলব কেন? আমার পরামর্শ শুনলে, ওই গুহার ধারেকাছে যেয়ো না।'

কাউন্টারে কনুই রেখে অধৈর্য হয়ে বলল রবিন, 'দয়া করে কারণটা কি আমাদের খুলে বলা যায়?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল হ্যারি। 'বেশ, না শুনে যখন ছাড়বে না···ইদানীং অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে গুহার মধ্যে।'

এইবার টনক নড়ল মুসার। খাড়া করে ফেলেছে কান। বার্গার চিবানো বন্ধ হয়ে গেল। 'খাইছে! ভূত নাকি?'

'তা বলতে পারব না,' মাথা নাড়ল হ্যারি। 'কয়েক দিন আগে আমার পরিচিত এক জেলে গিয়েছিল গুহার কাছে। এত ভয় পেয়েছিল, আরেকটু হলে হার্টফেল করেই মরত বেচারা। নেহাত হার্টটা শক্ত আর নীরোগ বলে বেঁচে গেছে। গুহার ভেতরে আর আশেপাশে নাকি আজব আলো দেখা যায়, শব্দ শোনা যায়, গোলাগুলি চলে।'

'গোলাগুলি!' ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর।

'হ্যাঁ। দুজন অতি উৎসাহী লোক গুহার আলোক-রহস্য জানতে গিয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। আততায়ীকে দেখতে পায়নি ওরা।'

কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো মুসা, 'আর যাই করুক, ভূতে গুলি ছোঁড়ে না। গলা টিপে ধরে, নয়তো ঘাড় মটকে দেয়। কোন কোন ভূত জীবন্ত মানুষের শরীর থেকেই চুপচাপ রক্ত খেয়ে চলে যায়।'

আবার বার্গার খাওয়ায় মন দিল সে।

চট করে ভাবনাটা খেলে গেল কিশোরের মাথায়—ওই গুহার মধ্যেই ঢোকেনি তো হ্যারিস গেনার? জিজ্ঞেস করল, 'লোক দুজন কারা, এই এলাকার কেউ?'

'না, চিনি না। আগে নাকি কখনও এখানে দেখা যায়নি ওদের।'

'ওদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন? তাদের মধ্যে কি হ্যারিস গেনার নামে একজন কলেজের লেকচারার আছেন?'

'তা বলতে পারব না। ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। যে জেলের কাছে গুহার কথা শুনেছি, লোকগুলোর কথাও সে-ই বলেছে।'

'জেলের নাম কি? ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আপাতত পাওয়া যাবে না ওকে। ওর মায়ের শরীর খারাপ, তাকে দেখতে গেছে। অনেক দূরে থাকে ওর মা।' কিশোরের চোখের দিকে তাকাল হ্যারি। 'মনে হচ্ছে লোক দুজনকে তোমাদের দরকার?'

'না না, এমনি, গুহাটার ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে তো, ওদের মুখ থেকেই সব শুনতাম,' কোনমতে দায়সারা জবাব দিয়ে হ্যারির প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সে।

ক্যাম্প করার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চাইল কিশোর। ওগুলো নিয়ে, খাবার আর জিনিসের দাম মিটিয়ে, হ্যারিকে ধন্যবাদ দিয়ে দরজার দিকে এগোল।

গুহার কাছে না যাওয়ার জন্যে আরেকবার ওদেরকে সতর্ক করল দোকানদার।

সাত

মহাসড়ক ধরে মাইল পাঁচেক এগোনোর পর ডানে একটা সরু কাঁচা রাস্তা দেখা গেল। এবড়োখেবড়ো, নুড়িতে ভরা রাস্তাটা চলে গেছে সৈকতের ধারে তৈরি একসারি বাড়ির দিকে। জেলেদের বাড়ি ওগুলো।

রাস্তাটা ধরে গাড়ি চালাল মুসা। দুশো গজ দূরে পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে সৈকতটা যেখানে আচমকা শেষ হয়েছে সেখানে একটা ছোট্ট বাড়ি। ওটার খানিক দূরে পাহাড়ের পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। বাড়ির পেছনে পাহাড়, একটা আঁকাবাঁকা পথ উঠে গেছে চূড়ার দিকে।

'ওটাই সম্ভবত রিক ডেলভারের বাড়ি,' হাত তুলে দেখিয়ে কিশোর বলল।

'যাব নাকি ওদিকে?' জানতে চাইল মুসা।

'যাও।'

বাড়ির কাছ থেকে সামান্য দূরে এনে গাড়ি রাখল মুসা। নেমে গেল কিশোর আর রবিন। ড্রাইভিং সীট থেকে মুসাও নেমে এসে এগোল ওদের পেছন পেছন।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

খুলে দিল একজন বেঁটে লোক। বুড়ো হয়ে গেছে। ভাঁজ পড়া, খসখসে মুখের চামড়া। তিন গোয়েন্দাকে দেখে অবাকই হলো। যেন ওদের মত

কাউকে এখানে দেখতে পাবে আশা করেনি।

'আপনি রিক ডেলভার?' প্রশ্ন করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। হাসল।

মুসার গাড়িটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'গাড়িটা রাখলাম। কোন অসুবিধে হবে?'

'না, অসুবিধে হবে না। ঘুরতে যাবে নাকি? কতক্ষণ লাগবে তোমাদের? ঘন্টাখানেক?'

'আসলে কয়েকদিন থাকব ভাবছি। যদি আপনার কোন অসুবিধে না হয়...'

'গুহা দেখতে আসোনি তো?' মুখের ভাব বদলে গেছে বুড়োর। চোখ পিটপিট করে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে।

'ঠিকই ধরেছেন, গুহা দেখতেই এসেছি।'

হাসি চলে গেছে বুড়োর। ভারী গলায় বলল, 'ভাল চাও তো বাড়ি ফিরে যাও। গুহার অবস্থা ভাল না। খামোকা কেন প্রাণটা খোয়াতে যাবে।'

'কে, রিক?' ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্ন করল একটা মহিলাকণ্ঠ, 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

'এই তো, কয়েকটা ছেলে, বেড়াতে এসেছে,' ফিরে তাকিয়ে জবাব দিল রিক। 'গুহা দেখতে যেতে চায়।'

'বলে কি!' ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গোলগাল এক মহিলা।

'এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কি আছে গুহায়?'

'আলো আর গুলি!' রহস্যময় স্বরে জবাব দিল বুড়ো।

'লোকজন দেখেছেন? আছে ভেতরে?'

'কারও ছায়াও নেই।'

'তাহলে গুলি করে কারা?'

'জানি না!'

'অবাক কাণ্ড!'

'অবাক বলে অবাক! এক্কেবারে ভূতুড়ে কাণ্ড! খোদাই জানে এ কোন ধরনের ভূত, গুলিও চালায়!'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা। চট করে তাকাল চারপাশে। গায়ে কাঁটা দিল ওর। মনে হলো, গুহা থেকে বেরিয়ে এই বুঝি ওর ঘাড় মটকাতে এল কোন ভূত।

'ওই গুহায় কখনও ঢুকেছেন আপনি, মিস্টার ডেনভার?' জানতে চাইল কিশোর।

'এত লম্বা নামের দরকার নেই, আমাকে শুধু রিক ডাকলেই চলবে,' বুড়ো বলল। জানাল কয়েকদিন আগে নাকি রাতে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। আবহাওয়া ভাল ছিল না। বাতাস আর সেই সঙ্গে বড় বড় ঢেউ। তীর থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দেখল আলো। বুড়ো বলল, 'গুহার কাছে দুটো আলো দেখলাম। খানিক পর দু'তিনটে গুলির শব্দ। চিৎকার করে উঠল কে

যেন।'

'চিৎকারটা কেমন? আর্তনাদ? মানে কাউকে খুন করা হচ্ছে, এমন?'

'সে বলে বোঝানো যাবে না। এমন চিৎকার জীবনে শুনিনি আমি। ভয়ঙ্কর!'

'তারমানে বোঝা যাচ্ছে,' বিড়বিড় করল রবিন, 'ভেতরে কেউ আছে। দোকানদার হ্যারির কাছেও শুনলাম এই গপ্পো। পুলিশকে জানালেই পারেন?'

'জানানো হয়েছে। পুলিশ এ সব বিশ্বাস করে না। বুড়ো জেলেদের কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। একটিবার দেখতেও আসেনি গুহাটা।'

ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করা গেল না তিন গোয়েন্দাকে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'গুহায় যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথটা বলতে পারেন?'

কোনভাবেই নিরস্ত করতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল বুড়ো জেলে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর নেমে এল দরজা থেকে। ওদেরকে নিয়ে সৈকত ধরে কিছুদূর চলার পর হাত তুলে পাহাড়ে উঠে যাওয়া রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা ধরে চূড়ায় উঠে যাও। নিচে তাকালে ওপাশে একটা খাদ দেখতে পাবে। ওই খাদ ধরে এগোতে থাকলে পেয়ে যাবে গুহাটা।'

গাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা। ক্যাম্প করার জিনিসপত্র বের করে কাঁধে তুলে নিল। জেলে দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, তারচেয়ে খাড়া পাহাড়টা। চূড়ায় উঠতে পুরো একটা ঘণ্টা লেগে গেল।

এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল ওপর থেকে। অনেক নিচে সৈকতে জেলেদের ঘরগুলোকে খেলনার মত লাগছে। সাগরকে মনে হচ্ছে বিশাল এক নীল রঙের মেঝে, ঘরের মেঝের মতই সমান।

চূড়ার অন্যপাশে—সাগরের দিকটায় একেবারে কিনারে গিয়ে নিচে তাকাল রবিন। পাথরের খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। নিচে আছড়ে পড়ছে উত্তাল ঢেউ। শক্ত জাতের কিছু ঝোপঝাড় জন্মে রয়েছে এখানে ওখানে।

'সৈকত ধরে হেঁটে গুহায় যাওয়া অসম্ভব,' অনুমান করল সে। 'সাগরের দিক দিয়ে যেতে হলে নৌকায় করে যেতে হবে।'

ঝোড়ো বাতাসে ভর করে ভেসে এল মেঘের গুড়ুগুড়ু। আকাশের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'জলদি চলো। ঝড় আসছে। এখানে থাকলে মরব।'

বড় বড় পাথরের চাঙড়ের মধ্যখান দিয়ে চলে গেছে সরু পায়ে চলা পথ। সেটা ধরে হাঁটতে শুরু করল ওরা। একটু পর পরই সরে গিয়ে নিচে তাকাচ্ছে রবিন। গিরিখাদটা দেখতে পাচ্ছে না। অবিশ্বাস্য দ্রুত মেঘে ঢেকে ফেলছে আকাশ। অন্ধকার করে ফেলেছে। এর মধ্যে খাদটা চোখে পড়বে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। হয়তো দেখা যাবে হঠাৎ করেই ওটাতে নেমে পড়েছে ওরা।

মুখে এসে পড়ল বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা। কালো আকাশকে চিরে দিয়ে ছুটাছুটি শুরু করল বিদ্যুতের তীব্র উজ্জ্বল নীলচে-সাদা সাপগুলো। কানফাটা বিকট শব্দে ঘন ঘন বাজ পড়তে লাগল। শুরু হলো ঝমঝম করে মুষলধারে বৃষ্টি।

বাড়ছে বাতাসের বেগ। অনেক নিচে পাথুরে দেয়ালে কামানের গর্জন তুলে ভাঙছে ঢেউ। চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে গোয়েন্দারা। সামনের পথ ঠিকমত চোখে পড়ছে না। ভোঁতা গোঁ গোঁ শব্দ তুলছে বাতাস, আকাশে বিদ্যুতের চমক, আর চলছে একনাগাড়ে বজ্রপাত।

আগে আগে চলেছে মুসা। মাঝে কিশোর, সবার শেষে রবিন। বৃষ্টি আর বাতাসের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নুইয়ে রেখেছে। বুঝতে পারছে না এই দুর্যোগের মধ্যে আদৌ খুঁজে পাবে কিনা গিরিখাদটা।

হঠাৎ কি মনে হতে ফিরে তাকাল কিশোর। ধড়াস করে উঠল বুক। চিৎকার করে উঠল, 'আরি, রবিন গেল কোথায়!'

উধাও হয়েছে রবিন। শত চিৎকার করেও তার সাড়া পাওয়া গেল না।

আট

'গেল কোথায়?' বিমূঢ় হয়ে গেছে মুসা।

প্রবল বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চলে না ভালমত। কয়েক গজ দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না।

'ফিরে যাওয়া দরকার,' কিশোর বলল। 'কোন কারণে আমাদের কাছ থেকে পিছিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিংবা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে কোথাও বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।'

বলল বটে, কিন্তু কথাটা সে নিজেও বিশ্বাস করল না।

প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ভেজা পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে ফিরে চলল দুজনে। বার বার চিৎকার করে রবিনের নাম ধরে ডাকছে। জানে, ঝড়ের গর্জনের মধ্যে এই চিৎকার রবিনের কানে পৌঁছার সম্ভাবনা খুব কম।

'অ্যাই,' শঙ্কিত হয়ে বলল মুসা, 'পা পিছলে পড়েটড়ে যায়নি তো! হাত-পা ভেঙে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে হয়তো কোথাও এখন।'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। হতে পারে। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। কান পেতে শুনতে লাগল কোথাও কিছু শোনা যায় কিনা।

বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে আগে মুসার কানে ঢুকল শব্দটা। অতি মৃদু চিৎকার।

'খাইছে! শুনছ!'

কিশোরও কান পাতল।

আবার শোনা গেল চিৎকার, 'মুসা! কিশোর!'

পিছলে পড়ার ভয়কে পরোয়া না করে পাহাড়ের কিনারে ছুটে গেল দুজনে। উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। ফুট চারেক নিচে একটা কালো দেহ চোখে পড়ল।

রবিন, কোন সন্দেহ নেই। একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। ওদেরকে উঁকি দিতে দেখে প্রায় ককিয়ে উঠল, 'জলদি করো! গাছের গোড়া উপড়ে আসছে!'

'ধরে রাখো!' মুসা বলল। রবিনকে ধরে তুলে আনার চেষ্টা করল। নাগালই পেল না। দমে গেল সে।

'এ ভাবে পারবে না,' কিশোর বলল। 'দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।'

দড়ি বের করল সে। এক মাথা পাথরের সঙ্গে বেঁধে আরেক মাথা ঝুলিয়ে দিল রবিনের নাগালের মধ্যে।

এক হাত বাড়িয়ে থাবা দিয়ে দড়িটা ধরে ফেলল রবিন। একেবারে শেষ মুহূর্তে। সেও দড়ি ধরল, ঝোপের গোড়াটাও উপড়ে এল পাহাড়ের গা থেকে। ধক করে উঠল বুক। একটা হার্টবীট মিস হয়ে গেল তার।

দড়ি ধরে টেনে ওকে ওপরে তুলে আনল মুসা আর কিশোর।

ওপরে উঠে ভেজা মাটিতেই গড়িয়ে পড়ল রবিন। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

'ওখানে গেলে কি করে?' জানতে চাইল মুসা।

একটু শান্ত হওয়ার পর রবিন বলল, 'জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গিয়েছিল। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে বসে ছেঁড়া মাথাটা বাঁধলাম। উঠে দেখি তোমরা নেই। ধরার জন্যে দৌড়াতে শুরু করলাম। এত কিনারে যে চলে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে সরে গেল পায়ের নিচ থেকে। পিছলে পড়ে গেলাম। গাছটা কখন কিভাবে ধরেছি বলতে পারব না।'

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। এবার আর কেউ পেছনে পড়ে রইল না। দেয়ালের বেশি কিনারেও গেল না।

আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা, 'পেয়ে গেছি! খাদ!'

হুড়াহুড়ি করে তার দুপাশে চলে এল অন্য দুজন। সামনে গলা বাড়িয়ে তাকাল। পাহাড়ের গায়ে গভীর একটা ক্ষতের মত হয়ে আছে খাদটা।

সাবধানে তিনজনেই পা রাখল ওটাতে। অনেক নিচে আবছাভাবে চোখে পড়ল সৈকত। বড় বড় ঢেউ আছড়ে ভাঙছে তীরে। চওড়া একটা বিরাট ফাটলের মত পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে গিরিখাদ। পথ গেছে তার মধ্যে দিয়েই। নামতে শুরু করল তিনজনে।

সবার আগে নিচে নামল রবিন।

'ওই দেখো! গুহা!' হাত তুলে চিৎকার করে বলল সে।

কিশোর আর মুসাও দেখল। সাগরের আছড়ে পড়া ঢেউয়ের সামান্য দূরে পাহাড়ের খাড়া দেয়ালে একটা কালো ফোকর।

গুহার দিকে আগে এগোনোর সাহস হলো না মুসার। কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে পা বাড়াল কিশোর। আগে আগে চলল। তার পেছনে এগোল অন্য

দুজন।

গুহামুখে দাঁড়িয়ে ভেতরে আলো ফেলল কিশোর। তিনজনেই দেখল, গুহা না বলে ওটাকে সুড়ঙ্গ বলা ভাল। কালো কক্ষটার পেছন দিকটা হারিয়ে গেছে ভেতরের ঘন কালো অন্ধকারে।

'ইচ্ছে করলে কি আছে ভেতরে এখনই দেখা যায়,' কিশোর বলল।

'মাথা খারাপ!' আঁতকে উঠল মুসা। 'রাতের বেলা এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যাব গুহায় ঢুকতে!'

'গুহার ভেতরে তো আর বৃষ্টি নেই।'

'তাতে কি? বাইরে তাঁবু পাতব। আগুন জ্বালতে হবে। ভিজে একেবারে হাত-পা সিঁটিয়ে গেছে।'

'দেখো, গুহায় থাকলে আরামে থাকতে পারতাম...'

'এখন আমি ঢুকতে পারব না,' সাফ মানা করে দিল মুসা।

'আগুন জ্বালার লাকড়ি পাবে কোথায়?' প্রশ্ন করল রবিন।

তাই তো? একথা তো ভাবেনি। জবাব দিতে পারল না মুসা। আশেপাশে গাছপালা আছে, লাকড়ির অভাব হত না, কিন্তু সব ভিজে চুপচুপে।

'লাকড়ির যা হোক একটা ব্যবস্থা করো তোমরা,' কিশোর বলল, 'আমি আসছি।' গুহায় ঢোকার জন্যে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না সে। টর্চ হাতে ঢুকে পড়ল। কয়েক পা এগিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই, দেখে যাও কাণ্ড!'

তার চিৎকারে মুসাও সাবধান হবার কথা ভুলে গেল। রবিনের সঙ্গে ছুটে এল।

কি দেখেছে টর্চের আলো নেড়ে দেখাল কিশোর, 'লাকড়ি! শুকনো!'

সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা লাকড়ির স্তূপটা দেখল রবিন। 'কে রাখল?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

'আ-আমি জানি...'

'ভূতে...'

তাড়াতাড়ি রবিনের মুখে হাতচাপা দিল মুসা, 'খবরদার, ওই নাম মুখে এনো না!' ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল সে।

ওদের কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। একটা লাকড়ি হাতে তুলে নিল। খটখটে শুকনো। হাসিমুখে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এবার আর আগুন জ্বালতে কোন অসুবিধে নেই।'

'কিন্তু কার লাকড়ি?' জোরে কথা বলতে সাহস করছে না মুসা।

'যারই হোক, আমাদের এখন দরকার, নিয়ে আগুন জ্বালব। তারপর দেখা যাবে।'

'তারমানে গুহাতেই থাকবে তুমি?'

'তো কি বাইরে গিয়ে সারারাত ধরে ভিজব নাকি? বোকামি করতে ইচ্ছে করলে তুমি করোগে, আমি যাচ্ছি না।'

'আমিও না,' বলে দিল রবিন।

অগত্যা আর কি করে মুসা। বাইরে একা থাকার চেয়ে ভূতের ভয় নিয়েও গুহায় থাকা ভাল। সঙ্গে অন্তত দুজন সঙ্গী তো থাকছে। কোন কথা না বলে লাকড়ি জড় করে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করতে লাগল সে। খিদে পেয়েছে।

ব্যাকপ্যাক খুলে ভেজা কাপড় খুলতে শুরু করল রবিন।

আগুন ধরিয়ে ফেলল মুসা। ধোঁয়া উঠছে অগ্নিকুণ্ড থেকে। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। আগুন তো জ্বালা হলো, ধোঁয়া যাবে কোথায়? বেরোনোর পথ না থাকলে অক্সিজেন শেষ করে দিয়ে দম আটকে মারবে ওদের।

কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে দেখল, সোজা ওপরে উঠে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া। তারমানে ফাটল আছে পাহাড়ের গায়ে, চিমনির কাজ করছে।

ভেজা কাপড় বদলে, শরীরে কম্বল জড়িয়ে, আগুনে হাত-পা সেঁকে গরম করতে লাগল ওরা। কিশোর ভাবছে, কে লাকড়ি রাখল এখানে? এর সঙ্গে কি রহস্যময় চিৎকার আর গুলির কোন সম্পর্ক আছে?

উঁকি দিয়ে গিয়ে গুহার বাইরেটা দেখে এল রবিন। বৃষ্টি একবিন্দু কমেনি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি জোয়ারের পানি ঢোকে?'

'মনে হয় না। মেঝে তো শুকনোই দেখছি।'

খাবারের টিন আর ফ্রাইং প্যান বের করে রান্না করতে বসল মুসা। তাকে সাহায্য করল রবিন। মাংস ভাজার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। মুসার ক্ষুধা দশগুণ বাড়িয়ে দিল। চমৎকার জমল খাওয়া। গুহার মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড, দেয়ালে আর ছাদে লালচে আলোয় ছায়ার নাচন, বাইরে ঝড়বৃষ্টি। দারুণ এক পরিবেশ। আগুনের সামনে বসে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল তিনজনেই।

রবিন বলল, 'কম্বলের বদলে এখন পশুর ছাল পেলে ভাল হত। গুহামানব হয়ে যেতাম।'

খাওয়ার পর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। সারাদিনে প্রচুর পরিশ্রম করেছে। বুজে আসছে চোখ। কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল বলতে পারবে না।

চড়চড়, ফুটফাট, নানা রকম বিচিত্র শব্দ করে পুড়তে থাকল লাকড়ি।

এক ঘণ্টা কাটল।

দুই ঘণ্টা।

হঠাৎ জেগে গেল রবিন। অলস ভঙ্গিতে ঘুরে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে পুরো সজাগ হয়ে গেল। পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে।

কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে কে আসছে দেখার চেষ্টা করল। আগুন নিভে গেছে। পুড়ে শেষ হয়ে গেছে কাঠ। কেবল কয়লার আগুন লালচে একটা আভা তৈরি করে অতি সামান্য আলো দিচ্ছে।

কাউকে না দেখে ভাবল রবিন, কিশোর উঠেছে বুঝি, প্রাকৃতিক কর্ম

সারার জন্যে। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে, কিশোর?'

সাড়া দিল না কিশোর। জবাবে চাপা শব্দ করে উঠল কে যেন। মনে হলো খুব অবাক হয়েছে। মেঝের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল পদশব্দ।

নয়

'কে?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন।

জবাব নেই।

'কিশোর! মুসা! জলদি ওঠো!' অন্ধকারে টর্চটার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল সে।

'কি হয়েছে?' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'সকাল হয়ে গেল নাকি? এত তাড়াতাড়ি?'

'ওঠো, জলদি! কে জানি ঢুকেছে!'

'কি করে বুঝলে?'

'হাঁটতে শুনলাম।'

'কিশোর হবে হয়তো। টয়লেট করতে বেরিয়েছিল।'

'আমি বেরোইনি,' জবাব দিল কিশোর।

'খাইছে! তাহলে কে?' চমকে উঠে বসল মুসা। বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। 'আগুনটার কি হলো? টর্চ জ্বালছ না কেন?'

হাতের কাছেই টর্চ রেখেছে কিশোর। তুলে নিয়ে জ্বালল। আলোর রশ্মি ঘুরিয়ে আনল গুহার দেয়ালে, ছাদে। অপরিচিত কাউকে দেখা গেল না।

চোখ পিটপিট করছে মুসা। রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি শুনেছিলে, বলো তো?'

খুলে বলল রবিন।

'সামনের দিকে গেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, পেছনে। সুড়ঙ্গের ভেতরে।'

'ওঠো, দেখে আসি।'

'এই এখন, অন্ধকারের মধ্যে…' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।

'সুড়ঙ্গের মধ্যে দিনের বেলাও যা রাতেও তাই, সব সময়ই অন্ধকার, ভোরের জন্যে বসে থেকে লাভ নেই।'

উঠে পড়ল কিশোর। টর্চ হাতে এগোল গুহার পেছন দিকে।

তিরিশ কদম এগোনোর পর সামনে একটা খিলান দেখা গেল, ওপরটা ধনুকের মত বাঁকা। গুহা থেকে সুড়ঙ্গে ঢোকার প্রবেশপথ। পেছনে তাকিয়ে দুই সহকারীর দিকে নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সামনে টর্চ ধরে রেখে সাবধানে এগোল। খেয়াল রাখল যাতে চোরা গর্তে না পড়ে।

খুব খাটো সুড়ঙ্গ, লম্বায় বড়জোর পনেরো ফুট, মেঝে থেকে ছাদ ছয় ফুট উঁচু। কঠিন পাথুরে মেঝেতে পায়ের ছাপ পড়ে না। সুতরাং কেউ এসে

থাকলেও ছাপ দেখে বোঝার উপায় নেই।

সুড়ঙ্গটা দিয়ে আরেকটা গুহায় ঢোকা যায়।

রবিন বলল, 'মনে হয় অনেক গুহা আছে এখানে। সুড়ঙ্গ দিয়ে যুক্ত। কোনটা দিয়ে কোনটায় ঢুকে গেছে লোকটা কে জানে।'

আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। বিশাল এক গুহায় ঢুকেছে। চারপাশের দেয়ালে অনেক গর্ত, সুড়ঙ্গমুখ ওগুলো, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করল, 'একডজন গর্ত। কোনটা দিয়ে ঢুকেছে লোকটা, কি করে বুঝব?'

'চলো, প্রথমে সবচেয়ে বড়টা ধরেই যাই,' পরামর্শ দিল মুসা। 'না পেলে ফিরে এসে বাকিগুলোতে ঢুকে দেখব।'

'ভাল বলেছ। চলো।'

সোজা এগিয়েছে বড় সুড়ঙ্গটা। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর।

আরেকটু হলে তার গায়ের ওপর এসে পড়ত মুসা। 'কি হলো?'

'দেখো!' মাটির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বলে উঠল মুসা, 'আরি, পায়ের ছাপ!'

পাহাড়ের গভীরে সুড়ঙ্গের মেঝেতে এখানে পাথর নেই, বালি। তার ওপর ভেজা ভেজা। সুতরাং ছাপ পড়েছে। স্পষ্ট বসে গেছে বুটের ছাপ।

'মনে হয় ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা,' কিশোর বলল। 'এসো।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তিনজনেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ঢুকল আরেকটা গুহায়। এটাও বিশাল। এখানে যতগুলো দেখেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনটে টর্চের মিলিত আলোতেও দেয়াল বা ছাদের সমস্ত জায়গা একবারে দেখা গেল না।

পাথরের ছড়াছড়ি এখানে। মেঝেতে পাথর স্তূপ হয়ে আছে। দেয়ালে অসংখ্য সুড়ঙ্গমুখ।

'আলো আরও বেশি হলে ভাল হত,' রবিন বলল, 'ভাল করে দেখতে পারতাম।'

'আলোর ব্যবস্থা হয়তো করা যায়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু কত সুড়ঙ্গ দেখেছ? পাহাড়ের নিচে জালের মত বিছিয়ে আছে। সবগুলো দেখতে হলে অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণ বসে থাকবে না লোকটা, যার পেছনে লেগেছি।'

'তবু আরেকটু খুঁজে দেখা দরকার।'

'আলোর ব্যবস্থা কি করে করবে?' জানতে চাইল মুসা।

'লাকড়ি দিয়ে মশাল বানাতে পারি,' জবাব দিল কিশোর। 'তিনজনের হাতে তিনটে মশাল থাকলে অনেক আলো হবে। তা ছাড়া টর্চের ব্যাটারি ফুরানোরও ভয় থাকবে না।'

'চলো তাহলে, বানিয়ে নিয়ে আসি।'

প্রথম গুহাটায় ফিরে এল ওরা।

লাকড়ির স্তূপের দিকে এগোতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল রবিনের। চেঁচিয়ে উঠল, 'একি!'

'কি হলো?' একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল কিশোর আর মুসা।

তাকিয়ে আছে রবিন। টর্চের আলো ফেলেছে যেখানে ওদের জিনিসপত্র রেখেছিল সেখানে। খাবারের টিনগুলো সব গায়েব। পড়ে আছে কেবল খাওয়া পাঁউরুটির খানিকটা অবশিষ্ট আর মাছের একটা খালি টিন।

'নিয়ে গেছে!' কিশোর বলল।

'নিশ্চয় সেই লোকটা,' বলল রবিন, 'যার পেছনে আমরা লেগেছি। আমরা জেগে যাওয়ায় লুকিয়ে পড়েছিল। যেই আমরা গুহা থেকে বেরিয়েছি, চুপচাপ বেরিয়ে এসে খাবারগুলো সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'খাবার আমাদের দরকার নেই আপাতত,' কিশোর বলল, 'ওব্যাপারে চিন্তা না করলেও চলবে। চলো, যা করছিলাম, করি। লোকটাকে খুঁজে পেলে খাবারগুলোও ফেরত পাব।'

'ওর সঙ্গে কথা আছে আমার,' রাগ চেপে বলল মুসা।

'কথা আমাদেরও আছে।'

'কিন্তু গেল কোনদিকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'জুতোর ছাপ যেখানে পেয়েছি, তার আশেপাশেই আছে হয়তো। যেখান থেকে এইমাত্র ফিরে এলাম ওদিকেই খুঁজব।'

'বাইরে চলে গিয়ে থাকে যদি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বোঝা নিয়ে বাইরে বেরোবে না সে। লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের নিচেই কোথাও।'

হাতে কয়েকটা করে লাকড়ি নিয়ে বড় গুহাটায় আবার এসে ঢুকল তিনজনে। মশালের আলোয় ভাল করে দেখতে লাগল গুহাটা। এত বেশি সুড়ঙ্গমুখ আর ফাটল দেখা গেল, সবগুলোতে ঢোকার কথা ভেবে দমে গেল ওরা।

তবে হাল ছাড়ল না। একধার থেকে খোঁজা শুরু করল। কোনটা ছোট সুড়ঙ্গ, কোনটা বেশ লম্বা। কোন কোন ফাটলের ওপাশে কয়েক হাত দূরেই দেয়াল।

কোনখানেই লোকটার আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

হতাশ হয়ে মুসা বলল, 'অহেতুক খুঁজে আর লাভ নেই। চলো, চলে যাই।'

প্রথম গুহাটায় ফিরে চলল আবার ওরা।

দশ

বাকি রাতটা নিরাপদেই কাটল।

ঘুম ভাঙতে দেখল ওরা, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। গুহা থেকেই চোখে পড়ল

সাগরের রোদ ঝলমলে নীল জল।

পেটে মোচড় দিল মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'কি করব? খাবার তো একদম নেই। আনতে যেতে হবে না?'

'হবে,' বলে চুপ করে ভাবতে লাগল কিশোর।

রবিন বলল, 'লোকটাকে এখন আরেকবার খুঁজতে বেরোলে কেমন হয়? ওকে পেলেই সমস্যা চুকে যায়, খাবারগুলো আদায় করে নিতে পারব।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'লাভ হবে বলে মনে হয় না। রাতেই যখন পাইনি, ও কি আর এখন আমাদের জন্যে বসে আছে নাকি?'

মুসা বলল, 'অ্যাই, কিশোর, এক কাজ তো করতে পারি, আমার মেটাল ডিটেক্টরটাকে কাজে লাগাতে পারি...'

'তাতে কি হবে?' বাধা দিল রবিন। 'তুমিই তো সেদিন বললে এই যন্ত্র মানুষ খুঁজে বের করতে পারে না...'

'মানুষ না পাক, সূত্র তো খোঁজা যায়। এমনও তো হতে পারে, টিনগুলো সঙ্গে না নিয়ে আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে লোকটা? ভারী বোঝা, একার পক্ষে বয়ে বেশিদূর নেয়া কষ্টকর।'

ওর কথায় যুক্তি আছে। তবে অতটা আশা করতে পারল না বলে চুপ করে রইল কিশোর।

রবিন বলল, 'দেখো আধাঘণ্টা, তারপর না পেলে অহেতুক সময় নষ্ট না করে খাবার আনতে যাওয়াই উচিত হবে আমাদের। শরীরে শক্তি থাকতে থাকতে যাওয়া ভাল, এই পাহাড় পেরোনো চাট্টিখানি কথা না। কি বলো, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকিয়ে তার সঙ্গে একমত হলো কিশোর।

মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে কাজে লেগে গেল মুসা। তার ইচ্ছে কোনভাবে যন্ত্রটাকে ব্যবহার করা, খাবার পাক আর না পাক।

তবে কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই ওদেরকে অবাক করে দিয়ে সঙ্কেত দিতে শুরু করল যন্ত্রটা। গুহামুখের কাছে যেখানে সঙ্কেত দিল সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা। একটা পাথরের আড়াল থেকে বের করল জিনিসটা। তুলে দেখাল সঙ্গীদের।

তাকিয়ে আছে রবিন, 'কি জিনিস?'

'পিস্তল!' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। 'জলদস্যুর জিনিস, কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় জাহাজডুবি হয়ে এখানে এসে উঠেছিল ওরা। বহুদিন আগে।'

'দেখি তো?' হাত বাড়াল কিশোর।

হাতে নিয়ে ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আবার মুসাকে ফেরত দিতে দিতে বলল, 'বেশি পুরানো তো মনে হচ্ছে না।'

রবিনও দেখল। 'তাই তো। একেবারেই মরচে পড়েনি। কোম্পানির নামটাও পড়া যাচ্ছে—স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।'

'হ্যাঁ, স্পেনের তৈরি,' কিশোর বলল।

'আচ্ছা, এটা দিয়েই গুলি করা হয়নি তো?' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'গুহার মধ্যে রহস্যময় যে গোলাগুলির কথা বলল জেলেরা?'

ওদের কথাবার্তায় অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। 'এ সব বলে কি বোঝাতে চাইছ তোমরা?'

'বোঝাতে চাইছি, পিস্তলটা অত পুরানো নয়, যতটা তোমার মনে হচ্ছে।'

'তারমানে জলদস্যু নয়? আধুনিক পিস্তল দিয়ে আধুনিক কাজকারবার করছে কোন আধুনিক মানুষ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কাকে সন্দেহ হয় তোমার?' মুসার প্রশ্ন। 'রহস্যময় হ্যারিস গেনার? মেরিন ডিগ?'

'হতে পারে, এখনও জানি না। তবে ডিগকেই বেশি সন্দেহ হয়।'

'সে-ই পিস্তলটা ফেলে গেছে এখানে?'

'তাও জানি না।'

'কেন ফেলবে?'

'সেটা জানলে তো অনেক প্রশ্নের জবাবই পেয়ে যেতাম।'

'দারুণ! একটা জটিল রহস্যের সূত্র খুঁজে বের করে দিলাম, দেখা যাক আরও পারি কিনা।' ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে আবার কাজে লেগে গেল মুসা।

খুঁজতে খুঁজতে গুহা থেকে বেরিয়ে সৈকতে চলে এল। বালিতে ঢাকা জায়গাটা সরে গেছে বিশাল কালো একটা পাথরের টিলার দিকে। সেটা ঘুরে আসতেই পাহাড়ের গায়ে একটা ফোকর দেখা গেল।

'আরেকটা গুহা!' ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর।

ডিটেক্টর হাতে হাসিমুখে ওটার দিকে এগোল মুসা। এক গুহার মুখে পেয়েছে পিস্তল, আরেকটার মুখেও যদি কিছু পাওয়া যায়, এই আশায়।

গেল পাওয়া, সত্যিই! তবে ওটা পেতে ডিটেক্টর লাগল না, খালি চোখেই দেখা গেল গুহামুখের ঠিক ভেতরে একটা কাঠের তক্তা পুঁতে তাতে কাগজে কি যেন লিখে আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে। নিচের দিকের আঠা ছুটে গিয়ে বাতাসে ফড়ফড় করছে কাগজটা। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে টেনে সোজা করে পড়ল রবিন। কালো কালি দিয়ে বড় বড় করে লেখা হয়েছে:

প্রবেশ নিষেধ।
বিনা অনুমতিতে ঢুকলে সেটাকে
বেআইনী বলে গণ্য করা হবে।

লেখাটা তিনজনকেই অবাক করল।

মুসা বলল, 'শিপরিজের পুলিশ চীফ হয়তো লাগিয়ে দিয়ে গেছে।'

'পুলিশের কি ঠেকা পড়েছে?' রবিন বলল। 'মজা করেছে কেউ। ট্যুরিস্ট হতে পারে।'

ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। ঢুকবে কি ঢুকবে না ঠিক করতে পারছে না

যেন। শেষে 'বেআইনী বলে গণ্য' হওয়ার প্রতিই ঝোঁক বেড়ে গেল তার। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'রসিকতা নয়, সত্যি এখানে লোক বাস করে!'

অনুমতি নেয়ার জন্যে কাউকে দেখা গেল না। কৌতূহল না ঠেকাতে পেরে শেষে 'বেআইনী' কাজ করে বসল তিনজনেই। ঢুকে পড়ল ভেতরে। গুহায় আলো তেমন নেই, গুহামুখ দিয়ে সামান্য যা ঢুকছে। আনাড়ি হাতে তৈরি একটা কাঠের টেবিল পড়ে আছে এককোণে। মাটিতে বিছানো একটা মলিন গদি, তার ওপর কম্বল পাতা। সাবানের বাক্সের কাঠ দিয়ে তৈরি একটা আলমারি রাখা হয়েছে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর। তাতে ভরা টিনের খাবার।

'যাক বাবা, বাঁচা গেল,' খুশি হয়ে বলল মুসা, 'আমাদের একজন পড়শী আছে, তার কাছে খাবারও আছে। খালি পেটে পাহাড় পেরোতে হলো না আর।'

'আস্তে!' সাবধান করল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'ওই যে, আসছে আমাদের পড়শী।'

সৈকত ধরে হাঁটতে দেখা গেল একজন লম্বা মানুষকে। ধূসর চুল। গায়ে নীল শার্ট, পরনের ওভারঅলের পা দুটো ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে উঁচু গোড়ালিওয়ালা রবারের বুটের ভেতরে। বাঁ হাতে একটা বিউগল। সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। বিউগল ঠোঁটে লাগিয়ে ফুঁ দিল জোরে। একবার বাজিয়ে বিউগল নামিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল, তারপর ঘুরে এগিয়ে আসতে শুরু করল গুহার দিকে।

গুহামুখে বেরিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল সে। নিজের অজান্তেই যেন বিউগল বাজাল আরেকবার। আবার পা বাড়াল।

'আমি কমান্ডার জিন মরিস, কুইন্স নেভি, অবসরপ্রাপ্ত,' ছেলেদের কাছে এসে ঘোষণা করল সে। 'আমাকে তোমাদের স্যালুট করা উচিত ছিল। বুঝতে পারছি, নেভির নিয়ম-কানুন কিছুই জানো না তোমরা। স্যালুট করতে জানো?'

নিখুঁত ভাবে স্যালুট করল তিন গোয়েন্দা।

খুশি হলো লোকটা, জিজ্ঞেস করল, 'বাহ্, জানো তো দেখি। কিন্তু নাবিক বলে তো মনে হচ্ছে না।'

হেসে জবাব দিল কিশোর, 'নাবিকরাই কি শুধু স্যালুট দেয়?'

'তাও বটে। তা ছাড়া সবাইকেই নাবিক হতে হবে, এমনও কোন কথা নেই।'

'এই গুহাতে আপনিই বাস করেন নাকি?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ, ডাঙায় আপাতত এটাই আমার ঘর। তোমাদেরকে তো চিনলাম না?'

পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা।

হাত মেলানোর পালা শেষ করে কমান্ডার বলল, 'সচরাচর এখানে কেউ

আসে না। আর না এলেই ভাল। আমি একা থাকতেই ভালবাসি। লোকের কোলাহল আমার ভাল লাগে না।'

'জায়গাটা একেবারেই নিরিবিলি,' কিশোর বলল।

'আছে, তবে অতটা না। যাতায়াতের অসুবিধে খুব বেশি নেই তো, পাহাড়টা পেরোলেই হলো, মাঝেসাঝে চলে আসে লোকে। গুহা দেখতে আসে ট্যুরিস্ট, জেলেরা নামে বিশ্রাম নিতে। আমার জন্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা ছিল দক্ষিণ সাগরের সেই দ্বীপটা, যেখানে নির্বাসিত হয়েছিলাম আমি।'

মানুষটার ব্যাপারে নতুন করে কৌতূহল দেখা দিল তিন গোয়েন্দার।

'খাইছে!' মুসা বলে উঠল। 'নির্বাসিত হয়েছিলেন?'

'কোন অপরাধে? কে দিল নির্বাসন?' প্রশ্ন করল রবিন।

'কেউ দেয়নি। নিজে নিজেই হয়ে গেলাম। বেশ কয়েক বছর আগে একটা ডেস্ট্রয়ারে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। দক্ষিণ সাগর দিয়ে চলছিল জাহাজ। খাওয়ার পানি নেয়ার জন্যে একটা ছোট দ্বীপে নোঙর করলাম। ম্যাপে নেই ওই দ্বীপ, নাম খুঁজে পাবে না। গরমও পড়েছিল সেদিন, সাংঘাতিক গরম। ছায়ার মধ্যেও একশো ডিগ্রির বেশি। আমার লোকেরা যখন পানি তুলছে জাহাজে, আমি বসলাম একটা ক্যাকটাসের ছায়ায় জিরাতে। কখন ঘুমিয়ে গেলাম বলতে পারব না।'

'আপনাকে ওখানে ফেলেই চলে গেল নাবিকেরা?' আন্দাজ করল রবিন।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কমান্ডারের খোঁজ করল না একবারও?'

'ওরা জানতই না আমি নিচে নেমেছি। গাছের গোড়ায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছি এটা কল্পনাই করতে পারেনি কেউ। ঘুম ভাঙলে দেখলাম, জাহাজটা চলে গেছে, সিন্দবাদ নাবিকের মত আমি একা পড়ে আছি ওই দ্বীপে।'

'দারুণ ব্যাপার তো! তারপর?' জানতে চাইল মুসা। 'বাঁচলেন কি করে?'

'কি করব বুঝতে পারলাম না প্রথমে। প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটার পর মনে হলো, ফেলে গেছে, ভালই হয়েছে। রবিনসন ক্রুসো হয়ে কাটাব। একটা কুঁড়ে বানিয়ে ছয়টা মাস একা কাটিয়েছি ওই দ্বীপে। একেবারে একা, শুধু আমি।'

'আপনাকে নিতে ফিরে যায়নি জাহাজটা?'

'যায়নি। পরে জেনেছি দ্বীপটা নাকি খুঁজে পায়নি ওরা। তবে আমার বিশ্বাস, মিথ্যে কথা বলেছে। যায়ইনি ওরা। জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার, যে আমার জায়গাটা দখল করেছিল সে আর খুঁজে বের করতে যায়নি। তাহলে আবার তাকে কমান্ডারের পদটা হারাতে হত।'

'দ্বীপে থাকতে খেয়েছেন কি?'

'খাওয়ার অভাব ছিল না। শুঁয়াপোকা থেকে শুরু করে পাখি আর কচ্ছপের ডিম, যা পেয়েছি সব খেয়েছি। আদিবাসীরা যদি এ সব খেয়ে তাগড়া

জোয়ান হয়ে বেঁচে থাকতে পারে, আমি পারব না কেন?'

তা বটে। অথৈ সাগর অভিযানে বেরিয়ে দক্ষিণ সাগরের দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এ সব আজেবাজে জিনিস খাওয়ার অভিজ্ঞতা তিন গোয়েন্দারও আছে। অবাক হলো না ওরা।

তবে খাবারের কথা উঠে পড়ায় সুযোগটা ছাড়ল না মুসা, বলে বসল, 'আমাদের খাবার ফুরিয়ে গেছে। আপনার কাছে কি কিছু ধার পাওয়া যাবে?'

চুপচাপ উঠে চলে গেল কমান্ডার। ফিরে এল একটা পাঁউরুটি আর একটিন মাছ নিয়ে। মুসার হাতে দিতে দিতে বলল, 'চলবে এতে?'

'চলবে মানে! কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম! অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

আরও দু'চারটা টুকটাক কথাবার্তার পর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের গুহার দিকে রওনা হলো গোয়েন্দারা। সকালে নাস্তাটা তেমন জমেনি, খিদে পেয়ে গেছে। টিন থেকে মাংস বের করে রান্না করতে বসে গেল মুসা।

খাওয়ার পর বলল সে, 'এখন নিশ্চিন্তে রওনা হওয়া যায়।'

'কোথায়?' আনমনা হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোথায় আবার, খাবার আনতে। একবেলা খেয়েই কি শেষ হয়ে গেল নাকি? খানিক পরেই তো আবার খিদে লাগবে।'

ওর দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন দু'তিনবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এখনই যাব?' অন্যমনস্ক হয়ে আছে ওর ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল।

'এখনই তো যাওয়া উচিত। দেরি করলে রোদ চড়বে, খিদে লাগবে...'

'আচ্ছা লোকটাকে তোমাদের কেমন লাগল?'

'জিন মরিসের কথা বলছ?' রবিন বলল, 'মোটেও ইংরেজ মনে হয়নি আমার। ব্রিটিশ নেভিতে চাকরি করার কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমিও না,' কিশোর বলল। 'চিন্তাটা সেজন্যেই হচ্ছে...'

'আচ্ছা, আমাদের খাবার এই লোকই চুরি করেনি তো?'

'কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। ভাল করে দেখেছি। তার খাবারের ভাঁড়ারে আমাদের টিনগুলো নেই।'

'লোকটাকে অবশ্য এতটা খারাপ মনে হয়নি আমার।'

'তবু কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারলে ভাল হত। বলা তো যায় না কার মনে কি আছে।'

'চলো তাহলে, যাই আবার।'

'এখনই?'

'গেলে এখনই। দেরি করলে আমাদের রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে।'

'বেশ। চলো।'

আবার কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চলল ওরা। গুহার ভেতরে আগুনের ধারে বসে আছে সে। পাশে পড়ে আছে একটা ফ্রাইং প্যান। এইমাত্র খাওয়া শেষ করেছে বোঝা গেল।

শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল কমান্ডার। ভোঁতা গলায় ধমকে উঠল, 'কে

তোমরা?'

'আমরা!' অবাক হয়ে বলল কিশোর, 'আরে আমরা, চিনতে পারছেন না? তিন গোয়েন্দা, একটু আগেই তো দেখা হলো...'

'যাও, ভাগো এখান থেকে! এখানে ঘুরঘুর করা আমার পছন্দ না!'

এগারো

কমান্ডারের এহেন আচরণে চমকে গেল তিন গোয়েন্দা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'কিন্তু, স্যার,' বলল রবিন, 'এই খানিক আগে আপনিই...'

'স্যার স্যার করতে হবে না আর!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কমান্ডার। মুঠো নাচাল ছেলেদের দিকে। 'যাও এখন। বেরোও। আমাকে একা থাকতে দাও।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল কিশোর, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, বোঝানো যাবে না কমান্ডারকে।

ফিরে চলল তিনজনে।

গুহার কাছ থেকে সরে এসে মুসা বলল, 'ও ব্যাটা পাগল! বদ্ধ উন্মাদ! একা থাকতে থাকতে মাথাটা পুরোপুরিই গেছে!'

'হুঁ!' কিশোর বলল, 'যতই দেখছি লোকটাকে, ততই অবাক হচ্ছি। সন্দেহ বাড়ছে আমার।'

'কোন ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তা জানি না। তবে মন বলছে, রহস্য একটা অবশ্যই আছে এখানে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের আসল রহস্যের তো কিনারা হলো না। একটা করতে এসে আরেকটাতে জড়িয়ে পড়ছি। হ্যারিস গেনারের খোঁজ নেয়ার দরকার না?'

'কার কাছে নেব?'

'তার আমি কি জানি?' হাত ওল্টাল রবিন।

'একটা ব্যাপার কিন্তু হতে পারে, হয়তো শিপরিজে এ সব গুহাতে খোঁজ নেবার কথাই বলেছে গেনার। গুহাগুলোতে যে রহস্য আছে, তার প্রমাণ তো ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি আমরা।' একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল কিশোর, 'ঠিক আছে, চলো আগের কাজ আগে সারি, তারপর অন্য কথা। প্রথমে রিক ডেলভারের কাছে যাব খাবার চাইতে। তার কাছে না পেলে শিপরিজে দোকানে যেতে হবে।'

'মনে কোরো তো এবার, বড়শিটা নিয়ে আসব এবার,' মুসা বলল। 'ঝড়-বৃষ্টির পর মাছে খায় ভাল। মাছ পেলে খাবারের সমস্যা অনেকটা মিটবে।'

'কেন, আসার সময় বড়শি তো নিলে দেখলাম?' রবিনের প্রশ্ন। 'কোথায়

ফেললে?'

'আমারও মনে হচ্ছে এনেছি, কিন্তু সকালবেলা খুঁজতে গিয়ে দেখি নেই। হয় খাবার চোরই ওগুলো গাপ করে দিয়েছে, নয়তো ভুলে আনিইনি। গাড়িতে ফেলে এসেছি। ঠিক মনে করতে পারছি না।' গুহার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আমাদের জিনিসপত্রগুলো কি করব? এখানে ফেলে গেলে না ওগুলোও চুরি হয়ে যায়।'

'মনে হয় না,' কিশোর বলল, 'তাহলে রাতেই চেষ্টা করত। কেবল খাবারের ওপরই নজর ছিল চোরের।'

'ঠিক আছে, সব জিনিস ফেলে গেলেও ডিটেক্টরটা ফেলে যাচ্ছি না। যাওয়ার সময় খুঁজতে খুঁজতে যাব, খোঁজাও হবে, সময়ও কাটবে।'

'কি খুঁজবে তুমি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি করে বলব? মাটির নিচে, পাহাড়ের খাঁজে কত জিনিসই থাকতে পারে। জলদস্যুর গুপ্তধনও থাকতে পারে। এই যে খানিক আগে একটা নতুন পিস্তল পেয়ে গেলাম, এটা কি কম কথা?'

পিস্তলের কথায় মনে পড়ল কিশোরের, 'ওহ্‌হো, কোথায় ওটা?'

'লুকিয়ে রেখেছি,' মুসা জানাল। 'কেন, দরকার?'

'না। লুকানো আছে, থাক। বলা যায় না, ওটা একটা জরুরী সূত্র হতে পারে।'

রওনা হলো ওরা। ডিটেক্টরটাকে লাঠির মত করে সামনে বাড়িয়ে ধরে হাঁটছে মুসা। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই বিকট চিৎকার করে উঠল।

আগে আগে হাঁটছিল রবিন আর কিশোর। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল।

পাহাড়ের দেয়ালের কাছে উন্মাদ-নৃত্য জুড়েছে মুসা। কড়কড় কড়কড় করছে ওর যন্ত্র। যেন পাল্লা দিয়ে চিৎকার করছে মনিবের সঙ্গে।

চিৎকার করে বলল সে, 'এখানে একটা-দুটো পিস্তল নয়, পুরো এক অস্ত্রাগার রয়েছে। যন্ত্রটা কি ভাবে চিৎকার করছে দেখো!'

'যন্ত্রের চেয়ে তো বেশি চেঁচাচ্ছ তুমি,' কিশোর বলল। 'চুপ করো না। দেখোই না আগে কি আছে।'

পাহাড়ের গোড়ায় একটা পাথরের কাছে যন্ত্রটা নিয়ে গেলেই শব্দ করছে। পাথরটা সরানোর জন্যে হাত বাড়াল কিশোর আর রবিন। যন্ত্র ধরে রেখেছে মুসা, ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে লুকানো হাড়ের সন্ধান পেয়েছে ক্ষুধার্ত কুকুর।

পাথরটা সরাতেই দেখা গেল একটা গর্ত। ভেতরে একটা বস্তা। তার ভেতর থেকে বেরোল ওদের খাবারের টিনগুলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

'এই তো আমার বড়শি!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে ঠিকই এনেছিলাম, ভুলিনি, খাবারের সঙ্গে এগুলোও চুরি করেছিল ব্যাটা।'

'জিনিসগুলো তাহলে বের করেই ছাড়লে,' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

যন্ত্রটার গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে মুসা বলল, 'পয়সা উসুল। এত উপকার করবে এটা কল্পনাও করিনি। বাঁচালি তুই, ডিটেক্টর। উফ্, পাহাড় ডিঙানোর কথা ভাবতেই হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছিল আমার পেটের মধ্যে।'

খাবার দেখেই খিদে মাথা চাড়া দিল ওর। গুহায় ঢুকে আগুন জ্বেলে, ফ্রাইং প্যান বের করে রাঁধতে বসে গেল। মাংস ভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

রবিন আর কিশোর আলোচনা করছে বস্তাটা গর্তে কে রাখল, সেটা নিয়ে। কমান্ডারের প্রসঙ্গ উঠল।

'তাকে প্রশ্নগুলো করা হলো না,' কিশোর বলল, 'দাঁড়াতেই দিল না আমাদের।'

'দেবে কি? পাগল তো। মুসার কথাই ঠিক—ওর মাথায় বড় রকমের গোলমাল আছে, তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই।'

'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে,' রহস্যময় স্বরে বলল কিশোর। 'যাই হোক, প্রশ্নগুলো ওকে করতেই হবে, যেভাবেই হোক।'

মাংস ভাজা সেরে ডিম ভাজছে মুসা।

সেদিকে একবার তাকিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'কি প্রশ্ন করবে? মেরিন ডিগকে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে কিনা?'

'খাবার রেডি,' ঘোষণা করল মুসা। 'দেরি করলে ভাগে কম পাবে।'

তাড়াতাড়ি যার যার প্লেট মেলে দিল কিশোর আর রবিন। খাবার তুলে দিল মুসা।

এক চামচ ডিম মুখে ফেলে আগের প্রশ্নটাই করল কিশোরকে রবিন, 'কই, বললে না কি প্রশ্ন করবে?'

কিন্তু জবাব দিল না কিশোর। অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

মুসা বলল, 'ডিগ আর কমান্ডারকে নিয়ে যত খুশি গবেষণা করো তোমরা, খাওয়ার পর আমি আর এ সবে নেই। আমি যাব মাছ ধরতে। খাবার চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে শাস্তি দেয়ার সুযোগ আর দেব না চোরটাকে।'

'কোথায় ধরবে?' জানতে চাইল রবিন।

'ঢালের নিচে চলে যাব। অনেক লম্বা সুতো, ঢালের ওপরে বসলেও বেড় পাওয়া যাবে।'

আবার চোরের আলোচনায় ফিরে এল রবিন। 'নিজে খাওয়ার জন্যে নিয়ে যায়নি, বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে চুরি করল কেন?'

'আমাদের এখান থেকে তাড়ানোর জন্যে; সহজ জবাব,' কিশোর বলল। 'সে চায় না আমরা এখানে থাকি।'

'কমান্ডারকে সন্দেহ হয় তোমার?' মুসার প্রশ্ন।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে জবাব দিল কিশোর, 'ওই লোক হতে পারে, কিংবা অন্য কেউ। একজন হতে পারে, কিংবা একাধিক।'

'এটা তো কোন জবাব হলো না।'

'ঠিক। জবাবটা জানলে তো দেব।'

'যাই হোক,' রবিন বলল, 'দ্বিতীয়বার আর চুরি করতে দিচ্ছি না ওকে। খাদের পাশে পাহাড়ের গায়ে একটা খাঁজ দেখে এসেছি। ওর মধ্যে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখব। হাজার খুঁজলেও আর পাবে না ব্যাটা।'

খাওয়া শেষ করে আগুন নেভাল ওরা। বেরিয়ে পড়ল। ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে চলল মুসা। কিশোর আর রবিন খাবারের টিনগুলো নিয়ে চলল খাদের ধারে পাহাড়ের খাঁজে লুকাতে।

লুকানো সেরে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কমান্ডারের ওখানে যাবে নাকি আবার?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'যাব।'

'যদি মারতে আসে?'

'পালিয়ে আসব। তবে প্রশ্নগুলো না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।'

কমান্ডারের গুহায় রওনা হলো দুজনে।

দূর থেকেই দেখল, গুহার সামনে কি যেন করছে বুড়ো নাবিক। কাছে গিয়ে দেখল, একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে কিছু আঁকছে সে। ওদের সাড়া পেয়ে জুতো দিয়ে ডলে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল। হাঁক দিল, 'এই যে ছেলেরা, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। আরেকবার অবাক করেছে ওদের কমান্ডার।

কিশোর জবাব দিল, 'হ্যাঁ। আমাদের চিনতে পেরেছেন?'

'পারব না কেন, নিশ্চয় পেরেছি।'

'কই, তখন তো পারলেন না?'

'পারিনি নাকি? কি জানি!' মাথা চুলকাল কমান্ডার, 'মাঝে মাঝে মাথাটার মধ্যে কি যে হয়ে যায়...যাকগে, তোমাদের আরেক বন্ধু কোথায়?'

'মাছ ধরতে গেছে। পাহাড়ের ঢালের নিচে।'

'ও। ওদিকটায় যাওয়া ঠিক হয়নি। জায়গা ভাল না।'

কেন ভাল না, জিজ্ঞেস করল রবিন। জবাব পেল না।

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে, পিঠের ওপর দুহাত নিয়ে গিয়ে, একহাত দিয়ে আরেক হাতকে আঁকড়ে ধরে গুহামুখের সামনে পায়চারি শুরু করল কমান্ডার।

'কমান্ডার মরিস,' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার গুহার সামনে কোন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন?'

যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল কমান্ডার। চোখ সরু করে তাকাল কিশোরের দিকে। 'দেখো, আমি একজন সন্ন্যাসী, জায়গাটা অতিরিক্ত নির্জন দেখে একা বাস করতে এসেছি এখানে। আমার কাছাকাছি কেউ আসে না। ওরা ভাবে আমি পাগল।'

গেনার আর ডিগের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এ রকম কাউকে দেখেছেন?'

'বললাম না কেউ আসে না!'

'তবু, একটু ভাল করে ভেবে যদি বলেন···চোখে হয়তো পড়েছিল, ভুলে গেছেন···'

'না, ভুলিনি···দাঁড়াও, দাঁড়াও···' ভাবতে গিয়ে কপাল কুঁচকে ফেলল কমান্ডার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। ভাবছে, গেনারকে কি দেখেছে সত্যি?

'কাকে দেখেছেন?' জানতে চাইল কিশোর। 'যে দুজনের কথা বললাম, তাদের কোনজন?'

'প্রথমজন।'

'গেনার?'

'হ্যাঁ, একবার ওরকম চেহারার একজনকে দেখেছিলাম বটে। ফিলিপাইনে আমার ক্রুজারের মেট হয়েছিল।'

হতাশায় মুখ বাঁকাল রবিন। এই পাগলের কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করার চেষ্টা বৃথা।

কমান্ডার বলতে থাকল, 'ওর নাম মনে পড়েছে আমার, গেনারই ছিল। আমাকে জাহাজ ছাড়তে বাধ্য করেছিল সে। জংলীরা এসে ঢাক বাজানো শুরু করল। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শেষে আনারস গাছে চড়ে বাঁচলাম।'

কিশোরের কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন, 'আবার গেছে ওর মাথাটা। আর কথা বলে লাভ নেই।'

বকবক করেই চলেছে কমান্ডার। কোন দিকে খেয়াল নেই।

পাগলকে প্রশ্ন করে কি হবে!। কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, কমান্ডার, আমরা এখন যাই।'

ওর কথার জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল কমান্ডার, 'সাঁতার কাটতে যেতে হবে আমাকে। প্রচণ্ড গরম। আফ্রিকার কাছাকাছি এলেই এ রকম গরম লাগে।' কারও দিকে তাকাল না সে। আর একটাও কথা না বলে ঘুরে গিয়ে ঢুকল তার গুহায়।

সৈকতে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। গুহামুখের কাছ থেকে সরে এসে রবিনের হাত ধরে একটা বড় পাথরের আড়ালে তাকে টেনে নিয়ে এল কিশোর।

অবাক হলো রবিন। 'কি ব্যাপার?'

'দাঁড়াও, ও কি আসলেই পাগল, না আমাদের দেখলে ভান করে, সেটা বুঝতে চাই।' পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিল কিশোর।

'কি দেখছ?'

'ও বেরোয় কিনা।'

'বেরোলে কি করবে?'

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে গুহার দিকে।

কয়েক মিনিট পরই গুহা থেকে বেরিয়ে এল কমান্ডার। পরনে শুধু হাফপ্যান্ট। এদিক ওদিক তাকাল। তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল।

ভাবভঙ্গিতে এখনও বোঝা যাচ্ছে না পাগল না ভালমানুষ।

রবিনকে নিয়ে পাথরের আড়ালে আরেকটু সরে গেল কিশোর।

পাশ দিয়ে চলে গেল কমাণ্ডার। দেখতে পেল না ওদের।

ফিসফিস করে রবিন বলল, 'যাচ্ছে কোথায়, বলো তো? সত্যি সাঁতার কাটবে নাকি?'

'যাক যেখানে খুশি। এসো। এত তাড়াতাড়ি সুযোগ দেবে কল্পনাই করিনি।'

'কিসের সুযোগ।'

'ওর গুহায় ঢোকার। চলো, জলদি!'

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে একছুটে কমান্ডারের গুহার কাছে চলে এল ওরা। ঢুকে গেল ভেতরে।

'বাপরে! গভীর কত!' রবিন বলল। 'পেছনের কিছুই দেখা যায় না।'

কিশোর খুঁজছে একদিকে, রবিন আরেক দিকে। পাথরের একটা তাকের কাছে চলে এল সে। চিৎকার করে বলল, 'দেখে যাও!'

রবিনের পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। একনজর তাকিয়েই বলে উঠল, 'বাহ্, বন্দুকও আছে! রহস্যময় গুলির শব্দের রহস্য ভেদ হলো।' এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তাকের কাছে। শটগানটার কাছে পড়ে আছে পুরানো একটা নোটবুক আর একটা ক্যাপ। ক্যাপটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবল সে। আগের জায়গায় রেখে দিয়ে নোটবুকটা তুলে নিল।

'কোডবুক!' পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল সে। 'দূর, আলো এত কম, কিচ্ছু দেখি না। বাইরে চলো।'

কি লেখা আছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেল রবিনও।

গুহামুখের দিকে রওনা দিল দুজনে।

কিন্তু বেরোনোর আগেই মুখ জুড়ে দাঁড়াল কমান্ডার। আলো আসার একমাত্র পথটা আটকে দিয়ে আরও অন্ধকার করে দিল গুহা। ওদের দেখে চিৎকার করে উঠল, 'চোর! চোর কোথাকার! চুরি করতে ঢুকেছ আমার গুহায়!' নোটবুকের জন্যে হাত বাড়াল, 'দাও ওটা!'

দিল না কিশোর। চট করে সরে গেল ভেতরে।

ওকে ধরার চেষ্টা করল না কমান্ডার। দৌড় দিল তাকের দিকে।

'সাবধান, কিশোর,' চেঁচিয়ে বলল রবিন, 'বন্দুক আনতে যাচ্ছে ও!'

বারো

গুহামুখের দিকে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে রবিন।

ওরা বেরোনোর আগেই তাকের কাছে পৌঁছে গেল কমাণ্ডার। বন্দুক তুলে হুমকি দিল, 'খবরদার, এক পা নড়লেই গুলি খাবে!'

হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে

পড়ল রবিন।

ফিরে তাকাল দুজন।

ওদের দিকে বন্দুক তাক করে রেখে এগিয়ে এল কমান্ডার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তাহলে এই নোটবই চুরি করার জন্যেই আমার গুহায় ঢুকেছিলে। আস্তে করে মাটিতে রেখে দাও ওটা। চালাকি করতে গেলে মরবে।'

চালাকি করতে গেল না কিশোর। পাগলের হাতে শটগান—ভয়ানক ব্যাপার, কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাইল না সে। যা করতে বলা হলো, করল।

রবিন বলল, 'নোটবই চুরি করতে না, এমনি ঢুকেছিলাম। স্রেফ কৌতূহল।'

আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর, 'ক্যাপটা কার, কমাণ্ডার?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল কমান্ডার। 'মানে?'

'মানে, ওটা কার জিজ্ঞেস করছি। আপনার বলে তো মনে হয় না। নাবিকেরা এ জিনিস পরে না।'

'তাহলে কে পরে?'

'আর কেউ আছে নাকি এখানে?'

'থাকলে সে এখন কোথায় গেল?' ধমকে উঠল কমাণ্ডার।

'সেটা তো আপনি বলবেন।'

'আমি কিছুই বলতে পারব না, কারণ আমি কিছু জানি না।'

'এই ক্যাপটা কোথায় পেলেন?'

একমুহূর্ত চিন্তা করে নিল কমাণ্ডার। জবাব দেবে কিনা ভাবল বোধহয়। বলল,'শিপরিজে হ্যারির দোকান থেকে কিনেছি। কুইন্স নেভি রসদ পাঠাতে ভুলে গিয়েছিল। শেষে দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে আনতে বাধ্য হলাম।'

ওর কথার একবর্ণ বিশ্বাস করল না কিশোর। প্রকাশ করল না সেটা। পাগল খেপালে বিপদ। কি করে বসে ঠিকঠিকানা নেই।

আবার গুহায় ঢুকলে ভাল হবে না—শাসিয়ে দিয়ে, ওদের বেরিয়ে যেতে বলল কমান্ডার।

বেরোতে সামান্যতম দেরি করল না দুজনে। নিজেদের গুহার দিকে এগোচ্ছে, এই সময় দেখল মুসাও আসছে। হাতে ছিপ আর কাঁধে বিশাল এক মাছ ঝুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল সে। কাছে এসে বলল,'দেখো কি ধরেছি!'

হেসে বলল রবিন, 'কি এটা, তিমির বাচ্চা?'

'সী ব্যস।'

কি করে মাছটা ধরেছে সেই বীরত্বের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে খেয়াল করল মুসা, তার কথায় বিশেষ মনোযোগ নেই কিশোরের। কি হয়েছে জানতে চাইল সে।

জানাল কিশোর।

মাথা নেড়ে মুসা বলল, 'আজব লোক! এখানে করছে কি আসলে লোকটা?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল।
'ক্যাপটা কার? গেনারের না তো?'
'সে রকমই সন্দেহ করছি।'
'তুমি বলতে চাও, সে এখানেই কোন গুহার মধ্যে আটকে আছে?'
'অসম্ভব কিছু না। তবে যেটা ধারণা করছি সেটা হলো, সে আর ডিগ এসেছিল এখানে। দেখতে পেয়ে গুলি করেছিল মরিস। পালিয়েছিল দুজনে। পালানোর সময় তাড়াহুড়োতে ক্যাপটা খুলে পড়ে যায় গেনারের মাথা থেকে, তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় পায়নি।'
'এটা যে ওরই ক্যাপ, কি করে বুঝলে?'
'গুহায় ফিরে ছবিটা দেখে নিয়ো, ব্যাগের মধ্যে রেখেছি, তাহলেই বুঝবে।'
'হুঁ, নাটক তাহলে জমে উঠেছে,' মাথা দোলাল মুসা। 'জানো, আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে! দেখলে তোমরাও অবাক হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে একটা ধাতুর খনিটনি আবিষ্কার করে বসেছি।'
শুনেই অবাক হয়ে গেল রবিন, 'ধাতুর খনি!'
'সোনার খনিও হয়ে যেতে পারে,' মুসা বলল। 'এমন হতে পারে, খনিটার খোঁজ পেয়েই এখানে এসে হাজির হয়েছে কমান্ডার। সোনা তুলে নিয়ে যেতে চায়। অন্য কাউকে আসতে দেখলে রেগে যায় সেজন্যে। নোটবইটাতে হয়তো খনির নকশা আঁকা আছে।'
ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন।
কি ঘটেছে, খুলে বলল মুসা। মাছটা ধরার পর মেটাল ডিটেক্টরটা ব্যবহারের ইচ্ছে হয়েছিল ওর। মাটির নিচে বিশাল কিছু থাকার সঙ্কেত দিয়েছে যন্ত্র।
কিশোর বলল, 'চলো তো দেখি।'
'আগে খনি দেখবে, না মাছের কাবাব খাবে?'
'খাওয়া-টাওয়া পরে। চলো আগে, তোমার খনি দেখব।'
'এক মিনিট দাঁড়াও। চট করে মাছটা গুহায় রেখে আসি আমি।'
'ডিটেক্টরটা কোথায়?'
'পাহাড়েই ফেলে এসেছি। জানি তো, তোমরা দেখতে যাবে।'
কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাদ পেরিয়ে আবার পাহাড়ের ওপর এসে উঠল তিনজনে। জায়গাটা দেখিয়ে দিল মুসা।
ইয়ারফোন কানে লাগিয়ে যন্ত্রটা মাটির কয়েক ইঞ্চি ওপরে ধরল রবিন। শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। ইয়ারফোনটা কান থেকে খুলে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সাংঘাতিক কাণ্ড! সত্যি কিছু আছে এখানে। কানের মধ্যে মনে হলো মেশিনগানের গুলি ফুটল।'
যন্ত্রটা হাতে নিয়ে কিশোরও পরীক্ষা করে দেখল। ডান থেকে বাঁ দিকে সরে যেতে লাগল। সরতে সরতে কয়েক গজ চলে গেল, তাও শব্দ বন্ধ হয় না। কান থেকে ইয়ারফোন খুলে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল,

'আশ্চর্য! ঘটনাটা কি? কি আছে এখানে? মাটির তলা দিয়ে সোজাসুজি চলে গেছে লম্বা কোন জিনিস।'

'পাইপ-টাইপ না তো?' রবিন বলল।

'কিসের পাইপ?' মুসা বলল। 'এমন একটা জায়গায় পানির পাইপ বসাতে আসবে কে? আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেরও কোন প্রয়োজন নেই এখানে।'

'যাই থাক,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'জিনিসটা গেছে পুব থেকে পশ্চিমে, সাগরের তীর থেকে মহাসড়কের দিকে।'

'দাঁড়াও, কি আছে ওদিকে রাস্তার ধারে, দেখছি,' রবিন বলল।

কয়েকটা পাইন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জন্মে আছে একজায়গায়। তারই একটাতে চড়ল সে। পশ্চিমে তাকাল।

'কি আছে?' নিচে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'একটা বাড়ি। ডিশ দেখে মনে হচ্ছে রাডার স্টেশন।'

'আর কিছু না?'

'আর কিছু না।'

নেমে এল রবিন।

'খুঁড়ে দেখলে হত নিচে কি আছে,' মুসা বলল।

'তার জন্যে শাবল-কোদাল দরকার। কোথায় পাবে?' রবিন বলল।

'সেটা অত সমস্যা নয়। রিক ডেলভারের কাছে গেলেই পাওয়া যাবে।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো, গিয়ে নিয়ে আসি। মুসা ততক্ষণে মাছটার একটা ব্যবস্থা করে ফেলুক।'

মুসা চলে গেল গুহার দিকে। কিশোর আর রবিন রওনা হলো ডেলভারের কেবিনে।

আসার সময় অচেনা পথ ছিল, তার ওপর ঝড়বৃষ্টি, সেজন্যে বড় বেশি দুর্গম আর অনেক লম্বা মনে হয়েছিল পথ। এখন তার অর্ধেকও লাগল না। অল্প সময়েই চলে এল ডেলভারের কেবিনে।

বুড়োকে পাওয়া গেল না। মাছ ধরতে গেছে। তবে মহিলা আছে বাড়িতে। চমৎকার একটা হাসি উপহার দিয়ে তার কাছ থেকে একটা শাবল আর একটা বেলচা চেয়ে নিল রবিন। আবার রওনা হলো গুহার দিকে।

গুহায় ফিরে দেখল গনগনে আগুনের সামনে বসে আছে মুসা। মাছের কাবাব ঝলসানো হয়ে গেছে প্রায়। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে।

দুই দুইবার পাহাড় ডিঙিয়ে এসে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে কিশোর আর রবিনের। গপ গপ করে খেতে শুরু করল ওরা।

খাওয়ার পর আগুন নিভিয়ে দিয়ে তিনজনে মিলে রওনা হলো জায়গাটা খুঁড়ে দেখতে।

খুঁড়তে খুঁড়তে তিন ফুট খুঁড়ে ফেলেও ধাতব জিনিসটার দেখা মিলল না।

বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রবিন বলল, 'কই, মুসার খনির তো চিহ্নও নেই। কিশোর, ঘটনাটা কি বলো তো? ধাতব জিনিস না থাকলে তো সাড়া দিত না যন্ত্র।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, আমিও 'বুঝতে পারছি না। বিদ্যুতের তার গেছে হয়তো মাটির নিচ দিয়ে। সেসবের পাইপ হতে পারে। কত নিচে আছে কে জানে। অহেতুক কষ্ট না করে শিপরিজে গিয়ে খোঁজ নেয়া দরকার।'

সুতরাং রওনা হলো ওরা।

শাবল আর বেলচা ফেরত দিতে প্রথমে ডেলভারের বাড়িতে এল। এবার পাওয়া গেল ওকে। হাসিমুখে বেরিয়ে এসে স্বাগত জানাল ছেলেদের, 'ভূতের গুহা থেকে তাহলে ভালয় ভালয়ই ফিরলে।'

'হ্যাঁ,' হেসে জবাব দিল কিশোর, 'দেখতেই পাচ্ছেন।'

'এগুলো নিয়েছিলে কেন?' হাত তুলে শাবল আর বেলচা দেখাল বুড়ো। 'বাড়ি ফিরে বেগম সাহেবের কাছে শুনলাম তোমরা এসেছিলে।'

'মুসার একটা মেটাল ডিটেক্টর আছে। পাহাড়ের ওপর খুঁজতে গিয়ে ওর মনে হয়েছে মাটির নিচে সোনার খনি আছে। তাই খুঁড়ে দেখলাম আরকি।'

বুড়োর চোখে অবিশ্বাস। 'এই এলাকায় সোনার খনি? অসম্ভব! থাকলে কবে বেরিয়ে যেত।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল কিশোর। 'মনে হয় মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতের তারটার গেছে, সেগুলোর পাইপ…'

'হুঁ, তাই হবে। এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'হ্যারির দোকানে। কয়েকটা জিনিস দরকার।'

'জিনিস দরকার মানে? আবার গুহায় যাবে নাকি?'

'বলতে পারি না। তবে গেলেও আর বোধহয় ভয়ের কিছু নেই। রাতে তো থাকলাম, গুহাতেই, ভূতে তো কিছু করল না।'

বুড়োকে গুডবাই জানিয়ে গাড়িতে চড়ল ওরা। রওনা হলো হ্যারির স্টোরে।

দোকানেই আছে হ্যারি। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে এল, 'কি, বলেছিলাম না? নিশ্চয় বিপদে পড়েছিলে গুহায় ঢুকে।'

'কে বলল বিপদে পড়েছি,' হাত নেড়ে বলল কিশোর।

'বেশ, বিপদে হয়তো পড়োনি। কিন্তু কিছুই ঘটেনি এ কথা আমাকে অন্তত বিশ্বাস করাতে পারবে না। তোমাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। উত্তেজিত হয়ে আছ। কিছু একটা তো নিশ্চয় ঘটেছে।'

'মিথ্যে বলব না, ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। তবে ভূতুড়ে কিছু নয়,' হ্যারির টেলিফোনটা দরকার, তাই তার কাছে সব কিছু চেপে গেল না কিশোর। 'আচ্ছা, টাউন ইঞ্জিনিয়ারের অফিসটা কোথায়, বলবেন? কয়েকটা ম্যাপ আর সার্ভে রিপোর্ট দেখতে চাই।'

'ম্যাপ?' ভুরু কোঁচকাল হ্যারি। 'ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

মুসার সোনার খনি আবিষ্কারের সম্ভাবনার কথা জানাল কিশোর।

ডেলভারের মতই অবিশ্বাসের হাসি হাসল হ্যারি। বলল, 'দেখো, ভাগ্য খোলে নাকি। তবে ম্যাপ দেখার জন্যে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে যাওয়া লাগবে না। আমি শিপরিজের মেয়র। এখানেই আর্কাইভ আছে,' ডান হাতের বুড়ো

আঙুল দিয়ে দোকানের পেছনের একটা দরজা দেখাল সে।

'ওখানে?' অবাক হলো রবিন।

'ওটা মেয়র আর টাউন ইঞ্জিনিয়ারের অফিস।'

হ্যারির পেছন পেছন ঘরটায় এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ছিমছাম সাজানো-গোছানো। একটা ডেস্ক, একটা ফাইলিং কেবিনেট আছে। দেয়ালে ঝোলানো একটা বড় ম্যাপ।

ওটার সামনে এসে দাঁড়াল তিনজনে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল রবিন আর কিশোর। মুসা এ সব বোঝে না, ওর ভালও লাগে না।

পাহাড়টা বের করতে দেরি হলো না কিশোরের। মাটির নিচ দিয়ে যাওয়া পানির পাইপ বা বিদ্যুতের পাইপের চিহ্ন নেই ম্যাপে। মাথা নেড়ে সরে এল ওটার কাছ থেকে।

অফিসের বাইরে বেরোতে হ্যারি জিজ্ঞেস করল, 'কই, পেলে তোমাদের সোনার খনি?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'নাহ্।' রসিকতার সুরে বলল, 'আবিষ্কারই করলাম আমরা আজ, ম্যাপে থাকবে কোত্থেকে। তবে এরপর ম্যাপ আঁকলে থাকবে অবশ্যই।'

জবাবে হ্যারিও হাসল। 'হুঁ, তা বটে। আর কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?'

'কিছু জিনিস লাগবে।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'তোমরা নাও ওগুলো, আমি একটা ফোন সেরে নিই।' হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল, 'অসুবিধে নেই তো?'

'না না, অসুবিধে কিসের? করো।'

তেরো

ল্যারি কংকলিনকে ফোন করল কিশোর।

ওকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। মেরিন ডিগের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর। ওপাশের কথা শুনতে শুনতে কপাল কুঁচকে গেল তার।

ব্যাপারটা চোখ এড়াল না রবিনের। কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে এত নিচু স্বরে কথা বলছে কিশোর, কিছুই শুনতে পেল না সে। দোকান থেকে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল কি জেনেছে।

'সাংঘাতিক তথ্য,' বলল কিশোর। 'ভাল ছাত্র ছিল মেরিন ডিগ। ভাল ফ্যামিলির লোক। ওর বিরুদ্ধে কোন খারাপ রিপোর্ট নেই। বেড়াতে ভালবাসে। তিন বছর বেড়িয়ে বহুদিন কাটিয়ে এসেছে বিদেশে।'

কিশোর চুপ করতে রবিন বলল, 'এর মধ্যে সাংঘাতিক তথ্যটা কোথায়?'

'বলিনি এখনও। গত গ্রীষ্মে একটা বিশেষ দেশে বেড়াতে গিয়েছিল সে।'

'কোন দেশ?'

'হ্যারিস গেনার যেখানে পড়তে গিয়েছিল সেখানে।'

'তাতে কি?' বুঝতে পারল না মুসা।

রবিন বলে উঠল, 'আমি বুঝেছি! ওই দেশের কোন প্রতিষ্ঠান ওদের দুজনকে ধরে ব্রেন ওয়াশ করে দিয়েছে, যাতে ওরা ওদের হয়ে কাজ করে।'

'গুপ্তচরগিরি?'

'এ ছাড়া আর কি? কিশোর, ঠিক না?'

'আমি ভাবছি,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'মতের অমিল হয়নি তো দুজনের?'

'মানে?'

'মানে, একজনকে ব্রেন ওয়াশ করেছে—ধরা যাক, ডিগের; গেনারের করতে পারেনি, কিন্তু ব্যাপারটা সে জানে। তাকে দলে আনার চেষ্টা করেছে ডিগ। পারেনি। হয়তো কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া। শেষমেষ গায়েব করে দেয়া হয়েছে গেনারকে। ওর নিরুদ্দেশের এটা একটা জোরাল যুক্তি হতে পারে।'

'হুঁ, তা পারে,' একমত হয়ে মাথা দোলাল রবিন। 'তবে কি লায়ন কাবসদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে ডিগই আমাদের তাড়াতে চেয়েছে যাতে গেনারের ব্যাপারে তদন্ত করতে না পারি?'

'হয়তো। তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি আরেকটা ফোন সেরে আসি।'

'আবার কাকে?'

'আরলিঙটনের পুলিশ চীফকে। তাঁকে অনুরোধ করব ডিগের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করার জন্যে।'

মুসা আর রবিনকে গাড়ির কাছে রেখে আবার গিয়ে দোকানে ঢুকল কিশোর। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল উত্তেজিত হয়ে। খবর জানাল, 'এইবার মেরিন ডিগ গায়েব! তাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'দারুণ! তার সঙ্গে আবার কার মতের মিল হলো না?'

'তাকে না ধরতে পারলে আর সেটা জানা যাবে না।'

'কি করে ধরা যায়?'

'সেটা পুলিশ জানে। তাদের কাজ।'

'তা ঠিক। তো আমাদের কাজ তাহলে এখন কি? আবার গুহায় ফিরে যাওয়া?'

'তা তো বটেই। আর কি করব? আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি। গেনারকে খুঁজে পাইনি আমরা।'

'কিন্তু গুহায় ফিরে লাভ কি? ওখানে তো নেই গেনার। দুটো গুহার একটাতেও লুকিয়ে রাখা হয়নি তাকে, তাহলে কি আর দেখতাম না?'

'কমাণ্ডারের গুহাটার ব্যাপারে সন্দেহ এখনও যায়নি আমার। মন বলছে, সব রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওই গুহায়। ভেতরে ঢুকে ভালমত খুঁজে

দেখতে পারলে কিছু না কিছু পাবই।'

'তোমার কি মনে হয় গেনারের গায়েব হওয়ার পেছনে কমান্ডারের কোন হাত আছে?' প্রশ্ন করল রবিন।

'হাত না থাকলেও যোগাযোগ যে একটা আছেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে গেনার শিপরিজের কথা লিখে রেখে গায়েব হবে কেন? আর গুহার মধ্যে রহস্যময় কাণ্ডকারখানাই বা ঘটবে কেন? দুটোর মধ্যে মিল দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তাহলে ফিরে যেতে বলছ?' জানতে চাইল মুসা।

'হ্যাঁ, যাও।'

গাড়ি স্টার্ট দিল মুসা।

রিক ডেলভারের বাড়ির সামনে পৌঁছে গাড়ি থামাল সে। মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

শব্দ শুনে বেরিয়ে এল ডেলভার। ওরা আবার গুহায় ফিরছে শুনে বাধা দিল।

কিন্তু শুনল না ওরা। জোর দিয়ে বলল কিশোর, গুহার রহস্য ভেদ না করে কিছুতেই নিরস্ত হবে না সে।

আগের বারের মত ডেলভারের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে হেঁটে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

রাত হয়ে গেছে।

সৈকত থেকে আকাশের পটভূমিতে বিশাল দৈত্যের মত লাগছে পাহাড়ের চূড়াটা। এগিয়ে গিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা।

আকাশে কয়েক দিনের চাঁদ, আলো এখনও উজ্জ্বল হয়নি, ঘোলাটে কমলা রঙ। সেই আলোয় পথ দেখে এগোল ওরা।

গিরিখাতটা চোখে পড়ল একসময়। আরও এগিয়ে কালো গুহামুখটা চোখে পড়ল। সেদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠল মুসার। মনে হলো যেন কোন দানবের খুলি থেকে চেয়ে আছে কালো অক্ষিকোটর।

গুহামুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল কিশোর, 'কি করছে এখন আমাদের কমান্ডার মরিস? নিশ্চয় নাক ডাকিয়ে ভয় পাওয়াচ্ছে গুহার ইঁদুরগুলোকে।'

'কিংবা ভূতকে,' আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবিন। 'গুহায় ভূত থাকে। ইঁদুরদের মতই রাত জাগে ওরাও। আর আমার তো ধারণা ওই রকম একটা কমান্ডারকে ভূতেও ভয় করে চলবে।'

কেঁপে উঠল মুসার কণ্ঠ, 'চুপ! চুপ! কি যে বলো আর না বলো, তাও এমন জায়গায় এসে...'

জোরে হেসে উঠল রবিন।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। ঝট করে বসে পড়ল ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল, কমান্ডারের গুহার কাছ থেকে জ্বলেছে আলোটা, তীব্র উজ্জ্বল আলোর রশ্মি গিয়ে পড়েছে সাগরের পানিতে।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'সার্চলাইট!'

বার দুই জ্বলল-নিভল আলোটা, তারপর নিভে গিয়ে আর জ্বলল না।

'আরেকটু হলেই দেখে ফেলত আমাদের,' মুসা বলল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'আর কত চমক জমা আছে কমান্ডারের ভাঁড়ারে? সার্চলাইট! একজন সন্ন্যাসীর কি দরকার এই জিনিস? সন্দেহ আরও জোরাল হচ্ছে আমার।'

'সন্ন্যাসী না ছাই,' ঝাঁজের সঙ্গে বলল রবিন, 'ব্যাটা আস্ত ভণ্ড। পাগলামিটাও তার অভিনয়।'

'আলো জ্বালল কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'কি দেখল?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'যে ভাবে আলোটা নাড়ল, মনে হলো কোন রকম সঙ্কেত দিল।'

'কাকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি। কোন জাহাজ হয়তো নোঙর করেছে এখন তীর থেকে দূরে। ওটাকে সঙ্কেত দিয়েছে।'

'কেন?'

'কারণ তো নিশ্চয় আছে। আরও তথ্য না পেলে সেটা জানা যাবে না। তবে সবার আগে দেখতে হবে, জাহাজ সত্যি আছে কিনা।'

উঠে পড়ল ওরা। চুপচাপ এসে গুহায় ঢুকল।

রান্না করে খেয়ে নিয়ে আলোচনায় বসল। কিভাবে কি করা যায়, তার নানারকম ফন্দি আঁটতে লাগল।

মুসা বলল, 'বাইরে কোথাও লুকিয়ে থেকে সাগরের দিকে নজর রাখলে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'চলো যাই। জাহাজ থেকে বোটটোট পাঠালে দেখতে পারব।'

কিন্তু গুহা থেকে বেরিয়েই ওরা পড়ে গেল কমান্ডারের সামনে। মনে হলো যেন আড়ি পেতে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল লোকটা। ওদেরকে দেখে কেমন থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলাম...'

'কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'এই এমনি...ইয়ে, তোমরা আর কতদিন আছ এখানে...' কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল কমান্ডার।

'আমরা চলে গেলে খুশি হন মনে হয় আপনি?' ফস করে বলে বসল মুসা।

'না না...তা কেন? কয়েকজন পোড় খাওয়া নাবিক পড়শী হলে বরং ভালই লাগে। মনে নেই সেই দ্বীপটার কথা? তোমাদের নিয়ে নামলাম...তারপর...তারপর কি যেন ঘটল?'

'কি আর ঘটবে? মগজে গোলমাল!' বলে দিল মুসা। 'মাথার ছিটে খোঁচা লাগল।'

'মানে?' রেগে উঠল কমান্ডার।

তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'না না, আপনি রাগবেন না। আমরা কাল সকালেই চলে যাচ্ছি।'

চুপ হয়ে গেল কমান্ডার। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোরের মুখের দিকে। যেন তার কথা বুঝতে পারছে না। তারপর আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল নিজের গুহার দিকে।

বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসল তিন গোয়েন্দা।

রাত দুটো পর্যন্ত বসে থেকেও সাগরের দিক থেকে কোন জাহাজ বা বোট আসতে দেখল না। ঘন ঘন হাই তুলছে তিনজনেই। প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে।

মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে রবিন বলল, 'নাহ্, আজ রাতে আর কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।'

'ঘটার আশাও করিনি।'

'তবে শুধু শুধু বসে রইলে কেন?'

'শিওর হয়ে নিলাম, আমার সন্দেহ ঠিক আছে কিনা।'

'কি বুঝলে?'

'ঠিকই আছে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, কিশোর,' মুসা বলল। 'এই ভোররাতে অত হেঁয়ালি ভাল্লাগছে না। যা বলার পরিষ্কার করে বলো।'

'একটা ব্যাপার তো অবশ্যই খেয়াল করেছ,' কিশোর বলল, 'কমান্ডার চায় না আমরা এখানে থাকি। কায়দা করে জানতে এসেছিল, আমরা কখন যাব। বলে দিলাম, কাল যাব। সুতরাং আজ রাতে যেটা ঘটাতে চেয়েছিল, সেটা কাল ঘটাবে সে। আজ আমরা আছি বলে অপেক্ষা করবে। কাল আর থাকব না...'

'না থাকলে দেখব কি করে কি ঘটাচ্ছে?'

'বুড়ো ডেলভারের সাহায্য নিতে হবে।'

'কিভাবে?'

'সেটা কালই দেখো। চলো, এখন আর বকবক না করে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।'

চোদ্দ

পরদিন খুব সকালে ওরা মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাইরে বেরোতেই দেখে কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছে সৈকতে। ওদের দেখে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে চলেই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর, 'একজায়গায় আর কত। দেখারও নেই তেমন কিছু।'

'আমার কিন্তু ভালই লাগে এখানে।'

আমাদেরও লাগা শুরু করেছিল, কিন্তু থাকতে আর দিলেন কই?—বলার ইচ্ছে ছিল মুসার, কিন্তু চেপে গেল। মুখে বলল, 'দূর, এই পাগলের আড্ডায় কে থাকে! তা ছাড়া খাবার নেই, কিছু না, আনতে গেলেও বিরাট ঝামেলা…'

কমান্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গিরিখাতের দিকে এগোল ওরা। পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পেত মুখে মুচকি হাসি নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে কমান্ডার।

পাহাড় পেরিয়ে ডেলভারের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। তখনও মাছ ধরতে বেরোয়নি বুড়ো। ওদের দেখে অবাক হলো। 'কি ব্যাপার? এত সকাল সকাল? চোখমুখের অবস্থা দেখে তো মনে হয় না রাতে ভাল ঘুম হয়েছে। ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে নাকি?'

মুসা জবাব দিল, 'ভূত নাহলেও পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম…'

কনুইয়ের গুঁতো মেরে ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'গুহাটার একটা রহস্য আছে, মিস্টার ডেলভার, ঠিকই বলেছিলেন আপনি। রোখ চেপে গেছে আমার। এর রহস্য ভেদ না করে ছাড়ব না। এ জন্যে আপনার সাহায্য দরকার আমাদের।'

চোখ কপালে উঠল বুড়োর। 'আমার সাহায্য! দেখো বাবা, আর যাই করতে বলো, গুহার কাছে যেতে বোলো না আমাকে,' দুহাত নেড়ে বলল সে, 'আমি সেটা পারব না।'

'না, গুহার কাছে যেতে বলব না আপনাকে,' আশ্বস্ত করল কিশোর। 'মাছ ধরতে বেরোবেন না আজ?'

'বেরোব। নাস্তাটা সেরেই। তোমরা খেয়েছ?'

'না।'

'তাহলে এসো, বসে যাও আমার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ। বসব। আপনার সঙ্গে মাছ ধরতে বেরোব আজ আমরাও। আপত্তি আছে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো। তারপর মাথা নাড়ল, 'না, আপত্তি নেই। আরও অনেক কথা আছে তোমার পেটে, বুঝতে পারছি। এসো, খেতে খেতে ঢেলে দাও।'

অতি পুরানো একটা মোটর বোট। ইঞ্জিনটাও আদিম। তবু ওটারই গায়ে আদর করে হাত বোলাল বুড়ো ডেলভার। গর্ব করে বলল, 'এটা আমার তিরিশ বছরের সঙ্গী। একসঙ্গে সাগরে বেরিয়েছি আমরা, কত মাছ ধরেছি!'

'ডোবাবে না তো আমাদের?' মুসা বলল।

আহত হলো ডেলভার। 'কি যে বলো! তোমাদের কাজ যদি কেউ উদ্ধার করে দিতে পারে, আমার এই বোটটাই পারবে।'

আর কথা না বলে দড়ি ধরে টান দিল সে। একটানেই স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। মৃদু হেসে গর্বিত চোখে মুসার দিকে তাকাল বুড়ো। নীরব ইশারা

করে বুঝিয়ে দিল, কেমন বুঝলে?

ঢ্যাঙ্ক-ঢ্যাঙ্ক-ঢ্যাঙ্ক-ঢ্যাঙ্ক করে ইঞ্জিনের বিচিত্র আওয়াজ তুলে ঢেউ কেটে এগিয়ে চলল বোট। কোনদিকে যেতে হবে বলে দিয়েছে কিশোর। সেদিকেই চালাল বুড়ো।

উপকূল একপাশে রেখে তীরের বেশ খানিকটা দূর দিয়ে এগিয়ে চলল বোট। ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল তিন গোয়েন্দা। গুহা থেকে নজর রাখলেও ওদের দেখতে পাবে না কমান্ডার।

গুহার কাছ থেকে অনেক দূরে নোঙর ফেলল বোট, যাতে কমান্ডারের সন্দেহ না হয়। বুড়ো ডেলভার মাছ ধরতে লাগল, আর বিনকিউলার দিয়ে গুহার দিকে নজর রাখল গোয়েন্দারা।

আচমকা শক্ত হয়ে গেল রবিন। 'অ্যাই, কয়েকজন লোক!'

পাশ থেকে কিশোর বলল, 'আমিও দেখতে পাচ্ছি।'

মুসা বলল, 'সামনের লোকটা কে? কমান্ডার মরিস না?'

'মনে হয়। ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে।'

কমান্ডারের সঙ্গে আরও তিনজন লোক রয়েছে। একটা বাক্স ধরাধরি করে নিয়ে গুহার ভেতর চলে গেল।

এরপর দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বিনকিউলার ধরে রাখতে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। কিন্তু লোকগুলো আর বেরোয় না।

রবিন বলল, 'নেমে গিয়ে দেখব নাকি ভেতরে কি করছে ওরা?'

'না, এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না,' কিশোর বলল, 'দেখে ফেলতে পারে। তাহলে আমাদের সব কষ্ট বৃথা। এত চালাকি করে কোন লাভ হবে না।'

আকাশের অবস্থা ভাল না। বার বার দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে ডেলভার। পানির রঙ গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে। বড় হচ্ছে ঢেউগুলো। বাতাস বাড়ছে। দিগন্তের কালো মেঘের ভেতরে বিদ্যুৎ চমকাল একবার।

'ঝড় আসছে,' ঘোষণা করল বুড়ো। 'ফিরে যেতে হবে আমাদের।'

'আর কয়েক মিনিট থাকা যায় না?' অনুরোধ করল রবিন।

'না, লক্ষণ খুব খারাপ। এখুনি রওনা হতে হবে আমাদের।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ডেলভার।

ঠিক এই সময় গুহা থেকে বেরিয়ে এল কমান্ডার। লোকগুলো নেই সঙ্গে। সৈকত দিয়ে পানির দিকে এগোল সে।

কিন্তু কি করে সে, দেখার সুযোগ হলো না গোয়েন্দাদের। তার আগেই বাঁকের আড়ালে সরে এল বোট।

ঢ্যাঙ্ক-ঢ্যাঙ্ক করে এগিয়ে চলেছে বোট। বাতাস আর ঢেউ যে হারে বাড়ছে তাতে সময়মত জেটিতে পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ হলো মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'স্পীড আর বাড়ানো যায় না?'

'না,' মাথা নাড়ল ডেলভার, 'সাধ্যমত চলছে এটা।'

বিশাল এক ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল বোটের ওপর। পানির ছিটে ভিজিয়ে দিল আরোহীদের।

ঢেউয়ের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেন এগিয়ে চলেছে বৃদ্ধ জলযানটা। দমছে না কোনমতেই।

আকাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে কালো মেঘ। কয়েক মিনিট পর আঘাত হানল বৃষ্টি।

মুসার মনে হতে লাগল, আজ ওদের ডুবিয়েই ছাড়বে বোট। সাগরের যা অবস্থা, এখন বোট ডুবলে মরতে হবে, বাঁচার কোনই আশা নেই।

কিন্তু বুড়োর কথাই ঠিক, ডুবল না বোট। ধুঁকতে ধুঁকতে প্রায় ডুবন্ত অবস্থায় এসে তীরে ভিড়ল। দড়ি আর শেকল দিয়ে শক্ত করে বোট বেঁধে নেমে পড়ল ডেলভার আর তিন গোয়েন্দা। বৃষ্টির মধ্যে মাথা নিচু করে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

বিকেলের দিকে ঝড় থামল, কমে এল বৃষ্টি। পরিষ্কার হতে লাগল আকাশ। পেটভরে খেয়ে আয়েশের ঢেকুর তুলে চেয়ারটা ঠেলে পেছনে সরাল ডেলভার। পাইপ ধরাল। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঝড় তো থামল। এবার কি করার ইচ্ছে?'

'গুহার কাছে যাব,' কিশোর বলল, 'কি ঘটে ওখানে দেখব।'

দাঁতের ফাঁকে পাইপটা চেপে ধরল ডেলভার। ধোঁয়া টানা থামিয়ে দিয়েছে। চোখে ভয়। 'রাতের বেলা!'

'হ্যাঁ। অন্ধকার নামলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা। রাত বারোটার মধ্যে ফিরে আসব।' টর্চটা বের করে ব্যাটারিগুলো খুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর।

যা বলছে তাই করবে ছেলেগুলো, এতদিনে বুঝে ফেলেছে ডেলভার, ওদের ঠেকানো যাবে না। তাই বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না আর। তবে কয়েকবার করে সাবধান করল। বলল, 'যেতে বাধা দেব না, তবে আমার একটা পরামর্শ শোনো। সবার একসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। যে কোন দু'জন যাও। একজন আমার এখানে থাকো। সময়মত যদি না ফেরো তোমরা, সাহায্য করতে পারবে সে।'

পরামর্শটা মনে ধরল কিশোরের। রাজি হলো।

সন্ধ্যা হতেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল সে আর মুসা। রবিন রয়ে গেল ডেলভারের বাড়িতে। যদিও এভাবে একা পড়ে থাকার ইচ্ছে তার ছিল না। তবু নেতার নির্দেশ, মানতেই হয়।

পাহাড়ে উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল আর নরম হয়ে আছে মাটি। অন্ধকার হলে এ পথে চলার সাহস করত না ওরা। চাঁদের আলো আছে বলে এগোতে পারছে।

নিরাপদেই ওপরে উঠে পাহাড়ী পথ ধরে হেঁটে চলল দুজনে। গিরিখাতটা দেখা গেল একসময়। ওটা ধরে চলে বেরিয়ে এল সৈকতে।

পৌঁছে গেছে। ওখানে বসে জিরিয়ে নিল কয়েক মিনিট। তারপর উঠে পাহাড়ের দেয়ালে গা মিশিয়ে পা টিপে টিপে এগোল কমান্ডারের গুহার দিকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর।

তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা। 'কি হলো!'

হাত তুলে দেখাল কিশোর।

মুসাও দেখল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল, 'খাইছে!'

তীর থেকে তিনশো গজ দূরে সমুদ্রের পানিতে মিটমিট করে জ্বলছে একটা লাল আলো, যেন কোন একচোখো সাগর-দানবের চোখ। কিন্তু চাঁদের আলোয় লাল আলোর নিচের কালো অবয়বটাকে চিনতে ভুল হলো না। একটা সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার।

পনেরো

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল দুজনে। এই তাহলে ব্যাপার। কমান্ডার মরিস কোন ধরনের গোপন দলের নেতা, বেআইনী কিছু করছে এই পাহাড়ের গুহায় থেকে। সাবমেরিনে করে রসদপত্র নিয়ে আসা হয়েছে।

গুহামুখের কাছ থেকে আগের রাতের মত সার্চলাইট জ্বলে উঠল। সাবমেরিনের দিকে তাকিয়ে দুবার জ্বলল-নিভল আলোটা।

ধীরে ধীরে পানির ওপর ভেসে উঠল সাবমেরিনের পুরো পিঠ, অতিকায় একটা মাছের মত। লাল আলোর নিচে কালো শরীর, অন্ধকারে ভয়ঙ্কর লাগছে অবয়বটা।

'আলোর সাহায্যে ওটাকে সঙ্কেত দিল কমান্ডার,' কিশোর বলল। 'ইস্, একটা বোট যদি পেতাম গিয়ে দেখে আসতাম সাবমেরিনে কি ঘটছে।'

মুসা বলল, 'এক কাজ করি, সাঁতরে চলে যাই আমি ওটার কাছে। বেশি দূর তো না। তুমি বসে থাকো এখানে।'

কিশোর বাধা দেয়ার আগেই কাপড় খুলতে আরম্ভ করল সে।

'সাবধানে যেয়ো,' শুধু বলল কিশোর।

পাহাড়ের দেয়ালের সঙ্গে মিশে এগোল মুসা। পানির কাছে এসে ফিরে তাকাল একবার। কিশোরকে দেখা যায় না। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে সে। ধীরে ধীরে পানিতে নেমে এল মুসা। মাথাটা কেবল ভাসিয়ে রেখে নিঃশব্দে সাঁতরে চলল সাবমেরিনের দিকে।

সেও পৌছল ওটার কাছে, সাবমেরিনের হ্যাচও খুলে গেল। পিচ্ছিল খোলসের গায়ে ধরার মত কিছু পেল না মুসা। ওটার গায়ে গা ঠেকিয়ে শুধু নাকটা পানির ওপরে ভাসিয়ে তাকিয়ে রইল হ্যাচের দিকে।

ছয়জন মানুষ বেরোল। কথা বলছে একটা অপরিচিত ভাষায়।

দশ ফুট দূর থেকে দেখছে মুসা। দুরুদুরু করছে বুক। ওদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ ইংরেজিতে বলে উঠল একজন, 'আমার মনে হয় এখানে আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলা উচিত না। কেউ শুনে ফেললে সন্দেহ করবে।'

'কে আর আসছে এখানে দেখতে,' ইংরেজিতেই বলল আরেকজন।

'তবু...এটা আমেরিকা, আমাদের সমঝে চলাই উচিত। অভ্যাস বদলাতে হবে।'

ওদের সঙ্গে একটা রবারের ভেলা। ভেলাটা পানিতে ভাসিয়ে তাতে চড়ে বসল লোকগুলো। দাঁড় তুলে নিল দুজন। বেয়ে চলল তীরের দিকে।

বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।

আর কিছু দেখার নেই এখানে। ভেলার পিছু পিছু মুসাও আবার তীরে ফিরে চলল। সাবধান রইল যাতে কোনমতেই লোকগুলোর চোখে পড়ে না যায়।

কিছুদূর এসে কি মনে হতে ফিরে তাকাল। দেখল, পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কনিং টাওয়ার। লোকগুলোকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে সাবমেরিন।

আবার জ্বলে উঠল সার্চলাইট। ভেলার দিকে মুখ করে জ্বলল-নিভল দুবার।

মাথা যতটা সম্ভব নিচে নামিয়ে ফেলল মুসা। আলো নেভার পর আবার মাথা তুলে শুনল ভেলার একজন বলছে, 'মরিস জ্বেলেছে।'

আরেকজন জবাব দিল, 'হ্যাঁ। তা ছাড়া এই পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আর সঙ্কেত দিতে আসবে কে?'

তীরে পৌঁছল ভেলা। লোকগুলোকে চলে যাওয়ার সময় দিল মুসা। তারপর সেও উঠে এল সৈকতে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ফিরে এল পাথরটার কাছে, যেখানে কিশোর লুকিয়ে আছে। সবকথা জানাল ওকে।

পা টিপে টিপে কমান্ডারের গুহার কাছে চলে এল দুজনে। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল, লোকগুলোকে স্বাগত জানাচ্ছে মরিস। এক এক করে হাত মেলাচ্ছে ওদের সঙ্গে।

একটা ব্যাপার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দুজনেরই, বদলে গেছে মরিসের চেহারা। অনেক বেশি তরুণ মনে হচ্ছে তাকে। কেন এমন দেখাচ্ছে সেটা কিশোর প্রথম বুঝতে পারল। ওদের সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে লোকটার, ততবার পরচুলা পরে ছিল। এখন কুচকুচে কালো ওর মাথার চুল। এগুলোই আসল, পরচুলা খুলে ফেলেছে। মুখের ভাঁজও এখন অদৃশ্য, তারমানে মেকআপও নিত দিনের বেলা।

হাত মেলানো শেষ করে লোকগুলোকে নিয়ে গুহার পেছন দিকে চলে গেল কমান্ডার। সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে যাওয়াতেই বোধহয় মিলিয়ে গেল ওর হাতের আলো।

'চলো, আমরাও ঢুকে পড়ি,' কিশোর বলল।

ভেতরে ঢুকল দুজনে। গুহার গভীর থেকে ভেসে আসছে কথা বলার মৃদু শব্দ। অনেকটা গুঞ্জনের মত শোনা যাচ্ছে। খুব সাবধানে এগোল ওরা। ফিসফিস করে মুসাকে বলল কিশোর, 'দেখো তো, সুড়ঙ্গের মুখে কেউ আছে কিনা? গার্ড রেখে যেতে পারে।'

ভাল করে দেখল মুসা, অন্ধকারে কাউকে চোখে পড়ল না। কোন

নড়াচড়া নেই। 'কাউকে দেখছি না।'

আবার এগোল দুজনে। মিলিয়ে গেল কথার শব্দ। আলো ছাড়া আর এগোনো অসম্ভব। আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে লোকগুলোকে আরও ভেতরে চলে যাওয়ার সময় দিয়ে যা থাকে কপালে ভেবে কোমর থেকে টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল কিশোর। আলোর রশ্মি ঘুরিয়ে আনল একবার চারপাশে।

তাকের ওপর আগের মতই পড়ে আছে শটগানটা। পাশে নোটবইটাও আছে, তবে ক্যাপটা নেই। বোধহয় সরিয়ে ফেলেছে কমান্ডার। নিচে জড় করে রাখা খাবারের টিন।

লোকগুলো যেদিকে গেছে সেদিকে এগোল দুজনে। যতই ভেতরে ঢুকল বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মুখ। গুহার পেছন থেকে বৈদ্যুতিক তারের মোটা পাইপ চলে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতরে।

'তোমার কথাই ঠিক,' মুসা বলল। 'এই পাইপই আমার যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। কিন্তু এ সব দিয়ে এখানে কি করছে ব্যাটারা?'

'চলো, গেলেই দেখতে পাব। আমার মনে হয় ওরা কোন দেশের স্পাই। রাডার স্টেশনটার দিকে লক্ষ। ওটাকে কিছু করতে চায়।'

'কিন্তু ডিগ আর গেনারের ব্যাপারটা তাহলে কি? ওরা এর মধ্যে আসছে কি করে?'

'এখনও বুঝতে পারছি না। চলো, এগোই...'

কিন্তু কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না একটা কণ্ঠ, অন্ধকার থেকে বলে উঠল, 'আর এগোনোর দরকার নেই। থাকো ওখানেই।'

চমকে গেল কিশোর। আপনাআপনি টর্চ ধরা হাতটা ঘুরে গেল, আলো গিয়ে পড়ল লোকটার হাসি হাসি মুখের ওপর।

মেরিন ডিগ!

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মুসার শরীরে। তিন লাফে চলে গেল তাকের কাছে। আবছা অন্ধকারে আ দাজেই থাবা দিয়ে তুলে নিল শটগানটা। তাক করল ডিগের দিকে।

কিন্তু পরক্ষণেই আকাশ ভেঙে পড়ল যেন ওর মাথায়। পেছন থেকে শক্ত কিছু দিয়ে সজোরে বাড়ি মারা হয়েছে। অন্ধকারে আরও একজন লোক লুকিয়ে ছিল।

ঢলে পড়ে গেল মুসা।

জ্ঞান ফিরলে দেখল সে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গুহার মেঝেতে পড়ে আছে। কিশোরকে একইভাবে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে ওর পাশে। কাছেই পিস্তল হাতে বসে আছে ডিগ। একটা ল্যাম্প জ্বলছে, তার আলোয় কুৎসিত লাগছে ওর মুখটা।

'যাক, ঘুম তাহলে ভাঙল,' হেসে বলল ডিগ। 'আমি জানতাম তোমরা এমন কিছু একটা করবে, আসবে, তাই লুকিয়ে ছিলাম তোমাদের অপেক্ষায়।'

'তা তো বুঝলাম,' নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল মুসা,

কোলাব্যাঙের স্বর বেরোচ্ছে তার গলা দিয়ে। 'কিন্তু এ ভাবে কতক্ষণ আটকে রাখবেন আমাদের?'

'বেশিক্ষণ না। এই আর কয়েক ঘণ্টা, ততক্ষণে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

'তারপর ছেড়ে দেবেন? ফিরে গিয়ে যদি পুলিশকে সব কথা বলে দিই আমরা?'

'সেজন্যেই তো ছাড়ব না। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তোমাদের দিয়ে কাজ হবে। বুদ্ধিমান ছেলে তোমরা, ব্রেন ওয়াশ করে নিলে অনেক কাজ করাতে পারব।'

'কোথায় নিয়ে যাবেন আমাদের?' জানতে চাইল কিশোর।

'সেটা বলা যাবে না। গেলেই দেখতে পাবে।'

'এখানে কি করছেন আপনারা, সেটা তো বলা যাবে? রাডার স্টেশনটাতে কিছু করছেন, তাই না?'

হাসল ডিগ। 'অতটা আন্দাজ করে ফেলেছ! হ্যাঁ, ওখানেই...'

কথা শেষ হলো না তার। একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল অনেক লোক। কঠিন গলায় আদেশ হলো, 'খবরদার, নড়বে না কেউ! পুলিশ!'

স্তব্ধ হয়ে গেল ডিগ। হাত থেকে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখল পিস্তলটা।

উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল কয়েকটা, পুলিশের ব্যাটারি চালিত বৈদ্যুতিক ল্যাম্প।

হাসিমুখে মুসা আর কিশোরের পাশে এসে বসল রবিন। এগিয়ে এল ডেলভার।

বাঁধনের দড়ি কাটতে কাটতে রবিন বলল, 'সময়মতই এসে পড়েছি, তাই না? তোমাদের জন্যে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি আমরা। তারপর থানায় গেছি।...তা ভাল আছ তো তোমরা? মারধর করেনি?'

'করেনি বললে ভুল হবে,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'মাথায় বাড়ি দিয়ে বেঁহুশ করে ফেলেছিল আমাকে...'

ষোলো

পরদিন বিকেল। রকি বীচে তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে বসে আছে ওরা। এই সময় একটা গাড়ি ঢুকল ইয়ার্ডে। গাড়ি থেকে নামল একজন লম্বা, সুদর্শন লোক। গোয়েন্দাদের খোঁজ করল। নিজের পরিচয় দিল—ফিন রিগসন, এফ বি আইয়ের লোক। জানাল, হ্যারিস গেনারের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে।

তিন গোয়েন্দাও আগ্রহী হলো। ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল ওঅর্কশপের ভেতর।

ভদ্রলোককে দেখে সেরাতে গুহায় ঢোকার কথা মনে পড়ল কিশোরের। একজন স্পাইও পালাতে পারেনি। দল বেঁধে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে পুলিশ। ঢোকার আগে হেডকোয়ার্টারে ওয়্যারলেস করে বলে দিয়েছে একজন অফিসার, বাইরে থেকে যাতে রাডার স্টেশনটা ঘিরে ফেলা হয়।

সেইমত কাজ করেছে হেডকোয়ার্টার থেকে আসা পুলিশ বাহিনী। অতএব কেউ পালাতে পারল না। স্টেশনের নিচের একটা গুপ্তকক্ষ থেকে সব ক'জন স্পাইকে গ্রেপ্তার করা হলো। গুহাটা থেকে প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গ বেরিয়ে চলে গেছে স্টেশনের দিকে। মূল সুড়ঙ্গ থেকে আরেকটা শাখা-সুড়ঙ্গ খুঁড়ে স্টেশনের নিচে চলে আসার ব্যবস্থা করেছে স্পাইরা। একটা কক্ষ বানিয়ে নিয়েছে যাতে ওখান থেকে ওপরে উঠে গোপনে স্টেশনের কাজকর্ম দেখতে পারে।

সাবমেরিন থেকে আসা সব ক'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ, সেই সঙ্গে কমান্ডার মরিস আর মেরিন ডিগকেও। যাকে উদ্দেশ্য করে এই তদন্তের শুরু, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে গুহা বা সুড়ঙ্গের কোথাও পাওয়া গেল না।

ডিগকে বার বার করে জিজ্ঞেস করা হলো, কিন্তু জবাব পাওয়া গেল একটাই—সে কিছু জানে না।

কিন্তু নিরাশ হলো না অফিসার। থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কথা আদায়ের চেষ্টা করা যাবে।

সেব্যাপারেই হয়তো কিছু বলবে, ভাবল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'হ্যারিস গেনারের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রিগসন, 'গেছে। ওকেও পাওয়া গেছে। হাসপাতালে আছে এখন।'

'তাই নাকি! খুব খারাপ অবস্থা?'

'শরীর ঠিকই আছে, তবে বোধহয় মাথায় কোন গোলমাল হয়েছে। একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। ওষুধের রিঅ্যাকশনও হতে পারে।'

'তার বোন ইভা গেনারকে খবর দেয়া হয়েছে?'

'সেজন্যেই তো তোমাদের কাছে এলাম, ঠিকানা জানার জন্যে।'

'ও, চলুন তাহলে, আগে তাকে গিয়ে খবরটা দিই। তারপর একসঙ্গে হাসপাতালে যাব গেনারকে দেখতে। তা কোথায় পেলেন ওকে?'

'সাবমেরিনের মধ্যে,' রিগসন জানাল। 'ওকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ওটা। স্পাইগুলোকে ধরার পর তোমাদের কথামত সাবধান করে দেয়া হয়েছিল কোস্টগার্ডকে। নৌবাহিনীর সহায়তায় সাবমেরিনটাকে ধরে ফেলা হয়েছে। তার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গেনারকে। গুহাতেই রাখা হয়েছিল ওকে। ওখান থেকে সাবমেরিনে পাচার করা হয়েছে।'

'ও তো নিশ্চয় কিছু বলতে পারেনি?' জানতে চাইল রবিন।

আবার মাথা নাড়ল রিগসন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রাডার স্টেশনটাতে কি করছিল ওরা জানা গেছে?'

'দুটো উদ্দেশ্যে ব্ল্যাক হোল কেভে আস্তানা গেড়েছিল ওরা। ওই উপকূলে গুপ্তচরদের একটা ঘাঁটি বানিয়েছিল। ওখানে লুকিয়ে থেকে নানা রকম ধ্বংসাত্মক কাজকারবার চালানোর পরিকল্পনা করেছিল ওরা দেশের ভেতর। সেই সঙ্গে রাডার স্টেশনটাকেও অকেজো করে রাখার চেষ্টা চালাত। তাতে বিমান আর নৌবাহিনীর অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারত।'

'রাডার স্টেশন অকেজো করত কিভাবে?' জানতে চাইল মুসা।

'একটা বিশেষ যন্ত্র গুহার ভেতর থেকে রাতের বেলা বাইরে ঠেলে দিত,' রিগসন জানাল, 'তাতে বাধা পেত রাডার সিগন্যাল, জ্যাম হয়ে যেত।'

'বাপরে বাপ, কত্তবড় শয়তান, ব্যাটারা!'

'হ্যাঁ, লোক খুব খারাপ ওরা। মজার ব্যাপার হলো, কমান্ডার জিন মরিস নিজেকে জাহাজের কমান্ডার বলে পরিচয় দিলেও কোনদিন নাবিক ছিল না সে। অল্প বয়সে কিছুদিন এক তৃতীয় শ্রেণীর থিয়েটারে অভিনয় করেছে। বিদেশে একটা সাংস্কৃতিক ভ্রমণ করার সময় স্পাইয়ের খপ্পরে পড়ে খারাপ হয়ে যায়, বিদেশী সংস্থার হয়ে নিজের দেশের বিরুদ্ধে বেঈমানী শুরু করে...'

বাধা দিল রবিন, 'ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে?'

'আরে নাহ্, ইংল্যান্ড কোথায়? আমেরিকা। ও আমেরিকান। কোনকালেই ইংরেজ ছিল না, শরীরে কোনভাবেই ইংরেজ রক্ত আসেনি, মায়ের দিক থেকেও না, বাপেরও না। ব্রিটিশ জাহাজের কমান্ডার বলে ফাঁকি দিয়েছে তোমাদেরকে। আরও বহুজনকে দিয়েছে। পাগলের অভিনয় করাও তার আরেকটা ফাঁকিবাজি। মহাধড়িবাজ লোক।'

'হ্যাঁ,' মুসা বলল, 'আমরা তো সত্যি সত্যি পাগল ভেবে বসেছিলাম। ভেবেছি একলা থাকতে থাকতে মাথাটা ওর বিগড়ে গেছে।'

'পাগলামি করাতে অবশ্য সুবিধেই হয়েছে আমাদের,' কিশোর বলল, 'সন্দেহটা তাড়াতাড়ি জেগেছে। আচ্ছা, মুসা যে পিস্তলটা পেয়েছে, ওটার ব্যাপারে কিছু জেনেছেন নাকি? অস্ত্রটা মরিসেরই, তাই না?'

'হ্যাঁ,' রিগসন বলল, 'মরিস সব স্বীকার করেছে। তোমাদের গুহা থেকে যে রাতে খাবার চুরি করেছে, সে রাতে ওটা হারিয়ে ফেলেছিল। অন্ধকারে তাড়াহুড়োয় আর খুঁজে পায়নি। খাবার চুরি করেছিল তোমাদের তাড়ানোর জন্যে। ভেবেছিল, খাবার না পেলে আপনিই চলে যাবে তোমরা।'

'সেটা তখনই বুঝতে পেরেছি।'

'ক্যাপটা কার? নিশ্চয় গেনারের?'

মাথা ঝাঁকাল রিগসন। 'হ্যাঁ।'

'সে ওই গুহায় কি করে গিয়েছিল, কিছু জেনেছেন?'

'ডিগের কথাবার্তায় সন্দেহ হয়েছিল তার, ব্ল্যাক হোল গুহায় কিছু ঘটছে। একরাতে গোপনে ওর পিছু নিয়ে চলে যায় সেখানে। কিন্তু মরিসের চোখে পড়ে যায়। পালানোর চেষ্টা করে গেনার। কিন্তু বন্দুকের ফাঁকা গুলি করে তাকে ভড়কে দেয় মরিস। আটকে ফেলে।...যাই হোক, কথা তো অনেক

হলো। চলো এবার, গেনারের বোনকে খবরটা দেয়া যাক।'

রিগসনের সঙ্গে বেরোল তিন গোয়েন্দা।

খবর শুনে তো কেঁদেই ফেলল ইভা। তখুনি ওদের সঙ্গে রওনা হলো হাসপাতালে।

ঘোর কেটেছে গেনারের। তবে অতিরিক্ত দুর্বল। দুজন পুলিশ অফিসার বসে আছে, তার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে।

তিন গোয়েন্দা কি করেছে শুনে কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি চলে এল তার। ধরা গলায় বলল, 'তাহলে তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ! সময়মত সাবমেরিনটাকে আটকাতে না পারলে আমাকে কোথায় যে নিয়ে যেত ওরা কে জানে! সারাজীবনে হয়তো আর দেশের মুখ দেখতাম না। হয়তো ব্রেন ওয়াশ করে মাথাটাই বিগড়ে দিত চিরকালের জন্যে। কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদেরকে…'

* * *

ভলিউম ২৫

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার ।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০